সমনামী

ঝুম্পা লাহিড়ী

অনুবাদ পৌলোমী সেনগুপ্ত

আনন্দ

ইংরেজি ভাষায় রচিত ঝুম্পা লাহিড়ীর
THE NAMESAKE -এর বঙ্গানুবাদ
প্রথম প্রকাশ ২০০৩
প্রকাশক Houghton Mifflin Company, Boston, New York
© 2003 By Jhumpa Lahiri

প্রথম আনন্দ সংস্করণ নভেম্বর ২০০৫
© বাংলা অনুবাদ: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7756-521-4

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে মুদ্রিত।

৩০০.০০

আলবেরতো ও অক্টাভিয়োর জন্য,
যাদের আমি অন্য নামে ডাকি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি জন সাইমন গুগেনহাইম ফাউন্ডেশনকে তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাই। একইসঙ্গে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সুজ়েন চোই, ক্যারিন ক্লেভিডেন্স, গীতা দানেশজু, সামান্থা জিলিসন, দাফ্‌নে কালোটে, ক্রেসিডা লেশন, হাইডি পিটলর, জেনেট সিলভার, এরিক সিমোনফ আর জেন ইয়েফ কেম্পকে।

আমি নিম্নলিখিত বইগুলির প্রতি কৃতজ্ঞ:
ভ্লাদিমির নবোকভ লিখিত 'নিকোলাই গোগোল', হেনরি ট্রোয়াট লিখিত 'ডিভাইডেড সোল: দ্য লাইফ অফ গোগোল'। 'দ্য ওভারকোট'-এর কোটেশনটি নেওয়া হয়েছে ডেভিড মাগারশ্যাকের অনুবাদ থেকে।

The reader should realize himself that it could not have happened otherwise, and that to give him any other name was quite out of the question.

—Nikolai Gogol, “The Overcoat”

এক

১৯৬৮

ডাক্তারের বলে দেওয়া প্রসবের দিনের দু'সপ্তাহ আগে এক চিটচিটে বিকেলে অসীমা গাঙ্গুলি তার সেন্ট্রাল স্কোয়ার অ্যাপার্টমেন্টের রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে একটা বাটিতে রাইস ক্রিস্পি, প্ল্যান্টার্স বাদাম আর কুচোনো লাল পেঁয়াজ একসঙ্গে মাখছিল। তাতে নুন, লেবুর রস আর মিহি করে কাটা কাঁচালঙ্কা মেশাতেই একটু সরষের তেলের জন্য তার মনটা হাহাকার করে উঠল। গর্ভবতী থাকার পুরো সময়টা অসীমা এই মাখার উপর ভরসা করেই কাটিয়েছে। তবে কলকাতার ফুটপাথে আর ভারতের সব রেল স্টেশনে কয়েক নয়া পয়সায় কাগজের ঠোঙায় ভরে যে ঝালমুড়ি বিক্রি হয়, তার তুলনায় অসীমার ক্রিস্পি মাখাটা নেহাতই জোলো। এমনকী এখনও, বাচ্চাটা বাড়তে বাড়তে তার ভিতরে আর একটুও খালি জায়গা না থাকা সত্ত্বেও, এই একটা জিনিসের প্রতি তার আকর্ষণ কমেনি। একমুঠো তুলে নিয়ে একটু মুখে দেয় অসীমা, তারপর ভুরু কোঁচকায়। প্রত্যেকবারের মতো এবারও একটা কিছুর অভাব রয়ে গেছে। সে শূন্যদৃষ্টিতে রান্নাঘরের কাউন্টারের উপরে পেরেক থেকে ঝুলতে থাকা তেল চিটচিটে রান্নার বাসনগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘাম মোছে। নকশাকাটা ধূসর লিনোলিয়ামের উপরে তার পা-দুটো টনটন করে ওঠে। তলপেটটা বাচ্চার ওজনে ভারী। সে একটা কাবার্ড খোলে। তাকগুলো হলুদ আর সাদা চেককাটা তেলতেলে কাগজে ঢাকা। কতদিন ভেবেছে কাগজটা পালটানো দরকার... । সে আর একটা পেঁয়াজ বের করে, উপরের ম্যাজেন্টা খোসাটা নখ দিয়ে টেনে তুলতে তুলতে সে আবার ভুরু কোঁচকায়। এক অদ্ভুত উষ্ণতা তার তলপেটে ছড়িয়ে পড়ছে, আর তার পরেই এমন একটা জোরালো টান যে সে নিচু হয়ে যেতে বাধ্য হয়, হাঁ করে শ্বাস টানে। পেঁয়াজটা তার হাত থেকে ছিটকে মেঝেতে পড়ে যায়।

যন্ত্রণার প্রথম প্রবাহ কেটে যায় বটে, তবে তার পরই আরও অস্বস্তিকর,

আরও দীর্ঘস্থায়ী দ্বিতীয় প্রবাহ। বাথরুমে গিয়ে সে আবিষ্কার করে প্যান্টে খয়েরি রক্তের জমাট দাগ। তার স্বামী, এম আই টিতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডক্টরাল ছাত্র অশোককে সে জোরে জোরে ডাকে। অশোক শোবার ঘরে পড়াশোনা করছে। পড়ার টেবিলটা আসলে একটা কার্ড টেবিল। লাল ও বেগুনি বাটিকের চাদর দিয়ে ঢাকা দুটো গদিই হল তাদের বিছানা, এখন সেটাই আবার অশোকের চেয়ার। অশোককে ডাকলেও অসীমা তার নাম নেয় না। সে কখনওই তার স্বামীর কথা ভাবার সময় তার নাম নিয়ে ভাবে না, যদিও সে ভাল করেই জানে নামটা কী। সে স্বামীর পদবি গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু সামাজিক নিয়মের খাতিরে সে কখনও স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না। বাঙালি বউদের তা করতে নেই। হিন্দি সিনেমার চুমু বা আদরের মতো স্বামীর নামও খুব নিজস্ব, গহিন। এটা জোরে বলার কোনও প্রশ্নই নেই, কোনওভাবে এড়িয়ে যাওয়াই নিয়ম। তাই অশোকের নাম ধরে না ডেকে অসীমা শুধু বলে, "শুনছ?"

ভোরবেলা একটা ট্যাক্সি ডাকা হয়। কেমব্রিজের ফাঁকা রাস্তা দিয়ে, ম্যাসাচুসেট্স অ্যাভিনিউ বরাবর, হার্ভার্ড ইয়ার্ডের পাশ দিয়ে মাউন্ট ওবার্ন হাসপাতালে পৌঁছে যায় তারা। অসীমা নাম লেখায়, গর্ভযন্ত্রণার বিস্তার ও যন্ত্রণার দুটি ঢেউয়ের মধ্যেকার সময় নিয়ে প্রশ্নের জবাব দেয়। অশোক নানা ফর্ম ভরতে থাকে। শেষে অসীমাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে চকচকে, উজ্জ্বলভাবে আলোকিত করিডোর দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়, এমন একটা লিফটে তোলা হয় যা অসীমার রান্নাঘরের চেয়ে বড়। ম্যাটারনিটি ফ্লোরে হলের শেষ ঘরটায় তাকে জানালার ধারের একটা বেড দেওয়া হয়। পরনের মুরশিদাবাদি সিল্কের শাড়িটার বদলে একটা ফুলছাপ সুতির গাউন পরতে হয় তাকে। গাউনটা অস্বস্তিকর, কারণ ওটার ঝুল হাঁটু পর্যন্ত। একজন নার্স অবশ্য শাড়িটা ভাঁজ করতে চায়, কিন্তু ফসফসে ছ'গজ কাপড় সামলাতে না পেরে শেষ অবধি সেটা কোনওমতে অসীমার স্লেটনীল সুটকেসে ঠেসে দেয়। অবস্টেট্রিশিয়ান ডা. অ্যাশলি এসে অসীমাকে পরীক্ষা করেন। অ্যাশলিকে অনেকটা লর্ড মাউন্টব্যাটেনের মতো দেখতে, তাঁর সুপুরুষ চেহারায় এক ধরনের কঠোরতা আছে। মিহি বালিরঙা চুল কানের পাশ থেকে পিছনে ঠেলে দেওয়া। তিনি জানান, বাচ্চার মাথাটা ঠিক জায়গায় আছে, নামতেও শুরু করেছে। অসীমাকে জানানো হয়, তার গর্ভযন্ত্রণা প্রাথমিক স্তরেই আছে, তিনি

সেন্টিমিটার ফাঁক হয়েছে, ...। "ফাঁক হওয়া মানে কী?", সে জিজ্ঞেস করে। ডা. অ্যাশলি দুটো আঙুল পাশাপাশি তুলে ধরেন, তারপর সেগুলোকে ফাঁক করে বাচ্চাটাকে বেরোতে দেওয়ার জন্য অসীমার শরীরকে যে অবিশ্বাস্য কাজ করতে হবে, তা বোঝান। অবশ্য তিনি বলেন, এখনও বেশ কিছুটা সময় লাগবে, কারণ এবারই অসীমার প্রথম সন্তানজন্ম। লেবার পেন চব্বিশ ঘণ্টা ধরেও চলতে পারে, এমনকী তার চেয়েও বেশি। অসীমা অশোকের মুখটা খুঁজছিল, কিন্তু সে ডাক্তারের টেনে দেওয়া পরদার ঘেরাটোপের বাইরে চলে গেছে। "আমি আবার আসব," অশোক বাইরে থেকে বাংলায় বলে। তারপর এক নার্সের গলা শোনা যায়, "কিচ্ছু চিন্তা করবেন না মিস্টার গাঙ্গুলি, অনেক দেরি আছে। এর পর থেকে তো আমরা আছি।"

এখন সে একা, ঘরের বাকি তিনজন মহিলার থেকে একটা পরদার দূরত্বে। কথাবার্তা শুনে সে বুঝতে পারে, এক মহিলার নাম বেভারলি। অন্যজন লোয়াস। ওর বাঁদিকে ক্যারোলিন। "মাইরি বলছি, সব চুলোয় যাক, এ তো নরক," সে একজনকে বলতে শোনে। আর তারপর এক পুরুষের কণ্ঠস্বর, "আমি তোমাকে ভালবাসি, সুইটহার্ট"। এই ধরনের কথা অসীমা তার স্বামীর মুখে কখনও শোনেনি, শুনতে চায়ও না। ওরা এই রকম নয়। এই প্রথম সে একা একটি ঘরে অচেনা লোকেদের মাঝখানে ঘুমোল। এর আগে সে হয় নিজের বাবা-মার সঙ্গে ঘুমিয়েছে নয়তো অশোকের পাশে। অসীমা ভাবে, পরদাগুলো খোলা থাকলে মার্কিন মহিলাদের সঙ্গে কথা বলা যেত। এমন তো হতে পারে যে ওদের মধ্যে কেউ আগে সন্তানের জন্ম দিয়েছে, বলতে পারবে কী হতে পারে, কীভাবে হতে পারে। কিন্তু সে এতদিনে এও বুঝতে পেরেছে আমেরিকানরা যতই প্রকাশ্যে প্রেম করুক, মিনিস্কার্ট-বিকিনি পরুক, রাস্তায় হাতে হাতে দিয়ে চলুক বা কেমব্রিজ কমনে একে অপরের শরীরের উপর শুয়েই থাকুক, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন তারা আড়ালে রাখতেই পছন্দ করে। সে তার শক্ত ড্রামের মতো পেটে হাত বোলায়, ভাবে বাচ্চার মাথা আর পা এখন ঠিক কোথায় থাকতে পারে। বাচ্চাটা নড়াচড়া অনেক কমিয়ে দিয়েছে। গত কয়েক দিন একটু-আধটু অস্তিত্ব জানান দেওয়া ছাড়া সে ঘুঁষি বা লাথি মারেনি, পাঁজরের নীচে চাপও দেয়নি। অসীমার জানতে কৌতূহল হয়, সে কি এই হাসপাতালে একমাত্র ভারতীয়? তারপর বাচ্চাটা অল্প নড়ে উঠে তাকে মনে করিয়ে দেয় যে সে, সত্যি বলতে, এখানে একা নয়। অসীমার কাছে একটা ব্যাপার বেশ আশ্চর্য ঠেকে, তার বাচ্চাটা এমন

একটা জায়গায় জন্মাবে যেখানে বেশির ভাগ মানুষ কষ্ট পেতে বা মারা যেতে আসে। মেঝের অফ-হোয়াইট টাইল, দেওয়ালের অফ-হোয়াইট প্যানেল বা শক্ত করে গোঁজা বিছানার সাদা চাদরে অসীমা কোনও সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। সে ভাবে, ভারতে মেয়েরা সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য বাপের বাড়ি চলে যায়। শ্বশুরবাড়ি, স্বামী, বাড়ির কাজ, সব কিছু থেকে দূরে, সদ্যোজাত বাচ্চার সঙ্গেও সেও একবার অল্পদিনের জন্য নিজের ছোটবেলায় ফিরে যায়।

আবার একটা ব্যথার টান ওঠে, আগের থেকেও জোরালো। সে বালিশে মাথা ঠেসে দিয়ে চিৎকার করে ওঠে। আঙুলগুলো বেডের ঠান্ডা রেলিংগুলোকে আঁকড়ে ধরে। কেউ শোনে না, কোনও নার্স তার কাছে ছুটে আসে না। তাকে বলা হয়েছে কন্ট্রাকশনের সময় মাপতে। তাই সে নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকায়। এই ঘড়িটা তার বাবা-মার দেওয়া বিদায়কালীন উপহার। শেষবার দেখা হওয়ার সময়, এয়ারপোর্টের ভিড়ভাট্টা ও কান্নাকাটির মধ্যেই তাঁরা এটা তার কবজিতে বেঁধে দিয়েছিলেন। তখন সে ঘড়িটা ভাল করে লক্ষই করেনি। তারপরই জীবনে প্রথমবার বি ও এসি ভিসি-১০ বিমানে করে সে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল, তার পরিবারের ছাব্বিশজন সদস্য দমদম বিমানবন্দরের ব্যালকনি থেকে সেই প্লেনের গর্জন করে উড়ে যাওয়া দেখছিলেন। অসীমা নিজের দেশের এমন সব অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়ে গেল যেখানে তার পা কোনওদিনও পড়েনি। অবশেষে ভারতের বাইরের এক অচেনা জগতের দিকে ভেসে যাওয়ার সময় দু'হাতের শাঁখা, পলা, লোহা, সোনার বালা ইত্যাদি হরেক রকম বিবাহচিহ্নের মধ্যে হাতঘড়িটা তার চোখে পড়েছিল। এখন, ওই একগাদা চুড়ি ছাড়াও সে একটি টাইপ করা লেবেল লাগানো প্লাস্টিকের ব্রেসলেট পরে আছে, যাতে তাকে এই হাসপাতালের রোগী বলে চেনা যায়। সে ঘড়িটা কবজির ভিতর দিকে মুখ করে পরে। ডায়ালের নীচে 'ওয়াটারপ্রুফ', 'অ্যানিম্যাগনেটিক', ও 'শক-প্রোটেক্টেড' এই শব্দগুলো ছাড়াও তার বিবাহিত নামের আদ্যক্ষর এ. জি. খোদাই করা রয়েছে।

অসীমার নাড়ির উপর আমেরিকান সেকেন্ডগুলো টিকটিক করে এগোতে থাকে। আধ মিনিট ধরে যন্ত্রণার একটি স্রোত তার পেট পেঁচিয়ে ধরে, পিঠের দিকে ধাক্কা মেরে পা বেয়ে নেমে যায়। তারপর সাময়িক স্বস্তি। সে আঙুলে ভারতীয় সময়ের হিসেব করে। তার বুড়ো আঙুলের গোড়াটা আঙুলের ভেতর দিকে প্রত্যেকটি খয়েরি বিভাজিকায় আঘাত করতে করতে তৃতীয়

আঙুলের মাঝামাঝি পৌঁছে থেমে যায়। কলকাতায় সময় সাড়ে ন'ঘণ্টা এগিয়ে আছে, সেখানে সন্ধে সাড়ে আটটা বাজে। আমহার্স্ট স্ট্রিটে তার বাপের বাড়ির ফ্ল্যাটে রাতের খাওয়া হয়ে গিয়েছে এতক্ষণে। একজন কাজের লোক গ্লাসে গরম চা ঢালছে, ট্রেতে মারি বিস্কুট সাজাচ্ছে। তার মা, যিনি শিগগিরিই দিদিমা হবেন, দাঁড়িয়ে আছেন ড্রেসিং টেবিলের সামনে, আঙুল দিয়ে কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল খুলছেন। তাঁর চুল এখনও যত না সাদা, তার চেয়ে বেশি কালো। তার বাবা জানালার ধারে কালির দাগ লাগা স্ল্যান্টেড টেবিলের সামনে ঝুঁকে বসে আছেন। স্কেচ করছেন, সিগারেট খাচ্ছেন, ভয়েস অব আমেরিকা শুনছেন। তার ছোট ভাই রানা বিছানায় বসে ফিজিক্স পরীক্ষার জন্য পড়ছে। তার চোখে পরিষ্কার ফুটে ওঠে বাপের বাড়ির বসার ঘরের ছাইরঙা সিমেন্টের মেঝে, যা সবচেয়ে বেশি গরমের দিনেও পায়ের তলায় ঠান্ডা ঠেকে। গোলাপি প্লাস্টার করা দেওয়ালের উপর তার লোকান্তরিত ঠাকুরদার বিরাট একটা সাদাকালো ছবি। তার ঠিক উলটোদিকে ধোঁয়াটে কাচ লাগানো একটা দেওয়াল-আলমারিতে বই, কাগজপত্র ও তার বাবার জলরঙের টিন ঠাসা। এক মুহূর্তের জন্য বাচ্চার ওজনটা আর থাকে না, তার চোখের সামনে দিয়ে পরিচিত দৃশ্যগুলো ভেসে যায়, তারপরই আবার চার্লস নদীর নীল টুকরো, ঘন সবুজ গাছের মাথা আর মেমোরিয়াল ড্রাইভ দিয়ে হুসহুস করে চলে যাওয়া গাড়ির স্রোত।

কেমব্রিজে এখন সকাল এগারোটা বাজে। হাসপাতালের দ্রুতগতির দিনে এটাই দুপুরে খাওয়ার সময়। একটা ট্রেতে করে গরম আপেলের রস, জেল-ও, আইসক্রিম আর ঠান্ডা বেক্‌ড চিকেন তার কাছে নিয়ে আসা হয়। প্যাটি নামের নার্সটি বেশ হাসিখুশি। তার হাতে হিরের এনগেজমেন্ট আংটি। টুপির নীচ থেকে লাল চুল বেরিয়ে আছে। সে অসীমাকে শুধু জেল-ও আর আপেলের রসটাই খেয়ে নিতে বলে। সেটাই ভাল। অনুমতি মিললেও অসীমা কখনওই মুরগিটা খেত না। আমেরিকানরা মুরগি খায় চামড়া না-ছাড়িয়ে। অবশ্য অসীমা সম্প্রতি প্রসপেক্ট স্ট্রিটে একজন মাংসবিক্রেতাকে খুঁজে পেয়েছে যে দয়াপরবশ হয়ে ছালটা ছাড়িয়ে দেয়। প্যাটি বালিশগুলো ফুলিয়ে দিতে ও বিছানা পরিষ্কার করতে আসে। ডা. অ্যাশলি মাঝে মাঝে দেখে যান। "কোনও চিন্তা নেই," অসীমার পেটে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে তিনি মিহি গলায় বলেন, তার হাতে হাত রাখেন, হাতভরতি গয়নাগুলো উলটেপালটে দেখেন। "সবকিছুই তো স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। আমরা

স্বাভাবিক সন্তানজন্মই আশা করছি, মিসেস গাঙ্গুলি।”

কিন্তু অসীমার যে কিছুই স্বাভাবিক ঠেকে না! গত আঠারো মাস, মানে কেমব্রিজে আসার পর থেকেই, কোনও কিছুই আর স্বাভাবিক লাগে না তার। এই যন্ত্রণাটা তেমন কিছু নয়, সে জানে এই সময়টা পেরিয়ে যাবে। আসল সমস্যাটা হল যন্ত্রণার ফল নিয়ে। এই অচেনা দেশে মা হওয়া নিয়ে। গর্ভিণী হওয়াটা একরকম। সকালের শরীর খারাপ, রাতে ঘুম না আসা, পিঠের চাপা ব্যথা, বারবার বাথরুমে যাওয়া এসব তবু সহ্য করা যায়। সমস্ত সময়টা, শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও, সে তার নিজের শরীরের প্রাণ সৃষ্টি করার ক্ষমতায় বিস্মিত হয়েছে, ঠিক যেমন তার মা বা দিদিমা বা পূর্বনারীরা হয়েছিলেন। স্বদেশ থেকে এত দূরে, ভালবাসার মানুষদের থেকে আলাদা হয়ে যে এটা ঘটতে পারছে, সেটাই বা কম অদ্ভুত নাকি? কিন্তু আত্মীয়স্বজনবিহীন, অল্পচেনা এক দেশে বাচ্চা বড় করার ভয়টাই তাকে পেয়ে বসেছে। এখানে জীবন কেমন যেন অনিশ্চিত, পরিমিত।

“চলো, একটু হেঁটে আসি। তোমার ভাল লাগবে,” দুপুরের খাবারের ট্রে নিতে এসে প্যাটি বলল।

অসীমা ‘দেশ’ পত্রিকার একটা বহুব্যবহারে জীর্ণ হয়ে যাওয়া কপি থেকে চোখ তুলল। ‘দেশ’-এর এই সংখ্যাটা সে বস্টনে আসার সময় প্লেনে পড়বার জন্য এনেছিল। আজ পর্যন্ত প্রাণে ধরে সেটা ফেলে দিতে পারেনি। একটু খসখসে কাগজে ছাপা বাংলা অক্ষরগুলো তার কাছে চিরস্থায়ী আরাম আনে, সান্ত্বনা দেয়। সে প্রত্যেকটা ছোটগল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ না হোক ডজনখানেকবার পড়েছে। তার বাবা এই পত্রিকার শিল্পী, এগারোর পাতায় তাঁর একটা পেন অ্যান্ড ইংক ড্রইং রয়েছে। কুয়াশাঘেরা এক জানুয়ারির সকালে তাদের ফ্ল্যাটবাড়ির ছাত থেকে দেখা উত্তর কলকাতার দিগন্তরেখার ছবি। তার বাবা যখন ছবিটা আঁকছিলেন, সে পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। দেখছিল ইজেলের উপর ঝুঁকে পড়া বাবাকে, ঠোঁট থেকে সিগারেট ঝুলছে, কাঁধে জড়ানো একটা কালো কাশ্মীরি শাল।

“হ্যাঁ, চলো যাই,” অসীমা বলল।

প্যাটি অসীমাকে বিছানার থেকে বেরোতে সাহায্য করে, চটি পরিয়ে দেয়, একটা অন্য নাইটগাউন তার গায়ে জড়িয়ে দেয়। “ভাবো একবার,” তাকে কষ্ট করে দাঁড়াতে দেখে প্যাটি বলল, “আর দু’-একদিনে তোমার চেহারা অর্ধেক হয়ে যাবে।” অসীমার হাত ধরে প্যাটি তাকে ঘরের বাইরের

হলওয়েতে নিয়ে যায়। কিছুটা গিয়ে অসীমা দাঁড়িয়ে যায়, আর একটা যন্ত্রণার স্রোতে তার পা কাঁপছিল। সে মাথা নাড়ায়, দু'চোখ জলে ভরে যায়। "আমি পারব না।"

"তুমি পারবে। আমার হাতটা যত জোরে পারো চেপে ধরো। যতটা পারো চাপ দাও।"

এক মিনিট পরে তারা আবার হাঁটতে থাকে, নার্সদের ঘরের দিকে এগোয়। "কী চাও, ছেলে না মেয়ে?" প্যাটি জিজ্ঞেস করে।

"হাতে পায়ে দশটা করে আঙুল থাকলেই হবে," অসীমা ইংরেজিতে বলে। নিজের কোলে বাচ্চাটাকে কেমন দেখাবে সে-কথা ভাবলে মানবশরীরের এই ছোট ছোট অঙ্গ, জীবনের এই চিহ্নগুলোর কথা কল্পনা করতেই তার সবচেয়ে অসুবিধে হয়।

প্যাটি হাসে, একটু বেশি করেই হাসে, আর হঠাৎ অসীমা বুঝতে পারে তার ভুল। 'আঙুল' শব্দটা ইংরেজি বহুবচনে বলা উচিত ছিল, মানে 'এস' যোগ করে। এই ভুলটা তার কাছে গর্ভযন্ত্রণার চেয়েও বেশি কষ্টকর বলে মনে হল। সে ইংরেজি নিয়েই পড়াশোনা করেছে। বিয়ের আগে কলকাতায় সে কলেজে পড়ত। পাড়ার ছেলেমেয়েদের বাড়িতে গিয়ে টিউশনি করত, তাদের বারান্দায় বা বিছানায় বসে পড়াত। বাচ্চাদের টেনিসন বা ওয়ার্ডসওয়ার্থ মুখস্থ করাত, 'sign' বা 'cough'-এর মতো কঠিন শব্দ উচ্চারণ করতে শেখাত, অ্যারিস্টোটেলিয়ান বা শেকসপিয়ারিয়ান ট্র্যাজেডির মধ্যে তফাত বুঝিয়ে দিত। কিন্তু বাংলায় বহুবচন নেই। আঙুল বলতে একটা আঙুল যেমন বোঝাতে পারে, অনেকগুলো আঙুলও বোঝাতে পারে।

সে-সময়ই একদিন টিউশন করে ফেরার সময় অসীমা দেখল, তার মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, সোজা শোবার ঘরে গিয়ে তৈরি হয়ে নিতে। তাকে একজন পাত্র দেখতে এসেছে। এই নিয়ে তিন মাসে তিনজন। প্রথমজন ছিল দোজবর, চার ছেলেমেয়ের বাপ। দ্বিতীয়জন খবরের কাগজের কার্টুনিস্ট, তার বাবার চেনা। এসপ্লানেডে বাস অ্যাক্সিডেন্টে বাঁ হাত হারিয়েছে। এরা দু'জনেই তাকে নাকচ করায় অসীমা আশ্বস্ত হয়েছিল। তার বয়স তখন উনিশ, পড়াশোনা করছে, বউ হওয়ার কোনও তাড়া তার ছিল না। তবু, কোনও আশা না রেখেই এবারেও বাধ্য মেয়ের মতো সে তৈরি হতে গিয়েছিল। চুল খুলে নতুন করে বিনুনি বেঁধেছিল, ধেবড়ে যাওয়া কাজল মুছেছিল, ভেলভেটের পাফ দিয়ে মুখে কিউটিকুরা পাউডার মেখেছিল।

টিয়াপাখি-সবুজ রঙের একটা শাড়ি মা খাটের উপর বিছিয়ে রেখেছিলেন। অসীমা সেটাই পরল, সাবধানে কুঁচি করে সায়ার মধ্যে গুঁজে দিল। বসার ঘরে ঢোকার আগে করিডোরে থমকে দাঁড়াল অসীমা। ঘরের ভিতরে মা বলছেন, "রাঁধতে খুব ভালবাসে ও, উল বুনতেও পারে। আমি যে কার্ডিগানটা পরে আছি, এটা তো এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ করেছে।"

মায়ের সেলসম্যানশিপ দেখে অসীমার হাসি পেয়ে গিয়েছিল। আসলে কার্ডিগানটা বুনতে এক বছরের কাছাকাছি সময় লেগেছিল, তাও হাতাগুলো মা বুনে দিয়েছিলেন। দরজার বাইরে যেখানে বাইরের লোকজন জুতো খুলে রাখে, সেদিকে তাকাল অসীমা। দু' জোড়া চটির পাশে একজোড়া ছেলেদের জুতো খোলা আছে। এই রকম জুতো অসীমা কলকাতার রাস্তায় কখনও দেখেনি, এমনকী বাটার দোকানের শোকেসেও না। খয়েরি রঙের জুতো, কালো হিল, ফিতে আর সেলাই অফ-হোয়াইট। জুতোর দু'দিকে ছোট ছোট একসারি ফুটো, আর সামনের দিকটায় একটা সুন্দর নকশা করা, যেন কেউ ছুঁচ দিয়ে এমব্রয়ডারি করেছে। আরও মন দিয়ে দেখল অসীমা। জুতোর ভিতর দিকটায় প্রস্তুতকারক কোম্পানির নাম লেখা, অক্ষরগুলো আবছা হয়ে এসেছে, কী যেন একটা অ্যান্ড সন্স। সাইজটাও দেখা গেল, সাড়ে আট। পাশেই লেখা 'ইউ এস এ'। ভিতরে মা-র গলা শোনা যাচ্ছে, অসীমার প্রচুর প্রশংসা করছেন মা। এদিকে বাইরে দাঁড়িয়ে অসীমার কী যেন মনে হল, একটা অদম্য ইচ্ছের বশবর্তী হয়ে আস্তে আস্তে জুতোটার ভিতরে পা গলিয়ে দিল সে। জুতোর মালিকের পায়ের ঘাম আলতো করে তার পায়ের সঙ্গে মিশে গেল যেন, অসীমার বুক ধকধক করে উঠল। এটাই তার কাছে পুরুষমানুষের ছোঁয়ার শামিল। জুতোর চামড়া একটু কোঁচকানো, ভারী, তখনও মালিকের পায়ের ছোঁয়ায় গরম। বাঁ পায়ের জুতোটায় একটা জিনিস লক্ষ করে তার স্বস্তি হল। ফিতেটা একটা ফুটোয় ঢোকানোই হয়নি, বাদ থেকে গেছে।

সে জুতো থেকে পা বের করে ঘরে ঢুকল। লোকটা একটা চেয়ারে বসে আছে। যে ডবল বেডটায় তার ভাই রাতে ঘুমোয় সেটার ধারে বসে তার মা ও বাবা। লোকটা একটু মোটার দিকে, গম্ভীরমতো। তবে বয়স অল্পই। কালো, মোটা কাচের চশমা পরে আছে, নাকটা বেশ টিকোলো। যত্ন করে ছাঁটা সরু গোঁফ নেমে এসে থুতনির দাড়ির সঙ্গে মিশে গেছে। বেশ অভিজাত দেখাচ্ছে ওকে। খয়েরি মোজা পরে আছে লোকটা, প্যান্টটাও খয়েরি।

শার্টটায় সবুজ আর সাদা স্ট্রাইপ। লোকটা গম্ভীর মুখে নিজের হাঁটুর দিকে তাকিয়ে আছে।

অসীমা ঢুকতে সে চোখ তুলল না বটে, কিন্তু হেঁটে ঘরের অন্যদিকে যাওয়ার সময় তার দৃষ্টি অনুভব করল অসীমা। তবে সে যখন আড়চোখে ওদিকে তাকাল, লোকটা চোখ সরিয়ে নিয়েছে। প্রতিক্রিয়াহীন চোখ আবার হাঁটুর দিকে। একবার গলাখাঁকারি দিল বটে, যেন কিছু বলবে, কিন্তু কিছুই বলল না। অসীমার বাবাই কথা বলতে লাগলেন। লোকটা নাকি সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়েছে, তারপর বি. ই. কলেজে। দুই জায়গাতেই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। অসীমা বসে শাড়ির ভাঁজ ঠিক করতে লাগল। সে জানে, মা তাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছেন। অসীমা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি, বাঙালিদের পক্ষে বেশ লম্বাই, ওজন নিরানব্বই পাউন্ড। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বটে, তবে অনেকবার কেউ না কেউ বলেছেন, তাকে মাধবী মুখার্জির মতো দেখতে। তার নখগুলো একটু বেশিই লম্বা। আঙুলগুলো তার বাবার মতোই, শিল্পীসুলভভাবে সরু। ওঁরা তার লেখাপড়া নিয়ে কিছু প্রশ্ন করলেন, 'দ্য ড্যাফোডিল্‌স' থেকে কয়েক ছত্র আবৃত্তি করতে বললেন। লোকটার পরিবার থাকে নিউ আলিপুরে। তার বাবা একটা জাহাজ কোম্পানির কাস্টম্‌স বিভাগে লেবার অফিসার। "আমার ছেলে দু'বছর হল বিদেশেই থাকে," লোকটার বাবা বললেন, "বস্টনে ফাইবার অপটিক্‌স নিয়ে পি এইচ ডি করছে।" অসীমা না বস্টনের নাম শুনেছে, না ফাইবার অপটিক্‌সের। তাকে জিজ্ঞেস করা হল সে প্লেনে চড়তে চায় কি না। আর প্রচণ্ড ঠান্ডা, বরফ পড়ে এমন একটা অচেনা শহরে একা থাকতে রাজি কি না।

"কেন, উনি কি সেখানে থাকবেন না?", অসীমা সেই লোকটার দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, যার জুতো সে একটু আগে দখল করেছিল আর যে তার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি।

পাকা কথা হয়ে যাবার পর সে লোকটার নাম জানতে পারল। এক সপ্তাহ পর নেমন্তন্নের চিঠি ছাপা হল। দু'সপ্তাহ পর অগুনতি মাসি-পিসি-কাকি-মামি আর তুতো ভাইবোনরা তাকে ঘিরে আনন্দ করতে লাগল। তাকে সাজানোও হল। অসীমা ভাদুড়ি হিসেবে সেই তার শেষ কয়েক ঘণ্টা। তারপরই সে অসীমা গাঙ্গুলি হয়ে যাবে। তার ঠোঁটে রং দেওয়া হল, কপালে আর গালে কনেচন্দন পরানো হল, শয়েশয়ে কাঁটা আর ক্লিপ খোঁপা বেঁধে ফুল লাগানো হল। বিয়ে শেষ হওয়ার পর এই কাঁটা খুলতে ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে! তার

মাথা লাল নেটের ওড়না দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। সেদিন হাওয়ায় একটা ভিজেভাব ছিল, তার উপর অসীমার চুলই বোনদের মধ্যে সব চেয়ে ঘন, সুতরাং অত কাঁটা দেওয়া সত্ত্বেও চুল কিছুতেই চেপে বসছিল না। সে তার সবক'টা হার, নেকলেস, চোকার পরেছিল। এগুলো পরবর্তীকালে নিউ ইংল্যান্ডের এক ব্যাংকের একস্ট্রা-লার্জ সেফটি লকারে ফেলে দেওয়া হয় আর বেশির ভাগ সময় ওখানেই থাকে। লগ্ন এলে তাকে বাবার অলঙ্কৃত বিয়ের পিঁড়িতে বসানো হল, মেঝে থেকে পাঁচ ফুট উঁচুতে তুলে ফেলে সকলে তাকে বরের কাছে নিয়ে গেল। পানপাতায় মুখ ঢাকা অবস্থায় বরের চারদিকে তাকে সাতবার ঘোরানো হল।

কলকাতা থেকে আট হাজার মাইল দূরে কেমব্রিজে বরের সঙ্গে তার আসল আলাপ। সন্ধেবেলায় সে সাধ করে বরের জন্য রান্না করে। বুঝতে চেষ্টা করে মানুষটা কীসে খুশি হয়। এখানে র‍্যাশন-ট্যাশন নেই। চিনি, ময়দা, চাল বা নুন সবই ভেজালহীন, শুদ্ধ। এখান থেকে মাকে লেখা প্রথম চিঠিতে সে এই ব্যাপারটা লিখেছিল। এর মধ্যে সে জেনে গেছে যে তার স্বামী নোনতা স্বাদ বেশি পছন্দ করে, ভেড়ার মাংসের কারিতে আলু ভালবাসে আর রাতের খাওয়া একটু ভাত-ডাল খেয়ে শেষ করে। রাতে, পাশাপাশি শুয়ে, সে শোনে সারাদিন অসীমা কী কী করেছে। ম্যাসাচুসেট্স অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটা, দোকানগুলো, রাস্তাঘাটে বিরক্তিকরভাবে প্যামফ্লেট বিলি করা 'হরে কৃষ্ণ'রা, হার্ভার্ড স্কোয়ারে পিস্তাচিও আইসক্রিম খাওয়া.... সব। গ্র্যাজুয়েট ছাত্র হিসেবে তার রোজগার বেশি নয়। তা সত্ত্বেও অশোক কয়েক মাস পরপর কিছু টাকা জমিয়ে কলকাতায় তার বাবাকে পাঠায় কারণ সেখানকার বাড়িতে নতুন ঘর তৈরি হচ্ছে। জামাকাপড় নিয়ে তার খুঁতখুঁতেমির অন্ত নেই। ওদের প্রথম তর্ক বেধেছিল একটা সোয়েটার নিয়ে। অসীমা সেটা ওয়াশিং মেশিনে কাচতে গিয়ে শ্রিংক করিয়ে ফেলেছিল। ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে সে সবার আগে শার্টপ্যান্ট ছেড়ে টাঙিয়ে রাখে, তারপর দড়িলাগানো পাজামা পরে নেয়। ঠান্ডা বেশি হলে একটা পুলোভারও গলিয়ে নেয়। রবিবারে সে জুতো পালিশ করতে বসে। তিন জোড়া জুতো আছে অশোকের, দু'টো কালো, একটা খয়েরি। অসীমাকে প্রথমবার দেখতে যাওয়ার সময় সে খয়েরি জুতোজোড়াই পরেছিল। মেঝেতে খবরের কাগজ বিছিয়ে, বাবু হয়ে বসে পালিশ করে অশোক আর তাকে দেখলেই অসীমার মনে পড়ে যায় বাপের বাড়ির করিডোরে দাঁড়িয়ে

তার ছোট্ট অসাবধানতার কথা। সেই মুহূর্তটা মনে পড়লে তার একটু ধাক্কা লাগে বটে, তবে সে কথাটা অশোককে বলার কথা ভাবতেই পারে না। রাতে শুয়ে শুয়ে সারাদিনের কথা বলার সময়ও না।

হাসপাতালের অন্য তলায় ওয়েটিং রুমে অশোক বসে আছে। পাশের চেয়ারে পড়ে থাকা এক মাস আগের একটা 'বস্টন গ্লোব' নিয়ে বসে আছে সে। শিকাগোতে ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কনভেনশন চলার সময়কার রায়ট আর চাইল্ড স্পেশ্যালিস্ট ডা. বেঞ্জামিন স্পকের দু'বছরের জেল হওয়া সম্পর্কে বাসি খবর পড়ছে। তার হাতের ফাভ্‌র লিউবা ঘড়িটা হাসপাতালের বিরাট ধোঁয়াটে মুখ ঘড়িটার চেয়ে ছ'মিনিট ফাস্ট চলছে। ভোর সাড়ে চারটে। এক ঘণ্টা আগে অশোক তার বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিল, বিছানায় অসীমা যেদিকে শোয়, সেদিকটায় পরীক্ষার খাতা ছড়ানো। সে কাল ওইসব খাতা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। টেলিফোন বাজার শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল অশোকের। হাসপাতাল থেকে ফোন। ওপাশ থেকে কেউ খবর দেয়, অসীমা পুরোপুরি ডায়লেটেড আর তাকে ডেলিভারি রুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হাসপাতালে পৌঁছে সে জানতে পারে, অসীমা যে-কোনও মুহূর্তে সন্তানের জন্ম দিতে চলেছে। যে-কোনও মুহূর্তে। অদ্ভুত! এই তো ক'দিন আগের কথা। এক স্টিলরঙা শীতের সকালে জানালাগুলোতে শিল পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। অসীমা সকালের চা মুখে তুলেই ফেলে দিয়েছিল, বলেছিল অশোক নাকি চায়ে চিনির বদলে নুন দিয়ে ফেলেছে। অশোক অসীমার কাপ থেকে খেয়ে দেখেছিল, মোটেই নোনতা নয়, চা বেশ মিষ্টি। তবু অসীমা মানতে চায়নি, সবটা সিংকে ঢেলে ফেলে দিয়েছিল। তখন থেকেই সন্দেহ, পরে ডাক্তারও বললেন। তারপর থেকেই সকালে অশোকের ঘুম ভাঙত বমি করার শব্দে। দাঁত মাজতে গিয়ে বমি করত অসীমা। ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার আগে সে বেডসাইড টেবিলে এক কাপ চা রেখে দিয়ে যেত, অসীমা চুপ করে শুয়ে থাকত। অনেক দিনই ফেরার পর সে দেখেছে, অসীমা তখনও সেইভাবেই শুয়ে, চায়ের কাপটাও ঠিক তেমনভাবেই রাখা।

এখন অশোকের নিজেরই এক কাপ চা চাই। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে চা করা হয়নি। কিন্তু করিডোরের মেশিনটায় কাগজের কাপে শুধু কফি পাওয়া যায়, তাও পুরো গরম নয়। ঠান্ডামর্তো। কলকাতার এক চশমার দোকান থেকে বানানো মোটা চশমাটা খুলে হাতে নেয় অশোক। তার পকেটে

সব সময় যে সুতির রুমালটা থাকে, সেটা বের করে চশমার কাচটা মোছে। রুমালটার কোনায় হালকা নীল সুতোয় অশোকের নামের আদ্যক্ষর 'এ' এমব্রয়ডারি করে দিয়েছেন তার মা। তার কালো কুচকুচে চুলগুলো সাধারণত গুছিয়ে আঁচড়ানো থাকে, কিন্তু আজ উসকোখুসকো, খাড়া হয়ে আছে। সে অন্য ভাবী বাবাদের মতোই উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে থাকে। এ-পর্যন্ত ওয়েটিং রুমের দরজাটা দু'বার খুলেছে। নার্স ঢুকে কারও ছেলে বা মেয়ে হওয়ার কথা ঘোষণা করে চলে গেছে। অন্য সবাই নতুন বাবার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেছে, পিঠ চাপড়ে দিয়েছে, তারপর সেই সদ্য-পিতাকে ঘর থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুরুষরা সিগার, ফুল, ঠিকানা লেখার বই বা শ্যাম্পেন নিয়ে অপেক্ষা করছে। তারা সিগারেটের ছাই ফেলছে মেঝের উপর। অশোক অবশ্য সে-রসে বঞ্চিত। সে সিগারেট খায় না, মদও নয়। অসীমাই তাদের আত্মীয়বন্ধুদের ঠিকানা লিখে রাখে। সেই ছোট্ট নোটবইটা অসীমার ব্যাগের মধ্যেই আছে। আর ফুল? অশোকের কোনওদিন বউকে ফুল কিনে দেওয়ার কথা মনেই হয়নি।

সে হাঁটতে হাঁটতে 'গ্লোব' নামের পত্রিকাটা পড়তে থাকে। অশোক ডান পাটা একটু টেনে টেনে হাঁটে, যদিও তা প্রায় বোঝাই যায় না। ছোটবেলা থেকেই সে বই পড়তে পড়তে হাঁটতে পারে। সে নাকের সামনে একটা বই ধরে হাঁটতে হাঁটতে স্কুলে যেত, বই পড়তে পড়তেই নিউ আলিপুরে তাদের তিনতলা পারিবারিক বাড়ির এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেত, লাল সিমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে উঠত-নামত। তাকে কিছুই বিরক্ত বা উত্তেজিত করতে পারত না। এমনকী, সে কখনওই হোঁচটও খেত না। কৈশোরে সে সম্পূর্ণ ডিকেন্স পড়ে ফেলেছিল। অবশ্য সে আধুনিক লেখকদের লেখাও পড়ত, যেমন গ্রাহাম গ্রিন বা সমারসেট মম। সেই বইগুলো সে কিনত কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় তার প্রিয় বইয়ের দোকান থেকে, পুজোর সময় পাওয়া টাকাপয়সা দিয়ে। কিন্তু তার সব চেয়ে পছন্দ ছিল রাশিয়ান লেখকদের। তার ঠাকুরদা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপিয়ান সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি বালক অশোককে রাশিয়ান লেখকদের ইংরেজি তর্জমা জোরে জোরে পড়ে শোনাতেন। রোজ বিকেলে, অশোকের ভাই-বোনেরা যখন কবাডি বা ক্রিকেট খেলত, সে চলে যেত ঠাকুরদার ঘরে। ঠাকুরদা বিছানায় এক পায়ের উপর অন্য পা তুলে শুয়ে, বইটা বুকের উপর ধরে এক ঘণ্টা ধরে তাকে বই পড়ে শোনাতেন। অশোক তাঁর পাশে পা মুড়ে শুয়ে থাকত। সেই এক ঘণ্টা

অশোক তার চারপাশের জগৎকে পুরোপুরি ভুলে যেত। ছাতে খেলতে খেলতে তার ভাই-বোনেরা চেঁচামেচি করত, অশোক শুনতেই পেত না। ছোট্ট, ধুলোপড়া, অগোছালো ঘরটাকেও সে আর দেখতে পেত না। “রাশিয়ান লেখকদের পড়ো, বারবার পড়ো,” অশোকের ঠাকুরদা বলতেন, “ওঁরা তোমায় কোনওদিন ফেরাবেন না।” একটু ভাল করে ইংরেজি শিখে সে নিজে নিজেই বইগুলো পড়তে লাগল। পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যস্ত, শোরগোলের রাস্তাগুলোর মধ্যে নিশ্চয়ই চৌরঙ্গি বা গড়িয়াহাট আসবে। এই রাস্তাগুলো দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই সে ‘দ্য ব্রাদার্স কারামাজভ’ বা ‘আনা কারেনিনা’ বা ‘ফাদার্স অ্যান্ড সন্স’-এর বেশ কিছু পাতা পড়েছে। একবার অশোকের এক তুতো ভাই তাকে নকল করতে গিয়ে লাল সিমেন্টের সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙেছিল। অশোকের মা-র দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর বড় ছেলে ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’-এ মুখ ডুবিয়ে বাস বা ট্রামে চাপা পড়বে, আর বই পড়তে পড়তেই মারা যাবে।

একদিন সেটাই ঘটে গেল। ১৯৬১ সালের ২০ অক্টোবর গভীর রাতে। অশোকের বয়স তখন বাইশ, বি. ই. কলেজের ছাত্র। সে এইট্টিথ্রি আপ হাওড়া-রাঁচি এক্সপ্রেসে ঠাকুরদা-ঠাকুমার কাছে জামশেদপুর বেড়াতে যাচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেওয়ার পর ঠাকুরদা সেখানেই থাকছিলেন। সেই প্রথম অশোক বাড়ির বাইরে পুজোর ছুটি কাটাতে যাচ্ছিল। অশোকের ঠাকুরদা কিছুদিন আগে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন, সকালে ‘দ্য স্টেট্‌সম্যান’ আর বিকেলবেলা টলস্টয় ও ডস্টয়েভস্কি পড়ে শোনানোর জন্য বিশেষভাবে অশোককে আসতে বলেছিলেন তিনি। অশোকেরও ষোলো আনা ইচ্ছে ছিল যাওয়ার। তার সঙ্গে সেবার ছিল দু’টো সুটকেস। একটাতে জামাকাপড় আর উপহার, অন্যটা খালি। খালি, কেন না ঠাকুরদা জানিয়েছিলেন যে সেবারেই তিনি অশোককে তাঁর গ্লাসকেসে তালা দিয়ে যত্নে রাখা বইয়ের সম্ভার দিয়ে দেবেন। সারা জীবন ধরে সংগ্রহ করা সব বই অশোকের হাতেই তুলে দেবেন তিনি। ছোটবেলা থেকে অনেকবার তিনি অশোককে বলেছেন যে বইগুলো একদিন তারই হবে, আর অশোকের কাছেও এর চেয়ে বেশি কিছু চাইবার ছিল না। ঠাকুরদা তাঁর নিজের কয়েকটা ভাল বই তার জন্মদিনে বা অন্য বিশেষ কারণে তাকে আগেই উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু বইগুলো পুরোপুরি অধিকার করার দিন এসে পড়াতে অশোকের মোটেই ভাল লাগছিল না, কারণ ঠাকুরদা নিজে আর পড়তে

পারবেন না বলেই তাকে সেগুলো দিচ্ছেন। খালি সুটকেসটা সিটের নীচে ঢোকাতে ঢোকাতে তাই তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। সুটকেসটার এখন কোনও ওজন নেই, ফেরার সময় থাকবে। থাকার কারণটা ভেবে অশোকের বুকটা আরও ভারী হয়ে গেল।

ট্রেনে পড়ার জন্য সে একটা বই সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। নিকোলাই গোগোলের লেখা ছোটগল্পের একটা হার্ডবাউন্ড সংকলন, ক্লাস টুয়েল্‌ভ পাস করার পর ঠাকুরদা দিয়েছিলেন। প্রথম পাতায়, ঠাকুরদার সইয়ের নীচে অশোক নিজের নামটাও সই করেছিল। সে এই বইটা পড়তে খুব ভালবাসে বলে এতবার পড়েছে যে স্পাইনটা কিছুদিন আগে ছিঁড়ে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। অশোকের সবচেয়ে পছন্দের গল্পটা বইয়ের শেষে আছে, 'দ্য ওভারকোট'। বেশ রাতের দিকে কানফাটানো একটা হুইস্‌ল দিয়ে ট্রেনটা যখন হাওড়া স্টেশন ছেড়ে বেরোল, তখন ওই গল্পটাই সে পড়ছিল। দীর্ঘ, ধূসর প্ল্যাটফর্মটায় তখন অশোকের বাবা, মা আর ছয় ভাইবোন দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিল। সে 'দ্য ওভারকোট' গল্পটি অগুনতিবার পড়েছে, বেশ কয়েকটা জায়গা তার মুখস্থ। প্রত্যেকবারই গল্পটির দরিদ্র নায়ক আকাকি আকাকিয়েভিচের অদ্ভুত, ট্র্যাজিক জীবন তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করত। আকাকির সারা জীবন কেটেছিল অন্যের লেখা দলিল নকল করে আর অন্য সবার ঠাট্টার পাত্র হয়ে। অশোকের বাবাও প্রথম জীবনে আকাকির মতোই ছোটমাপের কেরানি ছিলেন। আকাকির ক্রিসেনিং ও নামকরণের সময়ে অনেকগুলি অদ্ভুত নাম আকাকির মা বাতিল করছেন, এই বৃত্তান্ত পড়ে প্রতিবারই তার একই রকম হাসি পেত। পেত্রোভিচ দর্জির পায়ের বিরাট বুড়ো আঙুলের বর্ণনা পড়ে সে শিউরে উঠত, "কচ্ছপের খোলের মতো মোটা ও শক্ত তার পায়ের বুড়ো আঙুলের বিকৃত নখ।" দামি কোটটি চুরি যাওয়ার আগের রাতে আকাকির বাছুরের মাংস, ক্রিম পেস্ট্রি ও শ্যাম্পেন খাওয়ার কথা পড়ে অশোকেরও জিভে জল আসত, যদিও এই সব খাবারের কোনওটিই সে কখনও খায়নি। শহরের মাঝখানে যে জায়গাটায় সে ছিনতাইবাজের খপ্পরে পড়েছিল, সে জায়গাটা আকাকির মনে হয়েছিল মরুভূমির মতো, সে নিরুপায়ভাবে হিমে জমে যাচ্ছিল। আকাকির মৃত্যুর বিবরণ পড়ে অশোকের চোখ অবধারিতভাবে জলে ভরে যেত। অবশ্য এও সত্যি, গল্পটা তার কাছে ধীরে ধীরে অর্থহীন হয়ে উঠছিল। যে-দৃশ্যগুলো সে যত্ন করে কল্পনা করেছিল, সেগুলো ফিকে হয়ে আসছিল।

তবু আকাকির আত্মা যেমন গল্পের শেষ কয়েকটা পাতায় ঘোরাফেরা করে, ঠিক তেমনই গল্পটা অশোকের আত্মার গভীরে বারবার হানা দিত। অর্থহীন যা কিছু, তার উপর আলো ফেলত। উজ্জ্বল করত পৃথিবীর অবশ্যম্ভাবী নিয়তিকে।

ট্রেনের বাইরে অন্ধকার নেমে আসছিল, হাওড়ার ছড়ানোছিটানো আলোগুলো মিলিয়ে গিয়ে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। সেকেন্ড ক্লাসের সাত নম্বর কোচে অশোকের বার্থ, এ সি কামরার ঠিক পেছনে। পুজোর সময় বলে ট্রেনে খুব ভিড়, সকলে সপরিবারে ছুটি কাটাতে যাচ্ছে। চারদিকে সাংঘাতিক চিৎকার-চেঁচামেচি। বাচ্চারা ভাল ভাল নতুন জামা পরে আছে, মেয়েদের চুলে রঙিন ফিতে বাঁধা। রওনা হওয়ার আগে অশোক পেট ভরে খেয়ে বেরিয়েছে। তাও রাতে যদি খিদে পায় ভেবে তার মা একটা চার বাটির টিফিন কেরিয়ার প্যাক করে সঙ্গে দিয়েছেন। সেটা অশোকের পায়ের কাছে রাখা। কাছাকাছি রয়েছেন এক বিহারি দম্পতি, তাঁদের কথা শুনে বোঝা যায় যে, তাঁদের বড়মেয়ের সদ্য বিয়ে হয়েছে। তাছাড়া আছেন বেশ হাসিখুশি, ভুঁড়িওয়ালা এক বাঙালি ব্যবসায়ী, পরনে সুট ও টাই। নাম ঘোষ। ঘোষ বললেন, তিনি দু'বছর ইংল্যান্ডে একটা কাজ করে সবে দেশে ফিরেছেন। আসলে তাঁর স্ত্রী ওদেশে বড্ড একলা হয়ে পড়ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডের খুব প্রশংসা করছিলেন। চকচকে, ফাঁকা রাস্তা, ঝকঝকে কালো গাড়ি, পরিষ্কার সাদা সব বাড়ি... স্বপ্নের মতো। সব ট্রেন সময়মতো চলে। ফুটপাথে কেউ থুতু ফেলে না। ঘোষের ছেলের জন্ম হয়েছে এক ব্রিটিশ হাসপাতালে।

জুতো খুলে পা মুড়ে বার্থের উপর উঠে বসতে বসতে ঘোষ অশোককে জিজ্ঞেস করলেন, "বিদেশ-টিদেশ যাওয়া হয়েছে, নাকি?" জ্যাকেটের পকেট থেকে এক প্যাকেট ডানহিল সিগারেট বের করে তিনি চারপাশের সকলকে দিতে চাইলেন, তারপর নিজে একটা ধরালেন।

"দিল্লিতে গিয়েছি একবার," অশোক বলল, "আর এখন বছরে একবার জামশেদপুরে যাই।"

ঘোষ জানালা দিয়ে হাত বের করে রাত্তিরের গায়ে সিগারেটের ছাই ফেললেন। "এ-রকম বিদেশের কথা বলছি না," ট্রেনের ভিতরের দিকটায় হতাশ চোখ বোলালেন তিনি। তারপর জানালার বাইরের দিকটায় মাথা দিয়ে ইশারা করলেন, "ইংল্যান্ড, আমেরিকা।" যেন বাইরের নাম-না-জানা

গ্রামগুলোই ওই সব দেশে পরিণত হয়েছে, " ওইসব জায়গায় যাওয়ার কথা ভেবেছ?"

"আমার প্রোফেসাররা মাঝেমাঝে বলেন বটে। তবে আমার তো পরিবার আছে," অশোক বলল।

ঘোষের কপালে ভাঁজ, "বিয়ে হয়ে গেছে নাকি?"

"না। মা, বাবা আর ছ'ভাইবোন। আমি বড়।"

"আর কয়েক বছরের মধ্যে তোমার বিয়ে হয়ে যাবে। তুমি বাবার বাড়িতে থাকবে, তাই তো?"

"হয়তো তাই।"

ঘোষ মাথা নাড়লেন, "তোমার বয়স এখনও কম। এখনও তুমি স্বাধীন," তিনি দু'হাত ছড়িয়ে স্বাধীনতার মাপটা বোঝাতে চাইলেন, "নিজের জন্য কিছু করো। বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগে লোটাকম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। বেশি ভাবতে যেয়ো না। দুনিয়াটা দেখো। ঠকবে না। এর পর কিন্তু দেরি হয়ে যাবে।"

"ঠাকুরদা বলেন, বইয়ের কাজটা তা-ই," অশোক সুযোগ পেয়ে হাতের বইটা খুলল, "এক ইঞ্চি না নড়ে বইয়ের মাধ্যমে পৃথিবী দেখা যায়।"

"সেটা নিজের নিজের ব্যাপার," ঘোষবাবু ভদ্রভাবে অন্যদিকে মাথা ঘোরালেন, সিগারেটের শেষটা তাঁর হাত থেকে টপ করে পড়ে গেল। তিনি পায়ের কাছে রাখা ব্যাগটা খুলে ডায়েরি বের করলেন, তারপর ২০ অক্টোবরের পাতাটা খুললেন। সুন্দর করে ফাউন্টেন পেনের ঢাকা খুলে সাদা পাতাটায় নিজের নাম-ঠিকানা লিখলেন। পাতাটা ছিঁড়ে অশোকের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, "যদি কখনও মাইন্ড চেঞ্জ করো ভাই, আমাকে জানিয়ো। আমি টালিগঞ্জে থাকি, ট্রামডিপোর ঠিক পেছনে।"

"ধন্যবাদ।" অশোক কাগজটা ভাঁজ করে বইয়ের শেষদিকে গুঁজে রাখল।

"তাস খেলবে?" ঘোষ পকেট থেকে বহু ব্যবহারে জীর্ণ এক প্যাকেট তাস বের করলেন, সেগুলোর পেছনে বিগ বেনের ছবি। তবে অশোক ভদ্রভাবে না করে দিল কারণ সে তাসের কোনও খেলাই জানত না। তা ছাড়া, সে তখন পড়তে চাইছিল। এক-এক করে যাত্রীরা বাথরুমের কাছে বেসিনে গিয়ে মুখ ধুয়ে এল, পাজামা পরল, কমপার্টমেন্টের চারপাশের পরদা টেনে দিয়ে ঘুমোতে গেল। ঘোষ উপরের বার্থে যেতে চাইলেন। সুটটা ভাঁজ করে রেখে খালি পায়ে মই বেয়ে দোতলার বার্থে উঠে পড়লেন তিনি। জানালাটা

পুরোপুরি অশোকের দখলে রয়ে গেল। বিহারি দম্পতিটিও কয়েকটা মিষ্টি খেয়ে নিল, একই কাপ থেকে মুখ না লাগিয়ে জল খেল আর দেয়ালের দিকে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। আলোটাও নিবিয়ে দিল তারা।

অশোকই একা জেগে রইল। জামাটাও ছাড়ল না সে, বসে বসে বইয়ের ভিতর ডুবে গেল। তার মাথার উপর একটা ছোট্ট কমজোরি আলো জ্বলছিল। কিছুক্ষণ পর পর সে চোখ তুলে জানালার বাইরে বিছিয়ে থাকা বঙ্গদেশীয় অন্ধকার দেখছিল। কখনও কখনও জীর্ণ কুটির বা তালগাছের আকার অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বোঝা যাচ্ছিল। সে হলুদ হয়ে আসা বইয়ের পাতাগুলো সাবধানে ওলটাচ্ছিল, কয়েকটা পাতায় উইপোকার তৈরি ছোট ছোট সুড়ঙ্গও রয়েছে। কয়লার ইঞ্জিনটার ধকধক আওয়াজের মধ্যে বেশ একটা স্বস্তিদায়ক ভাব টের পাচ্ছিল অশোক। বুকের ভিতরেও যেন ট্রেনের চাকার গুঁড়িয়ে দেওয়া ভাব। মাঝে মাঝে ইঞ্জিন থেকে উড়ে আসা আগুনের ফুলকি তার জানালার পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। তার মুখের একদিকটা, একটা হাত, গলা সবই মিহি কয়লার গুঁড়োয় ভরে যাচ্ছিল। অশোক জানত বাড়ি পৌঁছোনো মাত্র ঠাকুমা বলবেন, "মার্গো সাবান দিয়ে ভাল করে স্নান করো।" রাত আড়াইটা বাজল। অশোক তখনও পড়েই চলেছে। আকাকি আকাকিয়েভিচের পোশাকসংক্রান্ত দুঃখের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল সে, সেন্ট পিটার্সবার্গের চওড়া, বরফঢাকা, ঝোড়ো বাতাসে দীর্ণ রাস্তাগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে তো তখনও জানত না যে, সে নিজেই এক প্রবল শীতের, বরফের জায়গায় বাস করবে! অশোকের একা জেগে থাকার সেই অনাড়ম্বর মুহূর্তে ট্রেনের ইঞ্জিনসহ সাতটি বোগি লাইন থেকে নেমে গেল। ডিরেলমেন্ট। বোম ফাটার মতো শব্দ হল। প্রথম চারটে কামরা লাইনের পাশে খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়ল। পাঁচ নম্বর ও ছ'নম্বর কামরা দুটো, মানে এসি ও ফার্স্ট ক্লাস কোচ, একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা খেল, যাত্রীরা ঘুমের মধ্যেই প্রাণ হারাল। অশোক ছিল সপ্তম কামরায়, সেটাও উলটে গেল। ধাক্কার তীব্রতায় গিয়ে পড়ল পাশের খোলা মাঠে। দুর্ঘটনা ঘটেছিল কলকাতা থেকে ২০৯ কিলোমিটার দূরে, ঘাটশিলা ও ধলভূমগড় স্টেশনের মধ্যে একটা জায়গায়। গার্ডের পোর্টেব্‌ল ফোন কাজ করছিল না, দুর্ঘটনাস্থল থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দৌড়ে ঘাটশিলা গিয়ে গার্ডকে সাহায্য চাইতে হয়েছিল। লণ্ঠন, শাবল, কুঠার নিয়ে উদ্ধারকারীদের অকুস্থলে আসতে ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় লেগে গিয়েছিল।

অশোকের এখনও মনে পড়ে তাদের আসার শব্দ, চিৎকার করে তারা জানতে চাইছিল কেউ বেঁচে আছে কি না। মনে পড়ে, সে চেষ্টা করেছিল চেঁচিয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছিল না। তার মনে পড়ে চারদিকের অর্ধমৃত মানুষের কাতরানোর শব্দ, ট্রেনের দেওয়ালে টোকা মারার শব্দ। তারা ফিসফিস করে সাহায্য চাইছিল তবে তাতে কোনও সুবিধে হচ্ছিল না কারণ যারা শুনতে পাচ্ছিল তারা সকলেই আহত। দেহটা জানালার বাইরে অর্ধেক বেরিয়ে থাকা অবস্থায় তার বুক ও ডান হাত রক্তে ভিজে যাচ্ছিল। সে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। তা হলে কি সে ঠাকুরদার মতোই অন্ধ হয়ে গেল? পোড়ার তীব্র গন্ধ, মাছি ওড়ার শব্দ, বাচ্চাদের কান্না, জিভে রক্ত ও ধুলো মেশানো একটা স্বাদ, সব কিছু অশোকের মনে এখনও টাটকা। তেপান্তরের মাঠের মাঝখানে তারা পড়ে ছিল। সাধারণ গ্রামবাসী, পুলিশের লোক আর কয়েকজন ডাক্তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে ভাবছিল সে মরেই গেছে। কোমরের নীচের অংশে কোনও সাড় পাচ্ছিল না সে, তাই বুঝতে পারছিল না তার পায়ের উপর ঘোষের ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পড়ে আছে। আস্তে আস্তে ভোর হল। অশোক দেখল, সকালের নীল আলোটা একটুও বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। দেখল, আকাশে তখনও চাঁদ আর কয়েকটা তারা ভেসে আছে। একটু দূরে তার বইটা দু'টুকরো হয়ে পড়ে ছিল, পাতাগুলো বাতাসে উড়ছিল। সেই পাতাগুলোর দিকেই হঠাৎ চোখ পড়ল এক উদ্ধারকর্মীর, লণ্ঠনের একটুকরো আলো এসে পড়ল সেখানে। "এখানে কিছু নেই," অশোক একজনকে বলতে শুনল, "চলো!"

কিন্তু যে একমুহূর্ত আলোটা তার দিকে টিকে রইল, তার মধ্যেই অশোক হাত তুলল। ওই কাজটা করতে তার অবশিষ্ট জীবনীশক্তি যেন ক্ষয়ে এল। তার হাতে তখনও দ্য ওভারকোটের একটা ছেঁড়া পাতা ছিল, হাত তুলতে গিয়ে সেই পৃষ্ঠাটা উড়ে গেল। "দাঁড়াও," কেউ বলল, "বইটার পাশের ওই লোকটাকে হাত নাড়াতে দেখলাম..."

ধ্বংসস্তূপ থেকে তাকে তুলে স্ট্রেচারে করে অন্য একটা ট্রেনে তোলা হল। পাঠানো হল টাটানগরের এক হাসপাতালে। তলপেট ও ডানপায়ের হাড় ভেঙেছিল তার, পাঁজরের তিনটে হাড়েও ফ্র্যাকচারও হয়েছিল। তার জীবনের পরের বছরটা কাটল বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে, যাতে হাড়গুলো জোড়া লাগার সুযোগ পায়। তার ডান পা'টা সারা জীবনের মতো অসাড় হয়ে

যেতে পারে, এমন সম্ভাবনা ছিল। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে এনে তার কোমরে দু'টো স্ক্রু বসানো হল। ডিসেম্বর মাস নাগাদ তাকে আলিপুরের বাড়িতে আনা হল। চার ভাইয়ের কাঁধে চেপে মৃতদেহের মতো সে উঠোনের উপর দিয়ে ভিতরে এল, লাল সিমেন্টের সিঁড়ি দিয়ে উঠিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হল ঘরে। দিনে তিনবার তাকে চামচে করে খাইয়ে দেওয়া হত। পেচ্ছাপ-পায়খানা করতে হত একটা টিনের পাত্রে। ডাক্তার আর আত্মীয়স্বজনের আসা-যাওয়া লেগেই থাকত। এমনকী, জামশেদপুর থেকে তার দৃষ্টিশক্তিহীন ঠাকুরদাও তাকে দেখতে এলেন। কাগজে বেরোনো অ্যাকসিডেন্টের ফোটোগ্রাফগুলো গুছিয়ে রাখা হয়েছিল। অশোক দেখল, আকাশের পটভূমিতে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে ট্রেনটা, দাবিদারহীন মালপত্রের উপর বসে আছে পাহারাদাররা। ফিশপ্লেট আর নাটবল্টুগুলো পাওয়া গিয়েছিল রেললাইনের অনেক দূরে। অর্থাৎ নাশকতামূলক কাজকর্মের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায়নি। তবে তার কোনও প্রমাণও মেলেনি। অনেক মৃতদেহ চেনার অযোগ্য হয়ে গিয়েছিল। টাইমস অফ ইন্ডিয়া লিখেছিল, "ছুটি কাটাতে গিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে আলাপ।"

প্রথমদিকে সে শুধু ছাতের দিকে তাকিয়ে থাকত। ঘুরন্ত পাখাটার তিনটে ঘিয়ে রঙের ময়লা ব্লেড তার দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে অনবরত ঘুরতে থাকত। শুনতে পেত, পাখার হাওয়ায় তার মাথার পেছনের দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারটার ঘষটানির শব্দ। ডানদিকে তাকালে জানালার তাকে একটা ধুলোমাখা ডেটলের শিশি দেখা যায় আর জানালার পাল্লা দুটো খোলা থাকলে দেখা যায় ধূসর রঙের দেওয়াল। বাইরের আওয়াজ পৌঁছোত তার কানে। পায়ের শব্দ, সাইকেলের টিংটিং, কাক ডাকার শব্দ, রিকশার প্যাঁপোঁ (তাদের গলিটা এতই সরু যে গাড়ি ঢোকে না)। অশোক শুনত, কোণের টিউবকলে কলসিতে জল ভরছে কেউ। সন্ধেবেলা শাঁখের শব্দ কানে আসত। গন্ধও পাওয়া যেত। খোলা ড্রেনে জমতে থাকা সবুজ শ্যাওলার গন্ধ তার নাকে পৌঁছোত। এদিকে, বাড়ির ভিতরে জীবন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। বাবা নিয়মমাফিক কাজে যেতেন আসতেন, ভাইবোনেরা স্কুলে। মা রান্নাঘরে কাজ করতে করতে হলুদমাখা শাড়ি পরে এসে তাকে বারবার দেখে যেতেন। দিনে দু'বার কাজের মেয়ে এসে বালতিতে জল আর ন্যাতা নিয়ে এসে ঘর মুছে যেত।

দিনের বেলা সে পেনকিলার খেয়ে আচ্ছন্ন থাকত। রাতে স্বপ্ন দেখত,

ট্রেনের ভিতর আটকে আছে। তার চেয়েও খারাপ হত যখন সে স্বপ্নে নিজেকে আগের মতো সুস্থ দেখত, হেঁটে যাচ্ছে, স্নান করছে বা মাটিতে বাবু হয়ে বসে একথালা ভাত খাচ্ছে। হঠাৎই ঘুম ভেঙে যেত তার। সারা শরীর ঘামে চুপচুপে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে। অশোকের মনে হত, আর কোনওদিনই হাঁটতে পারবে না। শেষে দুঃস্বপ্ন এড়ানোর জন্যই সে রাতে পড়তে আরম্ভ করল। সে সময়ে তার স্থির শরীরটা নড়ার জন্য ছটফট করত, কিন্তু তার মগজ ও মনটা থাকত পরিষ্কার। তবে সে রাশিয়ান লেখকদের পড়তে চাইত না, কোনও উপন্যাসই পড়তে ইচ্ছে করত না তার। ওইসব বইয়ে দূরদেশের বর্ণনা তাকে নিজের বন্দিদশার কথাই বেশি করে মনে করিয়ে দিত। অশোক পড়ত ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বই। কোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত সে, টর্চের আলোয় সমীকরণের সমাধান করত। নিভৃত সেই রাতগুলোতে তার ঘোষের কথা মনে পড়ে যেত। "লোটাকম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ো...", সে ঘোষের গলা শুনতে পেত। মনে পড়ত, ঘোষ তাঁর ডায়েরির শেষ পাতায় নিজের ঠিকানাটা লিখে দিয়েছিলেন, টালিগঞ্জ ট্রামডিপোর পিছনে কোথায় যেন বাড়িটা...। সেই বাড়িতে এখন থাকেন এক বিধবা, পিতৃহীন ছেলেকে নিয়ে। প্রতিদিনই তার বাড়ির লোকেরা তাকে উৎসাহ জোগাত, মনে করিয়ে দিত সেই দিনটার কথা যখন সে বিনা সাহায্যে বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে। বাবা-মা এই দিনটার জন্যই প্রার্থনা করতেন। মা বুধবার মাংস খেতেন না। তবে যত দিন কাটতে লাগল, অশোক এক নতুন ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগল। সেই ভবিষ্যতে শুধু চলতে পারা ছিল না, অনেক দূরে চলে যাওয়ার কথাও ছিল। যেখানে সে জন্মেছে আর যেখানে সে প্রায় মরে যাচ্ছিল, সেখান থেকে অনেক অনেক দূরে চলে যেতে চাইছিল সে। পরের বছর সে লাঠিতে ভর দিয়ে কলেজে ফিরে গেল। গ্র্যাজুয়েটও হল। তারপর, বাবা-মাকে না বলে বিদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভরতির জন্য আবেদন করল। একশো শতাংশ ফেলোশিপসহ পড়ার সুযোগ পেয়ে ও নতুন পাসপোর্ট হাতে নিয়ে সে ব্যাপারটা বাড়িতে জানাল। বাবা তো হতবাক, "কিন্তু আমরা তোকে একবার প্রায় খুইয়ে বসেছিলাম!" ভাই-বোনেরা কাঁদল, মা চুপ করে গেলেন, তিনদিন খেলেন না। এ-সব সত্ত্বেও অশোক চলে গেল।

সাত বছর কেটে গেছে। কিন্তু আজও কয়েকটা স্মৃতি তাকে স্তব্ধ করে দেয়। তাড়াহুড়ো করে এম আই টির ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে যাওয়ার পথে বা ক্যাম্পাস মেল চেক করার সময় সেগুলো হঠাৎ আড়াল থেকে তার উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভাত খাওয়ার সময় বা রাতে অসীমার গা ঘেঁষে শুয়ে থাকার মুহূর্তে সেই স্মৃতিগুলো তার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে থাকে। জীবনের প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণে কয়েকটা টুকরো ছবির উপস্থিতি টের পায় সে। যেমন, বিয়ের সময় অসীমাকে জড়িয়ে আগুনে খই দেওয়ার মুহূর্তে বা আমেরিকার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়ের দিন ছোট্ট ধূসর বরফমোড়া শহরটাকে দেখে। দুমড়েমুচড়ে যাওয়া ট্রেনের বগি, তার তলায় চাপা পড়া তার নিজের শরীর, একটা কুড়কুড় শব্দ (সে তখন বুঝতে পারেনি সেটা তারই হাড় গুঁড়িয়ে মিহি ময়দার মতো হয়ে যাচ্ছে)। এই দৃশ্যগুলো সে শত চেষ্টা করেও ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। ব্যথা পাওয়ার স্মৃতি তাকে দুর্বল করে না কারণ সেটা তার মনেই নেই। আসলে অশোককে সবচেয়ে বেশি কাঁপিয়ে দেয় ট্রেনের ধ্বংসস্তূপে আটকে থাকার স্মৃতি, একটা প্রবল ভয় যে কেউ তাকে উদ্ধার করবে না। সেই ভীতিতে আজ পর্যন্ত সে ক্লসট্রোফোবিক হয়ে পড়ে, লিফ্‌টে তার দম আটকে আসে, গাড়ির জানালা খোলা না থাকলে অদ্ভুত চাপ অনুভব করে। প্লেনে বাল্কহেড সিট চেয়ে নেয়। কখনও কখনও বাচ্চাদের চিৎকারে তার বুকে ভয় ফেনিয়ে ওঠে। সহসাই সে হাতের চাপ দিয়ে দেখে নিতে চায় তার পাঁজরগুলো অক্ষত আছে কি না।

এই মুহূর্তে, হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে দাঁড়িয়ে অশোক বুকে হাত রেখে চাপ দিল, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে নিশ্বাস ছাড়ল। অসীমাই বাচ্চাটাকে গর্ভে ধারণ করেছে বটে, কিন্তু অশোকেরও শরীরটা ভারী। ভবিষ্যতের নতুন জীবন আর নিজের বর্তমান জীবনের চাপ সে টের পাচ্ছে। সে নিজে বাইশ বছর বয়সে মরতে বসেছিল। ভাবতেই তার জিভে যেন সেই ধুলোর স্বাদ, দুমড়ে যাওয়া কামরা আর বিশাল বিশাল উলটানো চাকার ছবি তার চোখে। এ-সব কিছুই হওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু সে এর মধ্যে দিয়ে বেঁচে ফিরেছে। ভারতে দু'বার ওর জন্ম হয়েছে, আর এই আমেরিকায় একবার। তিরিশ বছর বয়স হতে না হতেই তিনটে জন্ম! এর জন্য পূর্বতন তিন পুরুষকে পেন্নাম জানায় অশোক। কিন্তু ঈশ্বরকে প্রণাম করে না। অশোক কার্ল মার্কসের ভক্ত, সে মনে মনে ধর্ম মানে না। তবে আর একজনের আত্মাকে সে ধন্যবাদ দেয়। বইটাকে নয়। সেটা তো কলকাতা থেকে ২০৯ কিলোমিটার দূরের এক খোলা মাঠে অক্টোবর মাসের এক ভোরে কুচিকুচি হয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না জানিয়ে সে তার রক্ষাকর্তা রাশিয়ান লেখক গোগোলকে ধন্যবাদ জানায়। সেই মুহূর্তে প্যাটি ঘরে ঢোকে।

দুই

শিশুপুত্রটি ভোর পাঁচটা বেজে পাঁচে জন্মেছে। তার দৈর্ঘ্য কুড়ি ইঞ্চি, ওজন সাত পাউন্ড নয় আউন্স। নাড়ি কেটে বাচ্চাটাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে অসীমা এক ঝলক দেখতে পেয়েছিল। প্রাণীটা সাদা পেস্ট দিয়ে ঢাকা, কাঁধে মাথায় পায়ে রক্ত লেগে আছে। অসীমারই রক্ত। মেরুদণ্ডে একটা ছোট্ট ইঞ্জেকশন কোমর থেকে পা অবধি অসীমার সমস্ত অনুভূতি মুছে দিয়েছিল। কিন্তু ডেলিভারির শেষ দিকে অসহ্য যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছিল। সন্তানজন্মের প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর অসীমা প্রবলভাবে কাঁপতে শুরু করেছিল, জ্বর হলে মানুষ যেমন কাঁপে, তেমন। আধ ঘণ্টা ধরে কম্বলে জড়ানো অবস্থায় অসীমা কাঁপতে থাকল। একটা ঘোরের মধ্যে, তার ভেতরটা খালি হলেও বাইরেটা তখনও ফাঁপা-ফাঁপা। কথা বলতে পারছিল না তখনও, নার্সরা রক্তেভেজা গাউনটা পালটে অন্য একটা পরিয়ে দিয়ে গেল। অনেক জল খেয়েও অসীমার গলা ভিজছিল না। তাকে বলা হল, কমোডে বসে দুই পায়ের মধ্যে বোতল থেকে গরমজল ঢেলে দিতে। শেষে তাকে স্পঞ্জ দিয়ে পরিষ্কার করে দেওয়া হল, নতুন গাউন পরিয়ে হুইল চেয়ারে করে অন্য আরেকটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সে ঘরের লাইটগুলো মৃদু, চোখে আরাম হয়। বিছানার পাশে অন্য একটা খালি বিছানা। অশোক এসে দেখল, অসীমা একগাদা বালিশে হেলান দিয়ে বসে, প্যাটি তার ব্লাডপ্রেশার মাপছে। অসীমার দু'হাতে একটা লম্বাটে পুঁটুলি, সেটাই তাদের বাচ্চা। বিছানার পাশে ব্যাসিনেটের গায়ে একটা কার্ডে লেখা, "বেবি বয় গাঙ্গুলি।"

"এই যে, বাচ্চাটা এখানে," খুব নিচু গলায় অসীমা বলে, ঠোঁটে ফিকে হাসি। তার ত্বক ঈষৎ হলদেটে, ঠোঁট রংহীন। চোখের তলায় কালি, বিনুনি থেকে বেরিয়ে আসা অবিন্যস্ত চুল দেখে মনে হয়, কতদিন আঁচড়ানো হয়নি। ঠান্ডা লেগে গেলে যেমন হয়, তেমনই ভাঙা গলার স্বর। অশোক বিছানার পাশে একটা চেয়ার টেনে বসে, প্যাটি মায়ের কোল থেকে বাচ্চাকে বাবার

কোলে আনতে সাহায্য করে। শিশু ছোট্ট চিৎকার করে ওঠে। তার বাবা-মা দু'জনেই আঁতকে উঠলেও প্যাটি হাসে। অসীমাকে বলে, "দেখো, এর মধ্যেই তোমাকে চিনে গেছে।"

অশোক প্যাটির কথা মেনে হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কোলে নেয়, এক হাত ঘাড়ে আর অন্য হাত পেছনে দিয়ে। প্যাটি বলে, "শক্ত করে ধরো, ও দেহের উত্তাপ চায়। তোমরা যা ভাবছ তার চেয়ে ও বেশি মজবুত।"

অশোক ছোট্ট পুঁটলিটাকে আরও উপরে তোলে, নিজের বুকের কাছে চেপে ধরে, "এইভাবে?"

"হ্যাঁ, ওইভাবে," প্যাটি বলে, "এবার তোমরা তিনজন একটু একসঙ্গে থাকো। আমি যাচ্ছি।"

প্রথমে অশোক অবাক হয়ে গিয়েছিল। মাথার লম্বাটে আকৃতি, ফুলো ফুলো চোখের পাতা, গালের ছোট সাদা দাগ, নীচের ঠোঁটের উপর ঝুলে থাকা থলথলে উপরের ঠোঁট। সবই তাকে অবাক করছিল। ওদের দু'জনের চেয়ে বাচ্চা কয়েক পোঁচ ফরসা, এতটাই পাতলা যে কানের পাশে সবজে শিরাগুলো দেখা যাচ্ছে। মাথার চুল কালো, খসখসে। অশোক চোখের পাতাগুলো গুনতে চেষ্টা করে। ফ্লানেলের উপর দিয়ে হাত আর পা কোথায় তা বুঝে নিতে চায়।

"সব আছে," অসীমা আস্তে করে স্বামীকে বলে, "আমি দেখে নিয়েছি।"

"চোখ দুটো কেমন? খুলছে না কেন? খুলেছিল?"

অসীমা মাথা নাড়ে।

"ও কি দেখতে পাচ্ছে? আমাদের দেখতে পাচ্ছে?"

"পাচ্ছে বোধহয়। তবে স্পষ্ট নয়। আর সব রংও দেখতে পায় না। এত তাড়াতাড়ি নয়।"

তিনজন পাথরের মতো চুপচাপ বসে থাকে। "তুমি কেমন আছ? সব ঠিকঠাক ছিল তো?" অশোক স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে।

কিন্তু কোনও উত্তর আসে না। ছেলের মুখ থেকে নজর সরিয়ে অশোক দেখে, বউ ঘুমিয়ে পড়েছে।

সে আবার ছেলের দিকে তাকায়। এখন ছোট্ট চোখদুটো খোলা। চুলের মতোই কালো চোখ, পলক পড়ছে না। মুখটা যেন পালটে গেছে, অশোক কখনও এত নিখুঁত কোনও জিনিস দেখেনি। সে কল্পনা করে ওই দুটো চোখ তাকে কীভাবে দেখছে। অন্ধকার, কালচে, আবছা কিছু? ছেলের বাবা। ফের

তার মনে পড়ে যায় সেই মৃত্যুময় রাতের কথা, সেই সমস্ত স্মৃতি যা এই ক'বছর ক্রমাগত তার মনের মধ্যে নিভন্ত মোমবাতির মতো দপদপ করেছে। সেই ধ্বংসের থেকে রক্ষা পাওয়া তার জীবনের প্রথম ঐন্দ্রজালিক আশীর্বাদ। আর দ্বিতীয়টি এই সময়ে তার কোলে, ওজনহীন একটা অস্তিত্ব যা ক্রমাগত পালটাচ্ছে।

বাবা ছাড়া বাচ্চাকে দেখতে আরও তিনজন এল। সকলেই বাঙালি। কেমব্রিজের বাসিন্দা মায়া ও দিলীপ নন্দী, যাদের সঙ্গে কিছুদিন আগে পিউরিটি সুপ্রিমে আলাপ হয়েছিল ওদের। আর এলেন ডা. গুপ্ত। তিনি আদতে দেরাদুনের বাসিন্দা, অঙ্ক নিয়ে পোস্টডক্টরেট, বয়স পঞ্চাশের বেশি তবে অবিবাহিত। এম আই টির করিডোরে অশোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ। বাচ্চার খাওয়ার সময় হলে অশোকসহ পুরুষেরা ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। মায়া ও দিলীপ বাচ্চাকে ঝুনঝুনি আর বেবিবুক উপহার এনেছেন, বইটাতে শিশুর জীবনের সব তথ্য লিখে রাখার জায়গা আছে। এমনকী, তার প্রথম ছাঁটা চুলের কয়েকগুছি সাঁটিয়ে রাখার জন্য নির্দিষ্ট গোল জায়গা আছে। ডা. গুপ্ত দিলেন সচিত্র 'মাদার গুজ় রাইম্‌স।' "ভাগ্যবান ছেলে," বইদুটো দেখতে দেখতে অশোক বলল, "ঘণ্টাকয়েক বয়স, আর এখনই বইয়ের মালিক!" তার নিজের ছেলেবেলার সঙ্গে কত তফাত!

অসীমাও ঠিক একথাই ভাবছে, যদিও অন্য কারণে। নন্দীদের আর ডা. গুপ্তকে কাছে পেয়ে সে খুশি, কিন্তু এরা তো তার আসল আত্মীয়স্বজন নয়। যাদের এখন নতুন বাচ্চাকে ঘিরে থাকার কথা, তারা নেই। এরা তাঁদেরই বদলি। দাদু-দিদা, মাসি-পিসি, কাকা-মামাদের উপস্থিতি ছাড়া এই শিশুর জন্ম আমেরিকার অন্য সবকিছুর মতোই অগোছালো, যেন পূর্ণ নয়, আংশিক সত্য মাত্র। সে ছেলেকে চাপড় দেয়, আদর করে, খুঁটিয়ে দেখে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ছেলের জন্য তার দুঃখ হয়। এত একা হয়ে এই পৃথিবীতে প্রবেশ করতে আর কাউকে সে দেখেনি। দু'দিকের আত্মীয়রাই টেলিফোনবিহীন, তাই অশোক দু'বাড়িতেই টেলিগ্রাম করে দিল। "আপনাদের আশীর্বাদে মা ও ছেলে ভাল আছে।" আর ছেলের নামের ব্যাপারটা তারা অসীমার দিদার উপরই ছেড়ে দেবে ঠিক করেছে। বয়স আশির উপর হলেও তিনিই নিজের ছয় প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রীর নামকরণ করেছেন। অসীমার সন্তানসম্ভাবনার কথা জানতে পেরেই দিদা বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন কারণ পরিবারের

প্রথম 'সাহেব'-এর নামও তাঁকেই রাখতে হবে। তাঁর চিঠি আসা পর্যন্ত বাচ্চার নামকরণের ব্যাপারটা স্থগিতই রেখেছে অশোকরা। বার্থ সার্টিফিকেট পাওয়ার আবেদন করার জন্য হাসপাতালের দেওয়া ফর্মগুলো তারা উপেক্ষা করে চলেছে। কারণ তারা জানতে পেরেছে, দিদা লাঠিতে ভর দিয়ে পোস্টাপিসে নিজে হেঁটে গেছেন, চিঠিটা ডাকে ফেলেছেন। দশ বছর পর সেই তাঁর প্রথম বাইরে বেরোনো। চিঠিতে একটা মেয়ের নাম আছে, একটা ছেলের নাম। নামগুলো অসীমার দিদা কাউকে জানাননি।

চিঠিটা যদিও জুলাইতে, মানে একমাস আগে পোস্ট করা হয়েছে, সেটা এখনও পৌঁছোয়নি। তাতে অবশ্য স্বামী-স্ত্রীর কিছু এসে যায় না। তারা জানে, বাচ্চার নাম না হলেও চলে। তাকে খাওয়াতে হয়, আদর করতে হয়, সোনারুপো উপহার দিতে হয়, খাওয়ার পর পিঠে হাত বুলিয়ে ঢেঁকুর তোলাতে হয় আর ঘাড়ের পিছনে হাত দিয়ে কোলে নিতে হয়। বাচ্চার এগুলোই তার দরকার, নামটাম দরকার হবে পরে। ভারতে নাম দেওয়ার কোনও তাড়াহুড়ো থাকে না, বাবা-মা অপেক্ষা করে। সেরা ও মানানসই নামটি দিতে বেশ কয়েক বছর কেটে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। অসীমা-অশোক দু'জনেরই এমন বহু তুতো ভাইবোন আছে যাদের পাকাপাকি নাম দেওয়া হয়েছিল স্কুলে ভরতি হওয়ার সময়, পাঁচ কি ছ'বছর বয়সে। নন্দীরা বা ডা. গুপ্তও সেটা জানেন ও বোঝেন। তাঁরা একমত, দিদার চিঠির জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।

তা ছাড়া, ডাকনাম তো আছেই। বাঙালিদের সকলেরই দুটো করে নাম থাকে। ডাকনাম ধরে ডাকে পরিবারের লোক, বন্ধু, কাছের মানুষজন। বাড়িতে ডাকে, বা খুব ব্যক্তিগত কোনও সময়ে। ডাকনাম যেন ছোটবেলার স্মারক। মনে করিয়ে দেয়। জীবন সবসময় এমন জটিল, ওজনদার ছিল না। ওদের সকলেরই ডাকনাম আছে। অসীমার ডাকনাম মনু, অশোকের মিঠু। এত বড় হয়ে যাওয়ার পরেও এই নামগুলো ধরেই বাড়িতে ওদের ডাকা হয়। এগুলো আদরের নাম, ধমক দেওয়ার নাম, ভালবাসার নাম, মনে রাখার নাম।

প্রত্যেকটা ডাকনামের পাশে একটা করে ভালনামও থাকে। সেটা বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য। ভালনামটা দেখা যায় খামের উপর, সার্টিফিকেটে, টেলিফোন ডিরেক্টরিতে। বাইরের সব জায়গায়। (এইজন্য অসীমার মায়ের লেখা চিঠিতে খামের বাইরে 'অসীমা' লেখা থাকে, কিন্তু

ভেতরে লেখা থাকে 'মনু'।) ভালনামের ভাল ভাল সব মানে থাকে। অসীমা মানে 'সীমাহীন', অশোক মানে 'যার দুঃখ নেই'। ডাকনামের আবার ওসব মানে-টানে না থাকলেও চলে। ডাকনাম কখনও অফিসিয়ালি লেখা হয় না, সেগুলো শুধু মনে রাখার জন্য, ডাকার জন্য। সেইজন্যই সেগুলো বোকা-বোকা, কৌলীন্যহীন, ধ্বন্যাত্মক। শৈশবে একজনের অনেক ডাকনামও থাকতে পারে, তবে শেষে তার মধ্যে একটা পাকাপাকিভাবে থেকে যায়।

তাই একসময় বাচ্চাটা ফুটফুটে মুখটা কুঁচকে চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকা মুগ্ধ লোকজনকে দেখে। মি. নন্দী ঝুঁকে পড়ে ডাকেন, "বুড়ো!"

"ওর নাম কী? বুড়ো?" প্যাটি জিজ্ঞেস করে। সে অসীমার জন্য বেক্‌ড চিকেন নিয়ে এসেছে। অশোক সেটা খেয়ে নেয়। হাসপাতালে এখন অসীমার নাম "জেল-ও অ্যান্ড আইসক্রিম লেডি"।

"না, না। ওটা নাম নয়," অসীমা বুঝিয়ে দেয়, "আমরা নাম এখনও ঠিক করিনি। আমার দিদা করবেন।"

"তিনি শিগগিরি আসছেন তো?" প্যাটি বলে।

জন্ম দেওয়ার পর এই প্রথম অসীমা খোলামনে হাসে। দিদা আসবেন? গত শতাব্দীতে জন্ম এমন এক মহিলা, বিধবার সাদা থান পরা, তামাটে ত্বক! তিনি প্লেনে করে এই কেমব্রিজে আসবেন? অসীমা কিছুতেই ব্যাপারটা কল্পনায় আনতে পারে না। এলে ভাল হত বটে, কিন্তু সেটা একেবারেই অসম্ভব। অসীমার হাসি পেয়ে যায়। "না, চিঠি লিখে জানাবেন," সে বলে।

সেই সন্ধ্যায় অশোক অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গিয়ে দেখল চিঠিটা এসেছে কি না। তিনদিন কেটে গেছে। অসীমাকে নার্সরা শিখিয়ে দিয়েছে কীভাবে ডায়াপার পালটাতে হয় আর বাচ্চার নাভি পরিষ্কার করতে হয়। তাকে নুন মেশানো গরমজলে স্নান করানো হয়েছে যাতে সেলাই শুকিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। পেডিট্রিশিয়ানদের একটা তালিকাও ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে বুকের দুধ খাওয়ানো, বাচ্চার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা, টিকা দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে হাজারটা বুকলেট। বেবি শ্যাম্পু, ক্রিম, কিউ টিপ— এসবের অনেক নমুনাও আছে। চতুর্থ দিনে ভাল-খারাপ দু'রকম খবরই এল। ভাল খবর হল, ছেলে ও মাকে পরদিন হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। খারাপ খবর, হাসপাতালের বার্থ সার্টিফিকেটের কমপাইলার মি. উইলকক্স বলেছেন, ছেলের জন্য একটা নাম তাদের ঠিক করতেই হবে। ওরা জানতে পারল, আমেরিকায় বার্থ সার্টিফিকেট ছাড়া কোনও বাচ্চাকে হাসপাতাল

থেকে যেতে দেওয়া না। আর নাম ছাড়া বার্থ সার্টিফিকেট হবে কেমন করে? অসীমা বলল, "কিন্তু আমরা ওর নাম দিতে পারি না।"

মি. উইলকক্স রোগা, টাকমাথা এক ভদ্রলোক। তিনি বিরক্ত হয়ে গাঙ্গুলি দম্পতির দিকে তাকালেন। তাদের অসহায়, বিপন্ন মুখ থেকে তাঁর নজর সরে এল নামহীন শিশুটির উপর, "তাই নাকি? তা, কারণটা কী?"

"আমরা একটা চিঠির জন্য অপেক্ষা করছি," অশোক পুরো ব্যাপারটা উইলকক্সকে বুঝিয়ে বলল।

"ও!" মি. উইলকক্স বললেন, "দুঃখের বিষয়। আমি সার্টিফিকেটে 'বেবি বয় গাঙ্গুলি' লিখে দিতে পারি। নাম ঠিক হলে তোমরা পাকাপাকিভাবে ওটা পালটে নিয়ো।"

অসীমা অশোকের দিকে তাকায়, "তা-ই করি তা হলে?"

"আমি কিন্তু সে পরামর্শ দিচ্ছি না," মি. উইলকক্স উত্তর দিলেন, "তোমাদের কোর্টে যেতে হবে, অনেক খরচও হবে। লাল ফিতের ফাঁস আছে প্রচুর।"

"উফ," অশোক বিরক্তি প্রকাশ করল। তারপর সকলে চুপ।

কিছুক্ষণ পরে মি. উইলকক্স আবার বললেন, "তোমাদের কোনও দ্বিতীয় উপায় নেই? ব্যাকআপ সিস্টেম?"

অসীমার ভুরুতে ভাঁজ, "ব্যাকআপ মানে?"

"মানে, রিজার্ভে কিছু রাখা। দিদার দেওয়া নাম যদি পছন্দ না হয়, বদলে অন্য একটা কিছু।"

অসীমা ও অশোক দুজনেই মাথা নাড়ে। দিদার দেওয়া নাম পছন্দ না হওয়ার বিষয়টা তাদের মাথাতেই আসেনি। তাতে যে বয়োজ্যেষ্ঠর ইচ্ছেকে অসম্মান করা হয়।

মি. উইলকক্স পরামর্শ দেন, "নিজেদের নামে নাম রাখতে পারো ওর, বা কোনও পূর্বপুরুষের নামে। আমি যেমন তৃতীয় হাওয়ার্ড উইলকক্স। মহান ঐতিহ্য এটা। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের রাজারা এভাবে নাম দিতেন।"

কিন্তু তা সম্ভব নয়। বাঙালিদের মধ্যে বাবা বা ঠাকুরদার নামে ছেলের নাম, মা-ঠাকুমার নামে মেয়ের নাম দেওয়ার প্রথা নেই। বিলেত-আমেরিকায় যেটা শ্রদ্ধা ও বংশের ঐতিহ্যের চিহ্ন, ভারতে সেটা নিয়ে হাসাহাসি হতে পারে। বাঙালিদের মধ্যে ব্যক্তিগত নামকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়, ওটা ভাগ করে নেওয়ার জন্য নয়।

"তা হলে তোমরা যাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করো, এমন কোনও মহান মানুষের নামে ওর নাম রাখো," মি. উইলকক্সের চোখে আশার ঝলক। নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "ভাবো। আমি কয়েক ঘণ্টা বাদে আবার আসব।" তিনি চলে গেলেন।

দরজাটা বন্ধ হওয়ার মুহূর্তে অশোকের মনে একটা নাম ভেসে এল। যেন বহুদিনের চেনা, যেন সে চিরকালই জানত এটাই তার ছেলের ডাকনাম হবে। তার মনে পড়ল মুঠোর ভেতর কুঁকড়ে যাওয়া একটা বইয়ের পাতা, লণ্ঠনের আলোয় হঠাৎই চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া। তবে এই প্রথমবার তার কাছে সেই স্মৃতি ভয় না, কৃতজ্ঞতার বোধ নিয়ে এল।

"হ্যালো, গোগোল," শিশুপুত্রের ছোট্ট মুখ আর পুঁটলিপাকানো শরীরটার দিকে ঝুঁকে পড়ে অশোক বলল, "গোগোল!" তার স্বরে তৃপ্তি। উত্তরে বাচ্চাটা মন দিয়ে একটা হাই তুলল।

অসীমার গোগোল নামে আপত্তি নেই। সে জানে, এটা শুধু তার ছেলের জীবনের নাম নয়, তার স্বামীর জীবনও এর সঙ্গে জড়িত। দুর্ঘটনার ব্যাপারটা তার জানা। প্রথম যখন শুনেছিল, তার মনে নতুন বিবাহিত জীবনের মানানসই ভদ্র ব্যবহার ছাড়া কিছু ছিল না। কিন্তু আজ সে-ঘটনার কথা ভাবলে তার রক্ত হিম হয়ে আসে। বহু রাতে স্বামীর চাপা চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেছে, পাতালরেলে একসঙ্গে কোথাও যাওয়ার সময় দেখেছে লাইনের উপর চাকার ধাতব শব্দে অশোক হঠাৎই ভীষণ চুপ করে যায়। সে নিজে গোগোলের লেখা পড়েনি বটে, কিন্তু মনের বুকশেলফে টেনিসন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের পাশে তাঁকে রাখতে কোনও আপত্তি নেই তার। তা ছাড়া, এটা তো ডাকনাম। হেলাফেলার নাম। আপাতত হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার চাবিকাঠি। মি. উইলকক্স টাইপরাইটার নিয়ে ফিরে এলে অশোক তাঁকে নামটার বানান বলে দেয়। হাসপাতালের ফাইলে গোগোল গাঙ্গুলির নাম নথিভুক্ত হয়ে গেল। প্যাটি বাচ্চার কাঁধের উপর নিঃশব্দে চুমু দিয়ে বলল, "গুডবাই, গোগোল।" এদিকে কোঁচকানো সিল্কের শাড়িটা আবার পরে ফেলেছে অসীমা। প্যাটি তাকেও বিদায় জানিয়ে বলল, "গুড লাক।" গোগোলের প্রথম ছবিটা তুললেন ডা. গুপ্ত। শেষ গ্রীষ্মের আগুনে গরম, ফলে ছবিটা সামান্য ওভার এক্সপোজড হল বটে। কম্বলে জড়ানো পুঁটলি গোগোলকে কোলে নিয়ে হাসপাতালের সামনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে অসীমা, সোজা ক্যামেরার দিকে চেয়ে। রোদে চোখদুটো কুঁচকে গেছে। এক

পাশে অশোক, হাতে সুটকেস, মাথা নিচু করে হাসছে। পরে, এই ছবির উলটো পিঠে বাংলায় অশোক লিখে রাখবে, 'গোগোল পৃথিবীতে প্রবেশ করল'।

গোগোলের প্রথম বাড়ি হার্ভার্ডের থেকে ১০ মিনিটের দূরত্বে, এম আই টির থেকে ২০ মিনিট। চারতলা বিল্ডিংয়ের দোতলায় একটা ফার্নিশড অ্যাপার্টমেন্ট। বাড়িটার চারদিকে কোমর পর্যন্ত উঁচু চেন-লিংক বেড়া, বাইরেটায় স্যামন মাছের মতো রংঅলা অমসৃণ নুড়ি লাগানো দেওয়াল। ছাতটা সিগারেটের ছাইয়ের মতো রঙের, অনুজ্জ্বল। তার সঙ্গে পাশের ফুটপাথ ও রাস্তার পুরো মিল আছে। ফুটপাথের পাশে সারাদিন ধরে পার্কিং মিটারে পার্ক করা গাড়ি সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ব্লকের কোনায় পুরনো বইয়ের একটা দোকান। সেটাতে ঢুকতে গেলে ফুটপাথ থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে হয়। উলটো দিকে ছোট্ট ধুলোটে দোকানটায় খবরের কাগজ, সিগারেট, ডিম বিক্রি হয়। অসীমার অবশ্য ঘেন্না করে কারণ একটা লোমশ কালো বেড়াল দোকানটার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, যে-কোনও তাকে বসে থাকে। এইসব ছোটখাটো ব্যাবসা ছাড়াও কাছাকাছি আরও নুড়ি লাগানো বাড়ি আছে। সবক'টা একই রকম দেখতে, একই আয়তনের। তাদের একইরকম জীর্ণ দশা। এই বাড়িতেই অসীমাকে আঠারো মাস আগে তার স্বামী নিয়ে এসেছিল। সেটা ছিল ফেব্রুয়ারি মাস, রাতের দিকে লোগান এয়ারপোর্টে নেমেছিল অসীমা। সেই রাতের অন্ধকারে চলমান ট্যাক্সির জানালা দিয়ে অসীমা কিছুই ঠাওর করতে পারেনি, যদিও জেট ল্যাগের দরুন তার চোখে ঘুম ছিল না। শুধু দেখেছিল, ভাঙা নীলচে-সাদা ইটের ঢিবির মতো রাস্তার পাশে বরফের স্তূপ। পরদিন সকালে নিজের পাতলা চটির ভিতর অশোকের মোজা পরে অল্প সময়ের জন্য বাইরে এসেছিল অসীমা। নিউ ইংল্যান্ডের জমাটবাঁধা ঠান্ডা তার কানে ও চোয়ালে আঘাত করছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে অসীমা প্রথমবার আমেরিকার বাস্তবিক চেহারাটা দেখতে পেল। পাতাহীন গাছগুলোর ডালে জমে থাকা বরফ, বরফের মধ্যে পড়ে থাকা কুকুরের মলমূত্র। রাস্তায় কোনও মানুষ নেই।

অ্যাপার্টমেন্টে তিনটে ঘর আছে। পরপর, মধ্যে কোনও করিডোর নেই। প্রথমে লিভিং রুম, তিনদিকের জানালা দিয়ে রাস্তাটা দেখা যায়। মাঝখানে শোবার ঘর, তার মধ্যে দিয়ে সরাসরি পিছনের রান্নাঘরে পৌঁছোনো যায়।

অসীমা যেমন ভেবেছিল আদৌ তেমন নয়। লাইটহাউস বা মেট্রো সিনেমাহলে ‘গন উইথ দ্য উইন্ড’ বা ‘দ্য সেভেন ইয়ার ইচ’-এর মতো ছবিগুলো ভাই-বোনদের সঙ্গে দেখতে গিয়ে তার যেমন ধারণা হয়েছিল, এ-বাড়িটা তার থেকে একেবারেই অন্যরকম। শীতকালে অ্যাপার্টমেন্টটায় ঠান্ডা হাওয়া জমে যায়, গ্রীষ্মে অসহ্য গরম। জানালার মোটা কাচের শার্শি বিচ্ছিরি খয়েরি রঙের গোদা পরদায় ঢাকা। বাথরুমে আরশোলা আছে, রাতের বেলায় টাইলের মধ্যেকার ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু এর কোনওটা নিয়েই সে অভিযোগ করেনি। নিজের দুঃখ মনেই রেখেছে সে, অশোককে বিব্রত করতে চায়নি। বা কলকাতাতে বাপের বাড়ির কাউকে বিরক্ত করতে চায়নি। বরং বাড়িতে চিঠি লেখার সময় চারটে বার্নার লাগানো বড় গ্যাসচুল্লিটার কথা লিখেছে, বা গরম জলের কলের কথা। ঠান্ডা জলের কল থেকে সোজাসুজি জল খাওয়া কতটা নিরাপদ, তাও জানিয়েছে।

বাড়িটার উপরের দুটো তলায় বাড়িঅলারা থাকে। মি. মন্টগোমেরি হার্ভার্ডে; সোশিয়োলজি পড়ান। তাঁদের দুটি মেয়ে, নাম অ্যাম্বার ও ক্লোভার, বয়স সাত ও নয় বছর। তাদের কোমর পর্যন্ত চুল কখনও বাঁধা হয় না। গ্রীষ্মের দিনে তারা পিছনের উঠোনে একটিমাত্র গাছের ডালে বাঁধা টায়ারের দোলনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলা করে। প্রথম-প্রথম ওরা প্রোফেসরকে ‘মি. মন্টগোমেরি’ বলে ডাকত। পরে তিনিই বলেছেন অ্যালান বলে ডাকতে। ভদ্রলোকের জটপাকানো মরচে রঙের দাড়ি আছে, তাতে বয়স বেশি দেখায়। ওরা দেখেছে, হাঁটতে হাঁটতে হার্ভার্ডে ঢুকছেন তিনি, ছেঁড়াখোড়া একটা ট্রাউজ়ার পরনে, সঙ্গে সুয়েডের জ্যাকেট আর হাওয়াই চটি। অশোক প্রায়ই ভাবে, এখানকার প্রোফেসরদের চেয়ে ভারতে রিকশাওয়ালারা বেশি ভাল জামাকাপড় পরে। সে নিজে গাইডের সঙ্গে দেখা করতে হলে এখনও জ্যাকেট ও টাই পরে যায়। মন্টগোমেরিদের একটা ঘষা সবুজ রঙের ভক্সওয়াগান ভ্যান আছে। সেটার সারা গায়ে নানারকম পোস্টার মারা, ‘কোয়েশ্চেন অথরিটি! গিভ আ ড্যাম! ব্যান দ্য ব্রা! পিস!’ বেসমেন্টে তাদের একটা কাপড় কাচার যন্ত্র আছে। সেটা অশোক আর অসীমাও ব্যবহার করতে পারে। আর ওদের লিভিং রুমে একটা টেলিভিশন আছে, যার শব্দ ছাদ ভেদ করে অসীমাদের ঘরেও পরিষ্কার শোনা যায়। সেইভাবেই এপ্রিল মাসের এক রাতে খেতে খেতে তারা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ারের হত্যার খবর শুনেছিল। সম্প্রতি, সেনেটর রবার্ট কেনেডির হত্যার খবরও তারা সেভাবেই জেনেছে।

কখনও কখনও অসীমা আর অ্যালানের স্ত্রী জুডি উঠোনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একই তারে কাপড় মেলে। জুডি সবসময় ব্লু জিন্‌স পরে থাকে। গরমের সময়ে সে পরে হাঁটু পর্যন্ত ছিঁড়ে হাফপ্যান্ট করা জিনস্। আর গলায় বারোমাস একটা ঝিনুকের মালা। খোড়ো হলুদ চুলের উপর দিয়ে একটা লাল স্কার্ফ বেঁধে ঘাড়ের পেছনে গিঁট দিয়ে রাখে সে। ওর মেয়েদের চুলও ঠিক ওর মতন। সপ্তাহে কয়েকদিন সমারভিলের একটা মহিলাদের স্বাস্থ্য-সংস্থায় সে কাজ করে। অসীমার গর্ভবতী হওয়ার পর বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত জুডি সমর্থন করেছিল বটে, কিন্তু হাসপাতালে সন্তানজন্ম দেওয়ার ব্যাপারটা একদম পছন্দ করেনি। জুডির দু'টি বাচ্চাই বাড়িতে হয়েছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ধাইমাদের সাহায্যে। কোনও কোনও রাতে জুডি আর অ্যালান বেরিয়ে যায়। অ্যাম্বার ও ক্লোভারের দেখাশুনো করার কেউ থাকে না। একবারই ওরা অসীমাকে বলেছিল একটু চোখ রাখতে। সেবার ক্লোভার ঠান্ডা লেগে অসুস্থ ছিল। সেদিন ওদের অ্যাপার্টমেন্ট দেখে অসীমার তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া। একটা ছাতের তফাতে এত অগোছালো সংসার! সব জায়গায় ডাঁই করে জিনিসপত্র রাখা। ঘরে বই আর কাগজের স্তূপ, রান্নাঘরে কাউন্টারে নোংরা প্লেট ডাঁই করে রাখা, থালার মাপের বড় বড় অ্যাশট্রেতে ভরতি সিগারেটের টুকরো। মেয়ে দুটোর খাটটায় জামাকাপড়ের ঢিপি। অ্যালান ও জুডির খাটটার কোনায় একবার বসতে না বসতেই সে চিৎকার করে পেছনদিকে উলটে পড়েছিল। বুঝতে পারেনি তোশকটা জলে ভরা। ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল আর টি-ব্যাগের বদলে ফ্রিজের উপর অসংখ্য হুইস্কি আর ওয়াইনের বোতল রাখা। বেশির ভাগই খালি। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অসীমার মনে হচ্ছিল সেও মাতাল হয়ে গেছে।

হাসপাতাল থেকে ডা. গুপ্তর গাড়িতে বাড়ি ফিরল তারা। ওদের একটা মাত্র বাক্স-ফ্যান। প্রচণ্ড গরমে লিভিং রুমে সেটার সামনে এসে যখন ওরা বসল, তখন হঠাৎই ওরা একটা পরিবার হয়ে উঠেছে। বসার ঘরটায় অবশ্য কোনও কাউচ নেই, আসবাব বলতে ছ'টা তিনঠেঙে চেয়ার। সেগুলোর হেলান দেওয়ার জায়গাটা কাঠের। বসার গদিগুলো কালো, তেকোনা। তিন কামরার এই বিষণ্ণ অ্যাপার্টমেন্টটায় ফেরত এসে হাসপাতালের জন্য অসীমার মনটা সহসাই খারাপ লাগতে শুরু করল। সেখানকার ব্যস্ত ভাব, প্যাটির হাসি, নিয়ম করে এনে দেওয়া জেল-ও আর আইসক্রিমের জন্য তার মনটা কেমন করে ওঠে। তিনটে ঘরের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার বিরক্ত

লাগে। প্লেটগুলো নোংরা হয়ে পড়ে আছে কেন? বিছানাটাও অগোছালো। এতদিন অসীমা মেনে নিয়েছিল যে এখানে ঘর ঝাড় দেওয়া, বাসন মাজার, কাপড় কাচার, মুদির দোকানে যাওয়ার লোক পাওয়া যায় না। মন খারাপ বা শরীর খারাপ হলেও নিজেই রান্না করতে হয়। মেনে নিয়েছিল, আমেরিকার জীবনে ওসব সুযোগ-সুবিধে পাওয়া যায় না। কিন্তু এখন তার কোলে একটা বাচ্চা কাঁদছে। বুকে দুধ ভরে টনটন করছে। সারা শরীর ঘামে চিটচিটে, নিম্নাঙ্গে এমন ব্যথা যে বসতে কষ্ট হচ্ছে। এসব কিছু হঠাৎ অসহ্য লাগল অসীমার।

"আমি আর পারছি না," অশোককে বলে বসল সে। অশোক সবে বউয়ের জন্য এক কাপ চা নিয়ে ঢুকেছে। এর বেশি কী করা যেতে পারে তার মাথায় আসেনি। আর অসীমার চা দেখে গা গুলিয়ে উঠছে।

অশোক বুঝতে পারে না কী করা উচিত। "কয়েক দিনে সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখো," উৎসাহ দেওয়ার জন্যই সে বলল। কাপটা জানালার তাকে রেখে সে গোগোলের দিকে দেখল। গোগোল আপনমনে মার দুধ খেয়ে চলেছে, ঠোঁট নড়ছে নিজস্ব ছন্দে। "ও বোধহয় আবার ঘুমিয়ে পড়ল," মন্তব্য করল অশোক।

"না, হবে না।" অসীমা গোমড়া গলায় বলে। স্বামী-ছেলে কারওর দিকে সে তাকায় না। পরদাটা একটু টানে, আবার ছেড়ে দেয়। "এভাবে না, এখানে না।"

"তুমি কী বলছ, অসীমা?"

"বলছি, তাড়াতাড়ি ডিগ্রিটা শেষ করো," অসীমা বলে। তারপর অপ্রিয় সত্য বলার মতো গড়গড় করে উগরে দেয়, "আমি বলছি, এই দেশে আমি গোগোলকে একা মানুষ করতে পারব না। সেটা ঠিক হবে না। আমি ফিরে যেতে চাই।"

অশোক স্ত্রীর দিকে তাকায়। বিয়ের সময়কার অসীমার সঙ্গে এখনকার অসীমার অনেক তফাত। মুখটা শুকিয়ে গেছে, চেহারাটা আরও চোখা হয়েছে। কেমব্রিজের এই জীবন এর মধ্যেই মেয়েটার উপর অনেক ছাপ ফেলেছে। বেশ কয়েকবার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পর অশোক দেখেছে, বিষণ্ণ অসীমা একা-একা বিছানায় শুয়ে তার বাবা-মায়ের একই চিঠি অনেকবার পড়ছে। ভোরবেলা টের পেয়েছে, অসীমা চুপিচুপি কাঁদছে। হাত বাড়িয়ে বউকে জড়িয়ে ধরেছে সে, কিন্তু কিছু বলতে পারেনি। মনে করেছে, ওকে বিয়ে করে এই অচেনা দেশে নিয়ে আসার দায় তো তারই। ট্রেনের

সহযাত্রী সেই ঘোষবাবুকে মনে পড়ে যায় তার, তিনি স্ত্রীর জন্যই ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে এসেছিলেন। “ফিরে আসাটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে,” মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে অশোককে ঘোষবাবু বলেছিলেন।

দরজায় একটা হালকা টোকা শোনা যায়। অ্যালান, জুডি, অ্যাম্বার, ক্লোভার সকলে বাচ্চা দেখতে এসেছে। চেক কাপড়ে ঢাকা একটা ডিশ জুডির হাতে, সে ব্রকোলি কিশ বানিয়ে এনেছে। অ্যালান অ্যাম্বার-ক্লোভারের ছোটবেলাকার জামাকাপড় একটা বড় ঝোলায় ভরে নিয়ে এসেছে। সেটা নামিয়ে রেখে এক বোতল ঠান্ডা শ্যাম্পেন খুলল। ফেনাওঠা পানীয়টা মেঝেতে চলকে পড়ল, তারপর সেটাকে মগে ঢালা হল। গোগোলের নামে শুভেচ্ছা জানিয়ে মগ তোলা হল, তবে অশোক ও অসীমা সত্যি সত্যি শ্যাম্পেন খাচ্ছিল না। চুমুক দেওয়ার ভান করছিল শুধু। অ্যাম্বার ও ক্লোভার অসীমার দু'দিক ঘেঁষে দাঁড়াল। গোগোল দু'জনেরই আঙুল ছোট্ট মুঠোতে জড়িয়ে ধরায় কী খুশি তারা! জুডি অসীমার কোল থেকে গোগোলকে নিল, আদর করে বলল, “হাই হ্যান্ডসাম!” তারপর অ্যালানের দিকে ফিরে বলল, “চলো না, আরেকটা বাচ্চা আনি!” অ্যালান মেয়েদের ছোট্ট খাটটা বেসমেন্ট থেকে উপরে নিয়ে আসার প্রস্তাব দেয়। আনা হলে অশোক আর অ্যালান খাটটা ওদের বিছানার পাশে পেতে ফেলে। অশোক কোনার দোকানটায় গিয়ে এক প্যাকেট ডিসপোসেব্‌ল ডায়াপার কিনে আনে, ড্রেসিং টেবিলের উপর অসীমার পরিবারের লোকেদের বাঁধানো সাদা-কালো ছবিটার জায়গায় সেটা রাখা হয়। “কিশটার জন্য তিনশো পঞ্চাশ মিনিট যথেষ্ট,” জুডি অসীমাকে বলে। “কিছু লাগলে আমাদের হাঁক দিয়ো,” চলে যাওয়ার আগে অ্যালান বলে।

তিনদিন পরের কথা। অশোক এম আই টিতে কাজে গেছে। অ্যালান হার্ভার্ডে, মেয়ে দুটো স্কুলে। জুডি অন্যদিনের মতো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেই প্রথম অসীমা ফাঁকা বাড়িটাতে গোগোলকে নিয়ে একা। জেটল্যাগের পরে ঘুম নিয়ে যতটা কষ্ট হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি কষ্ট হচ্ছে এখন। অসীমা বসার ঘরে জানালার ধারে তিনঠেঙে একটা চেয়ারে তেকোনা কুশনের উপর বসে সারাদিন কাঁদে। গোগোলকে খাওয়ানোর সময়, ঘুমপাড়ানোর সময়, বাচ্চার কান্না থামাতে থামাতে কাঁদে অসীমা। পোস্টম্যান চলে গেলে কাঁদে, কেননা কলকাতার থেকে কোনও চিঠি আসেনি। ডিপার্টমেন্টে অশোককে ফোন করে

উত্তর না পেলে সে কাঁদে। একদিন রাতের রান্না করতে রান্নাঘরে ঢুকে সে দেখল, চাল বাড়ন্ত। অসীমা আবার কেঁদে ফেলল। প্রথমে সে উপরে গিয়ে জুডিদের বাড়িতে চাল চাইতে গেল। জুডি বলল, "নিয়ে নাও।" কিন্তু সেটা আবার ব্রাউন রাইস। অসীমার চলবে না। ভদ্রতার খাতিরে টিন থেকে এক কাপ চাল নিল বটে, কিন্তু বাড়িতে ফিরে সেটা ছুড়ে ফেলে দিল। অশোককে কলেজে ফোন করে বলতে চাইল যেন ফেরার পথে চাল কিনে আনে, কিন্তু তাকে ধরতে পারল না। শেষ অবধি নিজেই উঠল অসীমা, মুখ পরিষ্কার করল, চুল আঁচড়াল। গোগোলকে পরিষ্কার করে, জামা পরিয়ে অ্যালান ও জুডির কাছ থেকে পাওয়া নীল-সাদা প্র্যামে শোয়াল। সেই প্রথমবার সে একা গোগোলকে নিয়ে বেরোল। প্র্যাম ঠেলতে ঠেলতে কেমব্রিজের অদ্ভুত রাস্তাগুলো দিয়ে এগোল অসীমা। এক প্যাকেট লম্বা, সাদা দানার চাল কিনতে সে পিউরিটি সুপ্রিমে যাচ্ছে। সাধারণত যা সময় লাগে, এবারে তার চেয়ে বেশিই লাগল। কারণ রাস্তাঘাটে, সুপার মার্কেটের গলিতে, অচেনা আমেরিকানরা তাকে বিশেষভাবে লক্ষ করছে। তারা হেসে হেসে মা ও ছেলেকে থামিয়ে গোগোলকে দেখছে, মা হওয়ার জন্য অসীমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। প্র্যামের ভিতরে তাকিয়ে উৎসুকভাবে বলছে, "কত বয়স?" " ছেলে না মেয়ে?" "কী নাম?"

একা-একা বেরোতে পেরে অসীমার নিজেকে নিয়ে গর্ব হতে থাকল। সে নিজে নিজে একটা কাজের নিয়ম ঠিক করতে পেরেছে। অশোক যেমন সপ্তাহের সাত দিনই পড়ানো আর রিসার্চ আর ডিসারটেশন নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তেমন তারও এখন একটা কাজ হয়েছে। সেই কাজে সে সবটা সময় ও উৎসাহ গুছিয়ে ব্যয় করতে পারে। গোগোলের জন্মের আগে অসীমার দিনগুলো যেমন-তেমন করে কাটত। সে অ্যাপার্টমেন্টে একা-একা সময় কাটাত। ঘুমিয়ে, মন খারাপ করে, বিছানায় শুয়ে একই পাঁচটা বাংলা উপন্যাস বারবার করে পড়ে। কিন্তু আগে যে দিনগুলো কাটতে চাইত না, এখন সেগুলোই হুড়মুড় করে বিকেলের দিকে এগিয়ে যায়। যেসব সময়ে কিছুই করার থাকত না, সে সময়ই এখন গোগোলকে নিয়ে তিনটে ঘরের ভিতরে কখন যে কেটে যায়! সকাল ছ'টায় ঘুম থেকে ওঠে অসীমা, গোগোলকে প্রথমবার খাওয়ায়। তার পর আধঘণ্টা গোগোল বাবা-মার মধ্যেখানে শুয়ে থাকে, আর ওরা গোগোলের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। বেলা এগারোটা

থেকে একটা পর্যন্ত গোগোল ঘুমোয়, অসীমাও সে সময়টা রান্নাঘর সামলে নেয়। আসলে এই সময়ে রান্না করার অভ্যাসটা তার থেকে যাবে, আগামী বহু বছর ধরে। প্রত্যেক বিকেলে ছেলেকে নিয়ে বেরোয় অসীমা, রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, এটা-সেটা কেনে। কখনও কখনও সে হার্ভার্ড চত্বরে বসে থাকে, বা এম আই টি ক্যাম্পাসের কোনও বেঞ্চে অশোকের সঙ্গে দেখা করে। সে-সব ক্ষেত্রে বাড়িতে তৈরি সিঙাড়া আর ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে যায় সে। বাচ্চার মুখে সে সময়-সময় তার পরিবারের লোকজনের মুখের আদল দেখতে পায়। তার মায়ের উজ্জ্বল চোখ, বাবার পাতলা ঠোঁট, ভাইয়ের তেরছা হাসি। সে একটা উলের দোকান আবিষ্কার করে আগামী শীতের কথা ভেবে সোয়েটার বুনতে শুরু করে। গোগোলের সোয়েটার, কম্বল, দস্তানা, টুপি...। কয়েকদিন পরপর রান্নাঘরের চিনেমাটির সিংকে সে গোগোলকে চান করিয়ে দেয়। প্রতি সপ্তাহে খুব সাবধানে বাচ্চার নখ কেটে দেয়। প্র্যামে করে ডাক্তারের কাছে বাচ্চাকে টিকা দিতে নিয়ে গেলে কান চেপে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। একদিন অশোক ইনস্ট্যাম্যাটিক ক্যামেরা নিয়ে বাড়ি ফেরে। বাচ্চার ছবি তোলা হয়। গোগোল ঘুমোলে অসীমা চৌকো, সাদা বর্ডারওয়ালা ফোটোগুলোকে অ্যালবামে প্লাস্টিক শিটের পিছনে লাগায়। নীচে ক্যাপশনও লিখে রাখে। ঘুম পাড়াবার সময় বাংলা গান গায় সে। বাচ্চার গা থেকে মিষ্টি দুধের গন্ধ আসে, নিশ্বাসেও মাখনের মতো সুবাস। প্রাণভরে সেই সুবাস টেনে নেয় অসীমা। একদিন সে গোগোলকে উঁচুতে তুলে ধরে আর না হজম হওয়া দুধের ধারা গোগোলের মুখ থেকে অসীমার খোলা মুখে এসে পড়ে। সারা জীবন সেই ঘটনাটা মনে থাকবে অসীমার, মুখে সেই গরম, টক স্বাদটা লেগে থাকায় সে সারা দিন কিছুই খেতে পারেনি।

তার বাবা-মার চিঠি আসে, শ্বশুর-শাশুড়ির চিঠি আসে। ভাই-বোন-আত্মীয়স্বজন সকলেরই চিঠি এসে পৌঁছোয়। শুধু অসীমার দিদার চিঠিটাই আসে না। সে-সব চিঠিতে সম্ভাব্য প্রত্যেক প্রকারের আশীর্বাদ ও ভালবাসা ভরা থাকে। এমন এক বর্ণমালায় সে-সব ভাবনা প্রকাশিত যা এতদিন তারা নিজেদের চারপাশে চব্বিশ ঘণ্টা দেখে এসেছে। হোর্ডিংয়ে, খবরের কাগজে, বাসস্ট্যান্ডে। এখন সেই পরিচিত বর্ণমালা শুধু কয়েকটা হালকা নীল এয়ারমেলের বার্তায়। কোনও কোনও সপ্তাহে দুটো চিঠি আসে। একবার তো তিনটেও এল। বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে অসীমা কান খাড়া করে থাকে। গাড়িবারান্দায় পোস্টম্যানের পায়ের শব্দ শোনা যায়, তারপর খুব আস্তে

একটা 'ক্লিক', বোঝা যায় চিঠি দেওয়ার সরু গর্ত দিয়ে কিছু ভিতরে ঢোকানো হল। অসীমার মা গত লেখেন, বড় বড় করে। বাবার হাতের লেখা সুন্দর, অভিজাত। তাঁদের চিঠির পাশের খালি জায়গাতে প্রায়ই পশুপাখি আঁকা থাকে, ওর বাবা আঁকেন। সেগুলো অসীমা গোগোলের ছোট্ট কটের চারপাশের রেলিংয়ে টেপ দিয়ে আটকে রাখে। "ওকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে," অসীমার মা লিখেছেন, "আসলে এই মাসগুলো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি ঘণ্টায় পরিবর্তন হতে থাকে। মনে রাখিস।" অসীমা ছেলের সব বর্ণনা দিয়ে দীর্ঘ উত্তর দেয়। কবে ও প্রথম হাসল, কীভাবে প্রথম উপুড় হল, প্রথম আনন্দের চিৎকার করল কখন...। লেখে, সামনের ডিসেম্বরে গোগোলের এক বছর বয়স হলে তারা দেশে যাবে। টাকা জমাচ্ছে। (যেটা লেখে না সেটা হল, গোগোলের ডাক্তার বলেছেন, ভারতে যেতে গেলে আবার অনেকগুলো টিকা নিতে হবে। ডাক্তারবাবু ট্রপিক্যাল অসুখ সম্পর্কে খুবই সাবধানি।)

নভেম্বরে গোগোলের কানে মাইল্ড ইনফেকশন হল। অশোক ও অসীমা দেখল, ছেলের নাম অ্যান্টিবায়োটিকের একটা প্রেসক্রিপশনে লেখা। টিকাকরণ সংক্রান্ত কাগজপত্রেও সেই নাম, সবার চোখে পড়ছে। মনে হল, এটা ঠিক নয়। ডাকনাম তো বাইরে চাউর করার জন্য নয়। কিন্তু তখনও অসীমার দিদার চিঠির কোনও পাত্তা নেই। সেটা তা হলে ডাকে হারিয়ে গেছে, এটা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। অসীমা ঠিক করে, দিদাকে একটা চিঠি লিখে বলবে, আবার নাম পাঠাতে। পরদিনই একটা চিঠি এসে পৌঁছোয় কেমব্রিজে। অসীমার বাবার লেখা হলেও এই চিঠিটাতে কিন্তু কোনও হাতি বা টিয়া বা বাঘের ছবি নেই। তিন সপ্তাহ আগে লেখা এই চিঠি পড়েই ওরা জানতে পারে দিদার স্ট্রোক হয়েছে, ডানদিক প্যারালাইজ়ড, মস্তিষ্ক কাজ করছে না। তিনি আর চিবোতে পারেন না, গিলে খেতেও সাংঘাতিক কষ্ট, জীবনের আশিটা বছরের খুব কম অংশই তাঁর মনে আছে। "উনি এখনও বেঁচে আছেন বটে, তবে আমাদের সঙ্গে আর নেই," বাবা লিখেছেন, "তৈরি থাকো। হয়তো তাঁর সঙ্গে তোমার আর দেখা হবে না।"

বাড়ি থেকে আসা এটাই প্রথম খারাপ খবর। অশোকের সঙ্গে অসীমার দিদার আলাপ হয়নি। তবে বিয়ের সময় একবার প্রণাম করার কথা আবছাভাবে মনে আছে তার। কিন্তু খবর পাওয়ার পর অসীমাকে আর সামলানো যায় না। সে গোগোলকে নিয়ে বাড়িতে বসে থাকে। বাইরে হলুদ পাতা ঝরে যায় গাছের ডাল থেকে, দিন ছোট হতে থাকে, রাতগুলো আরও

নির্দয়। দিদার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার কথা মনে পড়ে। বস্টনে আসার দিনকয়েক আগে অসীমা দিদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সেই উপলক্ষে দশ বছর পরে দিদা রান্নাঘরে ঢুকেছিলেন, অসীমাকে হালকা পাঁঠার ঝোল রেঁধে খাইয়েছিলেন। নিজের হাতে তার মুখে মিষ্টি তুলে দিয়েছিলেন। বাবা-মা আর অন্য সব আত্মীয়েরা তখন অসীমাকে গোরুর মাংস খেতে, স্কার্ট পরতে, চুল কাটতে বারণ করছিলেন, দেশের লোকজনকে ভুলে না যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। দিদা এ-সব কিছুই করেননি। তিনি যেন বুঝেছিলেন, অসীমা পালটাবে না। ঠিকই বুঝেছিলেন। ফেরার আগে অসীমা দাদুর ছবির সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল, যাত্রার আগে আশীর্বাদ চেয়েছিল। তারপর সে দিদার পায়ের ধুলো নিয়েছিল।

বলেছিল, "দিদা, আসি।"

দিদা গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলেছিলেন, "সুখে থাকো।" সেই স্বর অসীমাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল। দিদা বুড়ো আঙুল দিয়ে অসীমার গালে নামতে থাকা চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছিলেন, "যা আমি কোনওদিন করতে পারব না, তা করতে ভয় পাসনি। সব ভালর জন্যই হয়। মনে রাখিস। এবার আয়।"

বাচ্চা বড় হয়। সঙ্গে সঙ্গে ওদের বাঙালি বন্ধুদের বৃত্তও বাড়তে থাকে। নন্দীদের নিজেদেরই এবার বাচ্চা হবে। তাদের মাধ্যমেই মিত্রদের সঙ্গে আলাপ হয় ওদের, মিত্রদের মাধ্যমে ব্যানার্জিদের সঙ্গে। গোগোলকে নিয়ে বেরোলে বহুবার অসীমার সঙ্গে কোনও বাঙালি যুবকের দেখা হয়েছে, তারা লাজুকভাবে এসে দেশ ও পরিচয় জানতে চায়। অশোকের মতোই এই অবিবাহিত যুবকরা দেশে যায়, বউ নিয়ে ফেরে। প্রত্যেক উইকএন্ডেই নতুন নতুন বাড়িতে নেমন্তন্ন থাকে, নতুন পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়। এদের সকলেরই বাড়ি কলকাতায়, সুতরাং তারা একে অপরের বন্ধু। বেশিরভাগই কেমব্রিজের আশেপাশে থাকে, পরস্পরের থেকে মিনিট দশেকের হাঁটা দূরত্বে। স্বামীরা ডাক্তার, গবেষক, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার। স্ত্রীরা বিষণ্ণ, বিচলিত। তারা অসীমার কাছে পরামর্শ বা রান্নার রেসিপি নিতে আসে। অসীমা তাদের বলে দেয়, চায়নাটাউনে কোথায় পোনামাছ পাওয়া যায় বা কীভাবে ক্রিম অফ হুইট থেকে হালুয়া রাঁধা সম্ভব। তারা রবিবার সন্ধ্যায় একে অপরের বাড়িতে

যায়। চিনি ও ফোটানো দুধের চা খায়, খোলা সসপ্যানে ভাজা কুচোচিংড়ির কাটলেট খায়। মাটিতে গোল হয়ে বসে মোটা, হলুদ কাপড়ে বাঁধানো বই দেখে দেখে রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের গান গায়। বইটা হাতে হাতে ঘুরতে থাকে, দিলীপ নন্দী হারমোনিয়াম বাজান। সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা বনাম ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা নিয়ে তারা তর্ক করে। সি পি এম বনাম কংগ্রেস, উত্তর কলকাতা বনাম দক্ষিণ কলকাতা নিয়ে উত্তাল হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমেরিকার রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে তারা, যদিও কারওর এ-দেশে ভোটাধিকার নেই।

ফেব্রুয়ারিতে গোগোলের ছ'মাস পূর্ণ হল। ততদিনে ঘটা করে নেমন্তন্ন খাওয়ানোর মতো যথেষ্ট লোকের সঙ্গে অসীমা আর অশোকের আলাপ হয়েছে। সে-মাসেই গোগোলের অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান হল। বাঙালি বাচ্চাদের ব্যাপটিজ়ম হয় না, নামকরণের ঘটাও নেই। তাদের জীবনে প্রথম বড় অনুষ্ঠান হয় অন্নপ্রাশন ঘিরে। তারা দিলীপ নন্দীকে বাচ্চার মামার কাজটি করতে বলল, মানে গোগোলকে প্রথমবার ভাত খাওয়াতে হবে। কলকাতা থেকে গোগোলের দিদা গরদরঙা পাজামা-পাঞ্জাবি পাঠালেন। ছোট্ট গোগোলকে বরের মতো সাজানো হল। পাজামা সেটটায় জিরের গন্ধ তখনও লেগে আছে, কারণ সেটার সঙ্গে এক প্যাকেট জিরেও পাঠিয়েছিলেন গোগোলের দিদিমা। কাগজ আর অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে একটা মুকুট তৈরি করেছে অসীমা, সেটাকে সুতো দিয়ে গোগোলের মাথায় পরিয়ে দেওয়া হল। গলায় সরু চোদ্দো ক্যারেট সোনার হার। গোগোলের ছোট্ট কপালে চন্দন পরাতে অবশ্য বেশ পরিশ্রম করতে হল, তবে শেষ পর্যন্ত ভুরুর উপরে ছোট ছোট ঘিয়ে রঙের চাঁদের মতো চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেওয়া গেল। কাজল আগেই পরানো হয়েছিল। সে মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া বেডকভারে পাতানো মামার কোলে বসে ছটফট করছিল। চারদিকে অতিথিদের ভিড়। দশটা বাটিতে দশ রকম পদ বেড়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য অসীমার একটা দুঃখ থেকে গেছে যে, ভাতের থালাটা মেলামাইনের। রুপো বা কাঁসা নয়, এমনকী স্টিলেরও নয়। শেষ বাটিটায় পায়েস। এর পর থেকে গোগোলের প্রত্যেক জন্মদিনে, এমনকী সাবালক হওয়ার পরও, অসীমা এই-পায়েসই রান্না করবে। একটুকরো বেকারি থেকে কেনা কেকের পাশে ছেলেকে পায়েসের বাটি সাজিয়ে দেবে।

অন্নপ্রাশনের দিন তোলা ফোটোগুলোয় গোগোলের ভুরু কুঁচকে আছে।

বাবার বন্ধুরা ছবি তুলছেন। গোগোল ভিড়ের মধ্যে মার মুখটি খুঁজছে। কিন্তু অসীমা তখন বুফে সাজানোয় ব্যস্ত। তার পরনে বিয়েতে পাওয়া একটা রুপোলি শাড়ি। প্রথমবার ভাঁজ ভাঙা হয়েছে। ব্লাউজের হাতাগুলো কনুই পর্যন্ত। অশোক বেলবটম প্যান্টের উপর একটা পাতলা পাঞ্জাবি পরে আছে। অসীমা কাগজের প্লেট বের করছে। খাবারের ওজন সামলানোর জন্য একটার জায়গায় তিনটে করে প্লেট দরকার হচ্ছে। পদও কম নয়। বিরিয়ানি, দই-মাছ, ডাল, ছ'রকম নিরামিষ তরকারি। গত সাত দিন ধরে অসীমা সে-সব রেঁধেছে। অতিথিরা দাঁড়িয়ে খাবে, অথবা মেঝেতে বাবু হয়ে বসে। অ্যালান আর জুডিকেও নেমন্তন্ন করা হয়েছে। তারা উপরতলা থেকে নেমে এসেছে, কিন্তু রোজকার পোশাক পরে। সেই শীতের জন্য মোটা সোয়েটার, জিন্‌স, উলের মোজার উপর মোটা চামড়ার স্ট্র্যাপ দেওয়া চপ্পল। জুডি খাবারদাবার দেখে একটা বড়া তুলে মুখে দিল। সেটা চিংড়ির বড়া। জুডি জনান্তিকে অ্যালানকে বলল, "আমি ভাবতাম ভারতীয়রা নিরামিষাশী।"

গোগোলের অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান শুরু হল। পুরোটাই অবশ্য নাম কা ওয়াস্তে। বাচ্চা ছেলেটা বিশেষ কিছু খাবে না, তা সকলেই জানে। হয়তো এক দানা ভাত, কি এক ফোঁটা ডাল...। এর মাধ্যমে শুধু জীবনভর খাওয়ার সঙ্গে ওকে পরিচিত করিয়ে রাখা। পরবর্তীকালের হাজারবার খাওয়ার শুরুটা করিয়ে দেওয়া। মহিলারা কেউ-কেউ উলু দিলেন। উপস্থিত অনেকেই শাঁখ বাজানোর চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ পারল না। প্রদীপ জ্বালিয়ে দূর্বা দিয়ে গোগোলকে আশীর্বাদ করা হল। শিশু মুগ্ধ হয়ে চুপ করে আছে, প্রতিটা পদ মুখে নেওয়ার জন্য বাধ্য ছেলের মতো মুখ খুলছে। শুধু পায়েসটাই সে তিনবার খেল। উৎসাহের সঙ্গে হাঁ করে ছেলের পায়েস খাওয়ার দৃশ্য দেখে অসীমার চোখে জল চলে আসে। সে ভাবে, তার নিজের ভাই এখানে থাকলে কেমন হত, ভাবে তার বাবা-মা কেন এখানে নেই নাতিকে আশীর্বাদ দিতে! তারপর শেষের মজা, এটার জন্যই সকলের অপেক্ষা। ভবিষ্যৎ জীবন কেমন হতে পারে তা বোঝার জন্য গোগোলের সামনে একটা প্লেট ধরা হবে। তাতে আছে ব্যাকইয়ার্ড থেকে তুলে আনা কেমব্রিজের ঠান্ডা মাটির একটা ড্যালা, একটা বলপয়েন্ট পেন, এক ডলারের নোট। যেটা গোগোল ছোঁবে, সেদিকেই এগোবে তার ভবিষ্যৎ। মাটি ছুঁলে সম্পত্তির অধিকারী, পেন ধরলে বিদ্বান, ডলার ধরলে ব্যবসায়ী। বেশির ভাগ বাচ্চাই যে-কোনও একটা ধরে, অনেকে সবক'টাই ধরার চেষ্টা করে, কিন্তু গোগোল

কোনওটার দিকেই হাত বাড়ায় না। সে প্লেটের কোনও জিনিসের প্রতিই আগ্রহ দেখায় না, বরং মুখ ঘুরিয়ে তার তৎকালীন মামার কাঁধে গুঁজে দেয়। "ওর হাতে ডলারটা ধরিয়ে দাও," ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ চিৎকার করে বলে, "আমেরিকান ছেলে তো, বড়লোক না হলে চলবে?" "না," ওর বাবা বলে ওঠে, "গোগোল, পেনটা নে।" গোগোল মুখ তুলে সন্দেহভরে প্লেটটা দেখে। চারপাশের কালো চুলের মাথাগুলো উৎসুক হয়ে ওঠে। এদিকে, পাজামা-পাঞ্জাবির কাপড়টায় গোগোলের অসুবিধে হতে শুরু করেছে।

"চলো, গোগোল, একটা কিছু নাও," দিলীপ নন্দী উৎসাহ দেন। প্লেটটা কাছে টেনে নেন তিনি। গোগোলের ভুরু কুঁচকে যায়। নীচের ঠোঁটটা কেঁপে ওঠে। সেই মুহূর্তে, ছ'মাস বয়সে অদৃষ্টকে বেছে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে বলেই হয়তো, গোগোল কেঁদে ওঠে।

আরেক আগস্ট। গোগোলের বয়স এক বছর। সে মুঠো করে জিনিসপত্র ধরে। অল্প অল্প হাঁটে। দুটো ভাষায় কয়েকটা শব্দ বলতে পারে। 'মা' আর 'বাবা' বলে ডাকতে পারে। কেউ 'গোগোল' বলে ডাকলে সেদিকে তাকিয়ে হাসে। সে সারা রাত টানা ঘুমোয়। আর দিনের বেলাতেও বেলা বারোটা থেকে তিনটের মধ্যে ঘুমোয়। সাতটা দাঁত বেরিয়েছে তার। যা খুঁজে পায় তাই মুখে দেওয়ার চেষ্টা করে সে। অশোক ও অসীমা ডিসেম্বর মাসে কলকাতা যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে, সে সময়ে অশোকের ছুটি থাকবে। তাই গোগোলের জন্য একটা ভালনাম খুঁজে বের করার আগ্রহ তুঙ্গে, পাসপোর্টের আবেদন জমা দিতে হবে তো! বাঙালি বন্ধুদের পরামর্শ চায় তারা। লম্বা লম্বা বিকেল জুড়ে এই নিয়ে আলোচনা চলে। কিন্তু কিছুই পছন্দ হয় না। ততদিনে অসীমার দিদার চিঠিটা পাওয়ার আশা তারা ছেড়ে দিয়েছে। এও জানা আছে যে, কী নাম দিয়েছিলেন তা দিদার আর মনে পড়বে না, কারণ দেশ থেকে পাওয়া সংবাদ অনুযায়ী তিনি অসীমাকেও চিনতে পারেন না। তবু, সময় আছে এখনও। কলকাতা যেতে এখনও চার মাস দেরি। একটু আগে, মানে পুজোর সময় যেতে পারছে না বলে অসীমার আফসোস হয় বটে, কিন্তু শীতের ওই তিন হপ্তা ছাড়া এখন অশোকের ছুটি পাওয়ার উপায় নেই। "এ তো তোমাদের ক্রিসমাসের কিছুদিন পরে বাড়ি যাওয়ার মতো," কাপড় মেলতে মেলতে জুডিকে বুঝিয়ে বলে অসীমা। উত্তরে জুডি জানিয়ে দেয় অ্যালান আর সে দু'জনেই বৌদ্ধ।

অসীমা প্রবল গতিতে সোয়েটার বুনতে থাকে। বাবার জন্য, শ্বশুরের জন্য, ভাইয়ের জন্য, তিন প্রিয় কাকার জন্য। সবক'টাই একরকম। ভি-গলা, পাইন-সবুজ রঙের উলে বোনা, তিনটে সোজা দুটো উলটো, উনতিরিশ নম্বর কাঁটা। শুধু তার বাবারটাই অন্যরকম। একটু ডিজ়াইন করা, সামনে বোতাম দেওয়া। বাবা পুলওভারের চেয়ে কার্ডিগানটাই বেশি পছন্দ করেন কিনা! অসীমা তাতে পকেটও রেখেছে, কারণ বাবা সবসময় সঙ্গে এক প্যাকেট তাস রাখেন। হঠাৎ হঠাৎ পেশেন্স খেলার অভ্যাস আছে তাঁর। এ ছাড়া, হার্ভার্ড কূপ থেকে সে ভাল তিনটে তুলি কিনে নিয়েছে। বাবা চিঠিতে যে সাইজ় চেয়েছিলেন, সেটাই। তুলিগুলোর দাম প্রচণ্ড। এত দাম দিয়ে আমেরিকায় কিছু কেনা হয়নি এর আগে। কিন্তু বিল দেখে অশোক কিছুই বলেনি। একদিন অসীমা বস্টন শহরে কেনাকাটা করতে গেল। গোগোলকে স্ট্রোলারে বসিয়ে ঠেলতে ঠেলতে জর্ডান মার্শের বেসমেন্টে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাল, শেষ পেনিটাও খরচ করে ফেলল। কিনল বিভিন্ন রকমের চা-চামচ, পারকেল পিলোকেস, রঙিন মোমবাতি, দড়ি লাগানো সাবান। শ্বশুরের জন্য টাইমেক্স ঘড়ি, তুতো ভাই-বোনদের জন্য কলম, মা-মাসিদের জন্য এমব্রয়ডারি করার সুতো আর আঙুলঢাকা। দিনের শেষে বাড়ি ফেরার ট্রেনে বসে অসীমার মনে দেশে ফেরা নিয়ে আনন্দ, উত্তেজনা আর ভয় একসঙ্গে খেলা করতে থাকে। ট্রেনে বড্ড ভিড়। অসীমা বসার জায়গা পেল না। অতগুলো প্যাকেট, স্ট্রলার আর হাতল একসঙ্গে সামলাতে সামলাতে যখন হিমসিম, একটি অল্পবয়সি মেয়ে তাকে বসতে দিতে চাইল। অসীমা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে সিটে বসে হাঁফ ছাড়ল। শপিংয়ের ব্যাগগুলো নিজের পায়ের পিছনে সিটের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল। গোগোল ঘুমোচ্ছে, অসীমারও চোখ ভার হয়ে এল। পেছনের জানালায় হেলান দিয়ে চোখ বুজল অসীমা, বাড়ির কথা ভাবতে লাগল। কলকাতায় তার বাপের বাড়ির জানালার কালো মোটা গরাদগুলো মনে পড়ে... গোগোল আমেরিকান বাচ্চাদের মতো পোশাক পরে ফ্যানের তলায় দাদু-দিদিমার পুরনো ব্যাটামঅলা খাটের উপর খেলছে। মা লিখেছেন, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে বাবার একটা দাঁত সম্প্রতি ভেঙে গিয়েছে। কেমন লাগছে বাবাকে দেখতে? দিদিমা যদি চিনতে না পারেন, কেমন লাগবে?

হঠাৎ চোখ খুলে অসীমা দেখল, ট্রেনটা একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে। এই স্টেশনেই অসীমার নামার কথা! সে লাফ দিয়ে উঠল। হৃৎপিণ্ড গলার কাছে আটকে আছে। "মাপ করবেন," গোগোলের ট্রলারটা ঠেলতে ঠেলতে

আঁটোসাঁটো ভিড়ের মধ্যে এগোতে এগোতে বলল সে। "ম্যাম," কেউ একজন বলল, "আপনার জিনিসগুলো..."। ভুলটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়েছে অসীমা, কিন্তু পাতালরেলের অটোমেটিক দরজা দুটো ততক্ষণে খটাস শব্দে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ট্রেনটা ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে গেল। অসীমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল শেষ কামরাটা সুড়ঙ্গের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। গোগোল আর সে ছাড়া অন্য সকলে ততক্ষণে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে গেছে। স্ট্রোলারটা ঠেলতে ঠেলতে ম্যাসাচুসেট্স অ্যাভিনিউ ধরে ফিরে চলল অসীমা, খোলাখুলিই কাঁদছে সে। আবার সবকিছু কেনা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বাকি বিকেলটা নিজেকে দুষতে দুষতে কাটাল অসীমা। কয়েকটা সোয়েটার আর তুলি নিয়ে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছোনোর চেয়ে অপমানজনক কী হতে পারে? সে তো প্রায় খালি হাতে যাওয়াই হয়। তারপর অশোক বাড়ি ফিরে এম বি টি এ লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড ডিপার্টমেন্টে ফোন করল। পরদিন প্রত্যেকটা ব্যাগ ফেরত চলে এল, একটা চা-চামচও চুরি হয়নি। এটা অসীমার কাছে ইন্দ্রজাল বলে মনে হয়। তবু, এই ঘটনাটায় অসীমার সঙ্গে কেমব্রিজের এমন একটা যোগসূত্র তৈরি হল, যাতে যা অন্যভাবে সম্ভব হত বলে মনে হয় না। কেমব্রিজের প্রত্যাশা ও সেখানকার নিয়মকানুনের সঙ্গে সেই অসীমার সম্পূর্ণ সম্পর্কস্থাপন। রাতের জমায়েতে বলার মতো একটা ঘটনা তার ঝুলিতে জমা হল। বন্ধুরা অবাক হয়ে শোনে, অসীমার সৌভাগ্য নিয়ে মন্তব্য করে। মায়া নন্দী বলে, "এ-দেশেই সম্ভব...।"

বেশ কিছুদিন পর এক রাতে টেলিফোন বেজে উঠল। ওরা তখন গভীর ঘুমে। দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার মতো লাফ দিয়ে উঠল তারা। অশোক ফোন ধরার আগেই অসীমা বুঝে যায়, ফোনটা ভারত থেকে। কয়েক মাস আগে তার পরিবারের লোকেরা কেমব্রিজের ফোন নম্বর চাওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও অসীমা দিয়েছিল। দেওয়ার সময়ে সে জানত, দুঃসংবাদ পৌঁছোনোর পথ খুলে যাচ্ছে। অশোক উঠে বসে আর্ত, ক্ষীণ স্বরে ফোন ধরার আগেই অসীমা নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করেছে। ছোট খাটের রেলিংটা নামিয়ে সে গোগোলকে শান্ত করতে আরম্ভ করে। ফোনের শব্দে সে নড়াচড়া আরম্ভ করেছে। অসীমা ভাবে, দিদিমার বয়স আশির উপর, রোগশয্যায়, স্মৃতিহীন, খেতে বা কথা বলতে পারেন না। শেষ কয়েকটা চিঠিতে সে জেনেছে, দিদিমা বা যারা দিদিমাকে ভালবাসে তাদের পক্ষে মাসগুলো অসহ্য লাগছে, যন্ত্রণার মনে হচ্ছে। এভাবে বাঁচার কোনও মানে হয় না। তার কল্পনায় ভেসে

ওঠে একটা ছবি। পাশের বাড়ির বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে ফোনে শান্ত গলায় সব কথা বুঝিয়ে বলছেন তার মা। অসীমা খবরটা শোনার জন্য প্রস্তুত হয়। গোগোলের সঙ্গে তার প্রমাতামহীর কোনওদিন দেখা হবে না। গোগোলের হারিয়ে যাওয়া নামটা যিনি দিয়েছিলেন, তাঁকে কোনওদিন দেখবে না গোগোল।

ঘরটা বড্ড ঠান্ডা। অসীমা গোগোলকে কোলে তুলে কম্বলের তলায় ঢুকে যায়। বাচ্চাটা বুকে জড়িয়ে শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টা করে, তাকে স্তন দেয়। সে ঘিয়ে রঙের কার্ডিগানটার কথা ভাবে, দিদিমার জন্য কেনা। এখন আলমারিতে একটা শপিং ব্যাগের মধ্যে ভরা আছে। শোনে, অশোক জোরে অথচ শান্তভাবে কথা বলছে। অ্যালাম আর জুডির ঘুম ভেঙে যাবে না তো? "হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, তা-ই হবে," তারপর অশোক চুপ করে শোনে। শেষে অসীমার দিকে রিসিভারটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "ওরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।" অন্ধকারে স্ত্রীর কাঁধে অল্প চাপ দেয় সে। তারপর ফোনটা হাতে দিয়ে বিছানা থেকে নেমে আসে।

অসীমা নিজে খবরটা শুনবে বলে ফোনটা নেয়, মাকে সান্ত্বনাও তো দিতে হবে। ভাবে, তার নিজের মায়ের মৃত্যুসংবাদ এলে কে তাকে সান্ত্বনা দেবে? কীভাবে আসবে সে খবর? এইভাবে, এখানে? মাঝরাতে, স্বপ্নের মধ্যে থেকে ছিঁড়ে আনা সময়ে? ভীতির মধ্যেও কিন্তু একটা কথা ভেবে তার আনন্দ হয়। প্রায় তিন বছর পরে মায়ের গলা শুনতে পাবে সে। দমদম এয়ারপোর্ট ছেড়ে আসার পর আবার 'মনু' ডাক শুনতে পাবে। কিন্তু মা নয়, ওদিক থেকে ছোটভাই রানার গলা পাওয়া যায়। ওর গলাটা ফিকে শোনায়, যেন টেলিফোনের তারের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে সরু হয়ে গিয়েছে। চেনাই যাচ্ছে না। অসীমা প্রথমেই জানতে চায়, ভারতে ক'টা বাজে? ঠিকঠাক শোনানোর জন্য তিনবার ওই একই প্রশ্ন করতে হয় অসীমাকে। রানা বলে, ওখানে তখন দুপুরের খাবার সময়। জিজ্ঞেস করে, "তোরা ডিসেম্বরে আসছিস তো?"

এতদিন পরে ভাইয়ের মুখে 'দিদি' ডাক শুনে অসীমার বুকে ভার জমে। অন্যদিকে শোনা যায় অসীম রান্নাঘরে জল ভরছে, আলমারি থেকে গ্লাস বের করছে। "হ্যাঁ, যাচ্ছি তো," ফোনে নিজের গলার প্রতিধ্বনি শুনে সে নিজেই কেঁপে ওঠে, "দিদা কেমন আছে? আর কিছু হয়নি তো?"

"বেঁচে আছে," রানা উত্তর দেয়, "তবে ওই একই রকম।"

অসীমা হাঁফ ছেড়ে নিশ্চিন্ত পিঠ বালিশে ঠেকায়। তার মানে সে দিদাকে শেষবারের মতো দেখতে পাবে। সে গোগোলের মাথায় চুমু খায়, গালে গাল ঠেকায়। "নিশ্চিন্ত হলাম। মাকে দে এবার," অসীমা পা ছড়িয়ে বসে।

"মা বাড়ি নেই," কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রানা বলে।

"বাবা?'

আবার নিস্তব্ধতা। তারপর শোনা যায়, "বাবাও নেই।"

"ও।" অসীমা সময়ের তফাতটা ভুলে যাচ্ছিল। বাবা নিশ্চয়ই 'দেশ' পত্রিকার অফিসে কাজে গেছে, মা চটের থলে নিয়ে বাজারে। সবজি আর মাছ কিনছে।

"ছোট্ট গোগোল কেমন আছে?", রানা জিজ্ঞেস করে, "ও কি খালি ইংরেজিতেই কথা বলে?"

অসীমা হেসে ফেলে, "এখন কোনও ভাষাতেই বিশেষ কিছু বলে না। এখন ওকে 'দিদা', 'দাদু' আর 'মামু' বলতে শেখাচ্ছি।" ফোটো দেখে তাঁদের চিনতেও শেখাচ্ছে অসীমা। কিন্তু এবারকার লম্বা নিস্তব্ধতা অসীমাকে কথার মাঝখানেই থামতে বাধ্য করে।

"রানা? শুনতে পাচ্ছিস?"

"না, দিদি, পাচ্ছি না," রানার গলা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসে, "আমরা পরে কথা বলব, কেমন?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলব। খুব তাড়াতাড়ি বলব। দেখা হবে শিগগিরি। চিঠি লিখিস।" ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে অসীমার আনন্দ আর ধরে না। তবে এক মুহূর্ত পরে তার বিরক্ত লাগতেও শুরু করে। বোকা বোকা প্রশ্ন করার জন্য ফোন করার কোনও মানে হয়? তাও এমন সময়ে যখন বাবা বা মা কেউ বাড়িতে নেই?

অশোক এক গেলাস জল নিয়ে রান্নাঘর থেকে ফিরল। বেডসাইড টেবিলে গেলাসটা রেখে সে আলোটা জ্বালল।

"আমি জেগে আছি," ক্লান্ত গলায় অশোক বলল।

'আমিও।"

"গোগোল কী করছে?"

"ঘুমিয়ে পড়েছে।" অসীমা উঠে বাচ্চাকে ছোট কটে শোয়ায়, কম্বলটা কাঁধ অবধি টেনে দেয়। তারপর কাঁপতে-কাঁপতে বিছানায় ফিরে আসে। "আমি বুঝতে পারছি না কেন রানা এই সময়ে ফোন করতে গেল," কোঁচকানো

চাদরের দিকে তাকিয়ে সে মাথা নেড়ে বলে, “এতটা খরচ করাই বা কেন? কোনও মানে হয় না।” অশোকের দিকে তাকিয়ে সে বলে, “ও তোমাকে ঠিক কী বলল, বলো তো?”

অশোক মাথা নিচু করে, মাথা নাড়ে।

“নিশ্চয়ই কিছু বলেছে। তুমি আমাকে বলছ না কেন? ”

অশোক মাথা নাড়তে থাকে। তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে এত জোরে অসীমার হাত চেপে ধরে যে অসীমার ব্যথা লাগে। তারপর অসীমাকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় শোয়ায়। তার উপর নিজে শুয়ে অসীমাকে বিছানায় সঙ্গে চেপে ধরে। তার শরীরটা কাঁপছে। অসীমা বুঝতে পারে না... আলোটা নিভিয়ে দিয়ে অশোক কি আদর করবে এখন? কিন্তু না, রানা কিছুক্ষণ আগে কী বলেছে, সেটাই বলে দেয় অশোক। যা রানা নিজে টেলিফোনে দিদিকে বলতে পারেনি। বলে, অসীমার বাবা গত সন্ধ্যায় হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছেন, নিজের বিছানায়, পেশেন্স খেলতে খেলতে।

ওরা ছ'দিন বাদে ভারতে যাওয়ার জন্য রওনা হল। আদতে যা প্ল্যান ছিল, তার ছ'হপ্তা আগে। পরদিন সকালে অ্যালান আর জুডির ঘুম ভাঙল অসীমার চাপা কান্নার শব্দে। অশোকের মুখে ঘটনা শুনে তারা দরজার পাশে একটা ফুলদানিতে ফুল রেখে গেল। ওই ছ'দিনে গোগোলের জন্য নাম খোঁজা গেল না। একটা এক্সপ্রেস পাসপোর্ট পাওয়া গেল। তাতে ইউনাইটেড স্টেট্স অব আমেরিকার স্ট্যাম্পের উপর দিয়ে লেখা “গোগোল গাঙ্গুলি”। অশোক ছেলের হয়ে সই করে দিল। রওনা হওয়ার আগের দিন অসীমা গোগোলকে স্ট্রোলারে বসাল, সঙ্গে বাবার জন্য কেনা তিনটে তুলি আর সদ্য বোনা সোয়েটারটা নিল। তারপর হার্ভার্ড স্কোয়ারের উপর দিয়ে পাতালরেলের স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল। “এক্সকিউজ মি,” সে এক ভদ্রলোককে বলল, “আমি ট্রেনে উঠতে চাই।” ভদ্রলোক স্ট্রোলারটা নীচে নিয়ে যেতে অসীমাকে সাহায্য করলেন। অসীমা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইল। ট্রেন এলে সে সেন্ট্রাল স্কোয়ারের দিকে চলল। এবার কোনও ঘুমের ভাব নয়, সম্পূর্ণ সতর্ক অবস্থায়। কামরাটায় জনাছয়েকের বেশি লোক নেই। কেউ গ্লোব পড়ছে, কেউ পেপারব্যাক পড়ছে, আর কেউ শূন্যদৃষ্টিতে সোজা তাকিয়ে আছে, যেন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। ট্রেনটা দাঁড়াতেই সে উঠে দাঁড়ায়, নামবে। সিটের

নীচে ইচ্ছে করে ফেলে যাওয়া শপিং ব্যাগটার দিকে আর ফিরে তাকায় না অসীমা। "এই ভারতীয় মহিলা ব্যাগ ফেলে গেল," বন্ধ হওয়া ট্রেনের দরজার ভিতর দিয়ে সে শুনতে পায়। ট্রেনটা স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সে জানালার কাচে ঠোকার শব্দও শোনে। কিন্তু কোনও উত্তর দেয় না অসীমা, গোগোলের স্ট্রোলার ঠেলতে ঠেলতে প্ল্যাটফর্ম বরাবর হাঁটতে থাকে।

পরদিন সন্ধ্যায় তারা একটা প্যান অ্যাম ফ্লাইটে লন্ডনের দিকে চলল। সেখানে পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর অন্য একটা ফ্লাইট তেহরান ও বম্বে হয়ে তাদের নিয়ে যাবে কলকাতার দিকে। বস্টনের রানওয়ের উপর প্লেনে বসে সিট বেল্ট বাঁধা অসীমা ঘড়ি দেখে আঙুলে সময় হিসেব করে। কিন্তু এবার কলকাতার পরিবারের কোনও ছবি তার মনে আসে না। কিছু সময় পরেই যা দেখতে পাবে, তা সে এখন থেকেই কল্পনা করতে চায় না। কী কল্পনা করবে? মায়ের খালি সিঁথি, ভাইয়ের ন্যাড়া মাথা? বিশাল চাকাগুলো নড়ে ওঠে, চলতে আরম্ভ করে। তালে তালে বৃহৎ ডানাদুটো দোল খায়। অসীমা অশোকের দিকে তাকায়। সে আবার দেখে নিচ্ছে পাসপোর্ট, গ্রিনকার্ড সব ঠিক আছে কি না। অসীমা হাতঘড়ির রুপোলি দুটো কাঁটা ঘুরিয়ে অশোকের সময় অ্যাডজাস্ট করা দেখে।

"আমি যাব না," গোলচে জানালার দিকে ফিরে তাকিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে সে, "আমি ওদের দেখতে পারব না। দেখতে চাই না।"

ছুটতে থাকা প্লেনে অশোক ওর হাতে হাত রাখে। তারপর বস্টন দূরে সরে যায়। ওরা অনায়াসে কালো হয়ে আসা আটলান্টিকের উপর দিয়ে উড়তে থাকে। চাকা দুটো প্লেনের পেটের ভিতরে ঢুকে যায়, উপরে ওঠার চেষ্টায় প্লেনটা কাঁপতে থাকে। উড়তে থাকে মেঘের স্তরের ভিতর দিয়ে। গোগোলের কানদুটো তুলো দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবু শোকার্ত মায়ের কোল থেকে সে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। সেই প্রথমবার গোগোলের পৃথিবীর অন্য প্রান্তে উড়ে যাওয়া।

তিন

১৯৭১

গাঙ্গুলিরা এখন বস্টনের বাইরে এক ইউনিভার্সিটি-টাউনে থাকে। যতদূর জানা আছে, এখানে তারা ছাড়া কোনও বাঙালি নেই। গঞ্জশহরটায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একটা পাড়া আছে। সেখানকার কিছু কলোনিয়াল আর্কিটেকচার দেখতে গরমের সময় সপ্তাহের শেষে কিছু লোক বেড়াতে আসে। সাদা স্টিপ্‌লসহ একটা চার্চ আছে সেখানে, পাথরের কোর্ট আর জেলখানা, গম্বুজঅলা পাবলিক লাইব্রেরি, কাঠের কুয়ো যেখানে পল রিভিয়ার জল খেয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি। শীতকালে বাড়িগুলোর জানালায় সন্ধ্যার পর মোমের আলো জ্বলে। অশোক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অ্যাসিসট্যান্ট প্রোফেসর হিসেবে কাজ করছে। পাঁচটা ক্লাস পড়িয়ে তার বেতন বছরে ষোলো হাজার ডলার। নিজের অফিস আছে। দরজার উপর কালো প্লাস্টিকে তার নাম খোদাই করা। মিসেস জোন্‌স বলে এক প্রৌঢ়া মহিলা ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে তারও ফরমায়েশ খাটেন। তিনি প্রায়ই বাড়িতে বানানো ব্যানানা ব্রেডের একটা প্লেট স্টাফরুমে কফি মেশিনটার পাশে রেখে দেন। মিসেস জোন্‌সের স্বামী এই বিশ্ববিদ্যালয়েই আমৃত্যু ইংরেজি পড়িয়ে এসেছেন। অশোকের মনে হয়, ভদ্রমহিলা তার মায়ের বয়সি হবেন। মিসেস জোন্‌স অবশ্য এমন জীবন কাটান যা অশোকের মায়ের খুবই অপমানজনক মনে হত। একা খাওয়া, বরফ বা শিলাবৃষ্টির মধ্যে একা গাড়ি চালিয়ে কাজে আসা, ছেলে-মেয়েদের বা নাতি-নাতনিদের সঙ্গে বছরে মাত্র দু'চারবার দেখা হওয়া।

এই চাকরিটায় অশোকের স্বপ্নপূরণ হয়েছে। সে চিরটাকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে চেয়েছে, কোনও কোম্পানিতে কাজ করায় তার আগ্রহ ছিল না। আর এক ঘরভরতি মার্কিন ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর উত্তেজনাই আলাদা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টরিতে “ফ্যাকাল্টি” তালিকায় নিজের নাম দেখে তার ভীষণ তৃপ্তি হয়। মিসেস জোন্‌স যতবার তাকে ডেকে বলেন, “প্রোফেসর গাঙ্গুলি, আপনার স্ত্রী ফোন করেছেন”, ততবার অশোকের অদ্ভুত আনন্দ হয়। পাঁচতলায় তার অফিসের জানালা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উঠোনের মনোরম দৃশ্য চোখে পড়ে, দেখা যায় বাড়িগুলোর লতায় ঢাকা দেওয়াল। আবহাওয়া ভাল থাকলে সে বাইরের বেঞ্চে বসে দুপুরের খাবারটা খায়। শুনতে পায়, ক্যাম্পাসের ঘড়িঘরের ঘণ্টা বাজছে। শুক্রবার, শেষ ক্লাসটা পড়িয়ে সে লাইব্রেরিতে যায়। সেখানে আন্তর্জাতিক খবরের কাগজগুলো পড়ে। আমেরিকার প্লেনগুলো ভিয়েতকং ও কাম্বোডিয়ার যোগাযোগের পথে বোমা ফেলছে, কলকাতার রাস্তায় নকশালরা খুন হচ্ছে, ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ হতে পারে। কখনও কখনও সে ঘুরতে ঘুরতে লাইব্রেরির সবচেয়ে উপরের রোদমাখা, নির্জন অংশটিতে পৌঁছে যায়। সেখানে সাহিত্যের বইগুলো থাকে। অশোক তাকের মাঝখানের গলিগুলো দিয়ে ঘোরাফেরা করে। অনেক সময়ই তাকে দেখা যায় প্রিয় রাশিয়ান লেখকদের বই ঘাঁটতে। সেখানে তার কেমন অদ্ভুত শান্তি হয়, যখন দেখে তাকে রাখা এক সারিবাঁধানো লাল, নীল, সবুজ বইয়ের উপর তার ছেলের নাম সোনালি অক্ষরে লেখা।

কিন্তু অসীমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। শহরতলিতে এসে থাকা তার একেবারেই পছন্দ হয়নি। কলকাতা থেকে কেমব্রিজ আসার চেয়েও এইবারের বাসস্থান বদল তার বেশি খারাপ লেগেছে। তার মনে হয়, অশোক যদি নর্থ-ইস্টার্নের চাকরিটা নিত, তা হলে শহরে থাকা যেত। এই ছোট্ট শহরটা কেমন যেন অদ্ভুত। ফুটপাথ নেই, রাস্তায় আলো নেই, জনসাধারণের জন্য যানবাহন নেই, এমনকী মাইলের পর মাইল কোনও দোকান পর্যন্ত দেখা যায় না। ওরা একটা টয়োটা করোলা গাড়ি কিনতে বাধ্য হয়েছে, এখানে ওটার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই গাড়িটা চালাতে শেখার কোনও ইচ্ছেই নেই অসীমার। এখন সে সন্তানসম্ভবা নয় বটে, কিন্তু রাইস ক্রিস্পি, বাদাম আর পেঁয়াজ মেখে সে এখনও খায়। কারণ তার মনে হয়, বিদেশে বাস করা জীবনভর গর্ভবতী থাকার মতো। এক চিরকালীন অপেক্ষা, ক্রমান্বয়ে ভারবহন করে চলা। ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব, স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে এক সরিয়ে রাখা অংশ। অবশ্য শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, সরিয়ে রাখা অংশটিই সত্য হয়ে উঠেছে, বাইরের ‘স্বাভাবিক’ জীবন অন্তর্হিত। আর এই নতুন জীবন আরও

জটিল, অনেক বেশি দাবি করে। গর্ভধারণের মতোই এই প্রবাসী জীবন অচেনা মানুষজনের কৌতূহলের শিকার, দয়া ও শ্রদ্ধা মেশানো এক দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্র।

স্বামী কাজে গেলে সে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরোয় বটে, কিন্তু ওই যে, কথায় বলে, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে অসীমা, নয়তো বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ্দির লাগোয়া ঐতিহাসিক নিদর্শনসমৃদ্ধ পাড়াটায় যায়। গোগোলকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। গোগোল চৌকো খোলা জায়গাটায় দৌড়োদৌড়ি করে। বৃষ্টির দিনে ছাত্রদের লাউঞ্জে বসে মা-ছেলেতে টিভি দেখে। সপ্তাহে একবার সে তিরিশটা শিঙাড়া তৈরি করে। সেগুলো ইন্টারন্যাশনাল কফিহাউসে মিসেস এটজোল্ডের লিনজ়ার স্কোয়্যার আর মিসেস কাসোলির বাকলাভার পাশাপাশি বিক্রি করা হয়। দাম পঁচিশ সেন্ট করে। প্রত্যেক শুক্রবার সে গোগোলকে পাবলিক লাইব্রেরিতে ছোটদের গল্প শোনার আসরে নিয়ে যায়। চার বছর বয়স হওয়ার পর গোগোল স্কুলে যেতে শুরু করল। স্কুলটা বিশ্ববিদ্যালয়েরই, সপ্তাহে তিনদিন সকালে ক্লাস হয়। বাচ্চারা আঙুল দিয়ে রং করা আর ইংরেজি বর্ণমালা শেখে। গোগোলকে পৌঁছে দেয় অসীমা, আবার নিয়েও আসে। কিন্তু স্কুলের ওই তিনটে ঘণ্টা তার কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। আবার আগের মতো হতাশ আর অনভ্যস্ত লাগে, একাকিত্ব ঘিরে ধরে। গোগোলের আঁচল ধরে চলাটা সে মিস করে। ছেলের তীক্ষ্ণ, শিশুসুলভ গলাটার কথা ভেবে তার মন খারাপ লাগে। একাকিত্ব এড়াতে খালি বাড়িতে ঢোকে না অসীমা, ওই তিন ঘণ্টা পাবলিক লাইব্রেরির রিডিং রুমে একটা ফাটা চামড়া লাগানো চেয়ারে বসে কাটিয়ে দেয়। মাকে চিঠি লেখে, পত্রিকা পড়ে বা বাড়ি থেকে আনা কোনও বাংলা বইয়ে চোখ বুলোয়। ঘরটায় প্রচুর আলো, বেশ একটা খুশি-খুশি ভাব, মেঝেতে টোম্যাটো রঙের কার্পেট। বিরাট গোল কাঠের টেবিল ঘিরে বসে অনেকেই খবরের কাগজ পড়ে, টেবিলের মাঝখানে সুন্দর করে ফুল সাজানো থাকে। ছেলের কথা বড্ড মনে পড়লে অসীমা বাচ্চাদের সেকশনে চলে যায়। সেখানে একটা বুলেটিন বোর্ডে গোগোলের পাশ থেকে তোলা একটা ছবি আঁটা আছে। ছোটদের লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান মিসেস আইকেন 'ক্যাট ইন দ্য হ্যাট' পড়ে শোনাচ্ছেন আর সে মেঝেতে বাবু হয়ে বসে একমনে শুনছে।

দু'বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভরতুকি দেওয়া একটা অতিরিক্ত গরম

অ্যাপার্টমেন্টে থাকার পর অশোক ও অসীমা একটা বাড়ি কিনতে পারার মতো অবস্থায় পৌঁছোল। সন্ধেবেলা খাওয়াদাওয়া সেরে তিনজনে বাড়ি দেখতে বেরোয়। পুরনো পাড়াটার দিকে যায় না। ওখানে একটা আঠারো শতকের অট্টালিকায় অশোকের ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান থাকেন। প্রতি বছর বক্সিং ডে-তে সকলের চা খাওয়ার নেমন্তন্ন থাকে সেখানে। ওদিকে না গিয়ে তারা সাধারণ রাস্তাগুলোর দিয়ে যায়, যেখানে বাস্কেটবলের ব্যাট আর প্লাস্টিকের ওয়েডিং পুল সামনের বাগানে পড়ে থাকে। সব বাড়িই আমেরিকানদের। তারা বাড়ির ভিতরে জুতো পরে, রান্নাঘরে বেড়ালের নোংরার ট্রে থাকে, বেল বাজালে কুকুর ডেকে ওঠে, লাফায়। গাঙ্গুলিরা বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করল, যেমন কেপ, সল্টবক্স, রেঞ্জড র‍্যাঞ্চ, গ্যারিসন। শেষে তারা একটা বাড়ি পছন্দ করেই ফেলল। কলোনিয়াল স্টাইলের কাঠের ছাতঅলা দোতলা বাড়ি। পাড়াটাও নতুন। এক একর জমির উপর তৈরি এই বাড়িটায় আগে কেউ থাকেনি। এই প্রথম আমেরিকার একটা ছোট্ট টুকরোর উপর তাদের পূর্ণ অধিকার জন্মাল। গোগোল বাবা-মার সঙ্গে ব্যাংকে যায়। ওরা অগুনতি কাগজে সই করে, সে চুপ করে বসে থাকে। মর্টগেজের ব্যবস্থা হয়ে গেল, পরবর্তী বসন্তকালেই ওরা দখল পাবে। ইউ-হলের মাধ্যমে নতুন বাড়িতে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। অশোক আর অসীমা অবাক হয়ে দেখল, তাদের সম্পত্তির পরিমাণ নেহাত কম হয়নি। তারা দুজনেই একটা মোটে সুটকেস নিয়ে আমেরিকায় পা রেখেছিল, যাতে সপ্তাহকয়েকের জামাকাপড় ছিল শুধু। আর আজ? গ্লোব পত্রিকার এতগুলো সংখ্যা তাদের অ্যাপার্টমেন্টের কোনায় জড়ো হয়েছে যে, জিনিস বাঁধতে কোনও অসুবিধেই হয়নি। আর টাইম পত্রিকার বছর খানেকের সংখ্যা স্রেফ ফেলে দিতে হচ্ছে।

নতুন বাড়ির দেওয়ালে নতুন রং ধরেছে। ড্রাইভওয়েতে পিচ পড়েছে। ছাতের কাঠ আর স্নানডেক ওয়েদারপ্রুফ করা হয়েছে। অশোক প্রত্যেকটা ঘরের ছবি তুলল। কোনও কোনও ফ্রেমে গোগোলকে দাঁড় করিয়ে দিল। ভারতে পাঠাতে হবে না? গোগোল ফ্রিজ খুলছে, টেলিফোনে কথা বলার ভান করছে। এমনিতে সে বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা দেখতে, ভরাট গাল, তবে মুখটা বিষণ্ন ধরনের। ক্যামেরার সামনে হাসার জন্য তাকে রীতিমতো পীড়াপীড়ি করতে হয়। বাড়িটার থেকে পনেরো মিনিটের দূরত্বে সুপার মার্কেট, শহরের মাঝখানটা চল্লিশ মিনিট দূরে। ঠিকানা হল ৬৭ পেম্বারটন রোড।

পাড়াপড়শিদের নাম জনসন, মেরটন, আসপ্রি, হিল। বাড়িটায় চারটে মাঝারি আয়তনের বেডরুম আছে, সাত ফুট উপরে ছাত, একটা গাড়ি রাখার মতো গ্যারেজ। লিভিং রুমে একটা ইটের ফায়ারপ্লেস আর একটা বে-উইন্ডো আছে। রান্নাঘরে সবই হলুদ রঙের, লিনোলিয়ামটা টাইলসের মতো দেখতে। অসীমার বাবার আঁকা একটা ছবি লিভিং রুমের দেওয়ালে টাঙানো। জলরঙে ফুটিয়ে তোলা রাজস্থানের ক্যারাভানের দৃশ্য। গোগোলের আলাদা ঘর আছে এখানে। তার খাটটার নীচে একটা টানা ড্রয়ার রয়েছে। ধাতুর তৈরি শেলফে নানান খেলনা। টিঙ্কারটয়েজ, লিঙ্কন লগ্‌স, ভিউ-মাস্টার, এচ-এ-স্কেচ ইত্যাদি। গোগোলের বেশিরভাগ খেলনাই সেকেন্ড হ্যান্ড, ইয়ার্ড সেল্‌স থেকে কেনা। অধিকাংশ আসবাবও সেরকমভাবে সংগ্রহ করা, এমনকী পরদাও। টোস্টার আর কিছু বাসনও ওরা সেভাবেই জোগাড় করেছে। অন্যলোকের ব্যবহার করা জিনিস বাড়িতে ঢোকাতে প্রথমদিকে অসীমার আপত্তি ছিল। অচেনা মানুষজনের জিনিস সে ব্যবহার করবে কী করে? তাও আমেরিকানদের জিনিস! কিন্তু অশোক বুঝিয়ে বলে, ওদের চেয়ারম্যানও ইয়ার্ড সেলস থেকে জিনিসপত্র কেনেন। আমেরিকার বুকে তাঁর নিজের অতবড় অট্টালিকা থাকা সত্ত্বেও অন্যের ব্যবহার করা প্যান্ট পঞ্চাশ সেন্ট দিয়ে কিনে পরতে তাঁর অসুবিধে হয় না।

ওরা নিজেদের নতুন বাড়িতে বাস করতে শুরু করল। তখনও বাগান-টাগান ঠিক করা হয়নি অবশ্য। জমিতে কোনও গাছ নেই, বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে কোনও ঝোপঝাড় নেই। ভিতের সিমেন্ট পরিষ্কার চোখে পড়ে। প্রথম কয়েক মাস ছোট্ট গোগোল ময়লা, উঁচুনিচু উঠোনে খেলা করল। স্নিকার নোংরা করল, ফলে যেখানে যায় পায়ের ছাপ দেখা যায়। এই স্মৃতিটা তার জীবনের প্রথম স্মৃতিগুলোর মধ্যে অন্যতম। সারা জীবন গোগোলের মনে থাকবে এই ঠান্ডা, মেঘলা বসন্তকালটা। মাটি আর ময়লা নিয়ে খেলা করা, গর্ত খোঁড়া, পাথর কুড়োনো, একটা স্লেটপাথর সরাতে গিয়ে তার নীচে কালো আর হলদে রঙের স্যালামান্ডার আবিষ্কার করা। মনে থাকবে পাড়ার অন্য বাচ্চাদের গলার শব্দ, হাসতে হাসতে বড় বড় খেলনা গাড়ি রাস্তা দিয়ে ঠেলছিল তারা। মনে থাকবে সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল গ্রীষ্মের দিনটির কথা। সেদিনই ট্রাক থেকে মিহি মাটি ফেলা হল তাদের বাগানে। মনে থাকবে এর কয়েক সপ্তাহ পরে সানডেক থেকে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখতে পাওয়া, কীভাবে ন্যাড়া কালো লনটায় সবুজ ঘাসের ডগা মাথা তুলছে।

প্রথমদিকে ওরা বিকেলে গাড়ি নিয়ে বেড়াতে বেরোত। পাড়াটাকে চিনতে হবে তো! ছোট ছোট মাটির রাস্তা, ছায়াঢাকা নির্জন গলি, খামারবাড়িগুলো থেকে হেমন্তে কুমড়ো আর জুলাইতে সবুজ কার্ডবোর্ডের বাক্সভরতি কুল কেনা, এসবই তারা আস্তে আস্তে জানছিল। গাড়িটার পিছনের সিটের প্লাস্টিকের ঢাকাটা এখনও খোলা হয়নি। অ্যাশট্রেগুলোও নতুন আছে। অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে থাকে। সমাধিস্থল ও ডোবাপুকুরের পাশ দিয়ে গাড়ি ছোটে, অন্ধ গলির মধ্যে ঢুকে বেরিয়ে আসে। কখনও কখনও তারা শহর থেকে দূরে চলে যায়, উত্তরের সমুদ্র উপকূলের দিকে কোথাও। অবশ্য গরমকালেও তারা কখনও স্নান করতে নামে না, বা সৈকতে শুয়ে রোদ পোহায় না। তারা সাধারণ পোশাক পরেই যায়। যখন ওরা তিনজনে সমুদ্রের ধারে পৌঁছোয়, টিকিট কালেক্টারের বুথ তখন খালি, বেশিরভাগ লোকই চলে গিয়েছে, পার্কিং লটে হাতে গোনা কয়েকটা গাড়ি। শুধু কিছু লোক কুকুর নিয়ে বেড়ায়, গুটিকয়েক মানুষ সূর্যাস্ত দেখে আর কয়েকজন কর্মী বালির উপর দিয়ে মেটাল ডিটেক্টর চালায়। ওরা গাড়িতে আসতে আসতে সেই মুহূর্তটার অপেক্ষা করে যখন দূরে সমুদ্রের সরু নীল রেখাটা দেখা যাবে। সমুদ্রের ধারে পৌঁছে গোগোল বালিতে নুড়িপাথর খোঁজে বা সুড়ঙ্গ খোঁড়ে। ছেলে আর বাবা প্যান্ট গুটিয়ে বালিতে হেঁটে বেড়ায়। মাঝে মাঝে ওরা ঘুড়ি ওড়ায়। গোগোল অবাক হয়ে দেখে বাবা কেমন করে মুহূর্তের মধ্যে ঘুড়িটাকে অনেকটা উপরে নিয়ে চলে যায়, এতটাই উঁচুতে যে গোগোলকে পিছনে মাথা হেলিয়ে দেখতে হয়। ওদের কানের পাশে হাওয়ার ঝাপটা লাগে, মুখ ঠান্ডা হয়ে আসে। সাদা সামুদ্রিক পাখি অনেকখানি নীচ দিয়ে ডানা মেলে উড়ে যায়। গোগোল সমুদ্রের জলে হাত-পা ভিজিয়েই দৌড়ে পালিয়ে আসে, বালির উপর তার ছোট্ট পায়ের ছাপ পড়ে, ফের মুছে যায়। ওর মা জোরে জোরে হাসে। চটিজোড়া হাতে নিয়ে, শাড়িটা গোড়ালির থেকে একটু তুলে, হিমশীতল ফেনাওয়ালা জলে পা ডোবায় আর আনন্দে চিৎকার করে ওঠে। মা গোগোলের হাতও ধরে ফেলে কখনও কখনও, বলে, “না, অতটা ভিতরে যেও না।” ঢেউগুলো পিছিয়ে যায়, আবার ফুলেফেঁপে উঠে আসে। নরম বালি যেমন তাদের পায়ের তলা থেকে সরসর করে সরে যায়। ওরা টাল সামলাতে পারে না। মা সবসময় বলে, “পড়ে যাচ্ছি। আমাকে টেনে নিচ্ছে!”

যে আগস্ট মাসটায় গোগোলের পাঁচ বছর বয়স হল, অসীমা বুঝল সে আবার গর্ভবতী। সকালবেলা সে একটা টোস্ট খেতে বাধ্য হয়, কারণ অশোক সেটা নিজে করে আনে আর দেখে, অসীমা বিছানায় শুয়ে সেটা খাচ্ছে কি না। তার সারাদিন মাথা ঘোরে। সে শুয়েই থাকে, বিছানার পাশে একটা গোলাপি প্লাস্টিকের ময়লা ফেলার ঝুড়ি। জানালার পরদা টানা থাকে। অসীমার মুখে-দাঁতে সারাদিন একটা টকটক স্বাদ লেগে থাকে। অশোক টিভিটা লিভিং রুম থেকে সরিয়ে অসীমার বিছানার কাছে এনে রেখেছে। তাতে সারাদিন 'দ্য প্রাইস ইজ রাইট', 'গাইডিং লাইট' বা 'দ্য টেন থাউজ্যান্ড ডলার পিরামিড' জাতীয় অনুষ্ঠান চলে। দুপুরে কোনওমতে একবার বিছানা থেকে ওঠে অসীমা। রান্নাঘরে গিয়ে গোগোলের জন্য পিনাট বাটার আর জেলি স্যান্ডউইচ বানায়। তখন ফ্রিজ খুলতেই হয় আর সঙ্গে সঙ্গে গা গুলিয়ে ওঠে অসীমার। যেন ফ্রিজের সবজিগুলোর জায়গায় ময়লা আছে বা মাংস সব পচে গেছে। গোগোল এসে কখনও তার পাশে শোয়, বই পড়ে বা ক্রেয়ন দিয়ে রং করে। একদিন অসীমা বলল, "তুমি বড় ভাই হতে চলেছ, গোগোল। তোমাকে দাদা বলে ডাকার মতো কেউ আসছে। কী মজা হবে, না?" শরীর ভাল থাকলে গোগোলকে অ্যালবামটা নিয়ে আসতে বলে সে। একসঙ্গে ছবি দেখে। গোগোলের দাদু, দিদা, মামা, মাসি, কাকা, পিসি, সকলের ছবি। কিন্তু এদের কাউকেই গোগোলের মনে নেই। একবার কলকাতা যাওয়া সত্ত্বেও মনে নেই। অসীমা ছেলেকে চার লাইনের একটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে শেখায়। দুর্গাপুজোর সময় দুর্গাপ্রতিমার চারদিকে যে-সব দেবদেবীদের দেখা যায়, তাঁদের নাম মুখস্থ করায়। দুপুরে ঘুমোয় অসীমা, কিন্তু তার আগে টিভিটা দু'নম্বর চ্যানেলে দিয়ে দেয়। গোগোলকে বলে *সিসেম স্ট্রিট* আর *ইলেকট্রিক কোম্পানি* দেখতে, যাতে নার্সারি স্কুলে শেখানো ইংরেজি আরও সড়গড় হয়।

রাতে গোগোল আর গোগোলের বাবা একসঙ্গে খায়। রবিবারে দুটো ভাঙা ডাচ উনুনে সাতদিনের ভাত আর মুরগির ঝোল একেবারে রান্না করে রাখে গোগোলের বাবা। সেটাই দু'জনে সাতদিন ধরে খায়। খাবার গরম করার সময় বাবা গোগোলকে বলে শোবার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিতে, মার ওই গন্ধ সহ্য হয় না তো, তাই। এখন খাবার সময় বাবা আর মায়ের কথার শব্দ আর পাওয়া যায় না, যেমন বন্ধ শোবার ঘর থেকে টিভিতে খবর পড়ার

আওয়াজও আসে না। বাবা মাথা নিচু করে খায়, *দ্য টাইমসের* নতুন সংখ্যাটা পড়তে পড়তে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখে, গোগোল ঠিকমতো খাচ্ছে কি না। গোগোলের ভাত আর ঝোল বাবা মেখে দেয় বটে, কিন্তু মায়ের মতো দলা করে করে প্লেটের চারদিকে গোল করে সাজিয়ে ঘড়ি করে দেয় না। অবশ্য গোগোল নিজেহাতে খেতে শিখে গেছে, খাওয়ার সময় ওর হাতের পাতায় মোটেই ঝোলের দাগ লাগে না। সে ভেড়ার মাংসের হাড় থেকে মজ্জাটা চুষে খেতে পারে, মাছের কাঁটা বাছতে পারে। কিন্তু মা না থাকলে তার খেতে ভাল লাগে না। প্রতিটা সন্ধেয় সে মনে মনে আশা করে, মা ভাল হয়ে যাবে। বাবা আর তার মাঝখানে এসে বসে শূন্য বাতাস ভরিয়ে দেবে শাড়ি আর কার্ডিগানের গন্ধে। রোজ একই খাবার খেতে তার আর ভাল লাগে না। শেষে একদিন গোগোল আস্তে আস্তে খাবার প্লেটের একপাশে সরিয়ে দেয়। তর্জনী দিয়ে পাতে ছবি আঁকতে থাকে।

“ খেয়ে নাও,” বাবা বই থেকে মুখ তুলে বলে, “খাবার নিয়ে ওই রকম খেলতে নেই।”

“পেট ভরে গেছে, বাবা।”

“থালায় ভাত পড়ে আছে কেন?”

“আর পারব না।”

গোগোলের বাবার থালা অবশ্য একেবারে পরিষ্কার। চেটেপুটে ভাত খাওয়া হয়েছে, মুরগির হাড়গুলো চিবিয়ে ছিবড়ে করে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে, তেজপাতা আর দারচিনিগুলো পর্যন্ত নতুনের মতো। অশোক গোগোলের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে। খাবার ফেলা সে পছন্দ করে না। ক্যাম্পাসের ময়লা ফেলার জায়গায় আধখাওয়া স্যান্ডউইচ বা আপেল দেখলে তার বড্ড খারাপ লাগে। “ওটা শেষ করো গোগোল, তোমার বয়সে আমি এর অনেক বেশি খেতাম।”

গাড়িতে উঠলেই অসীমা বমি করে ফেলে। তাই সে গোগোলকে কিন্ডারগার্টেনের প্রথম দিনে পৌঁছোতে যেতে পারল না। অশোক একাই গেল। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস। গোগোল শহরের পাবলিক এলিমেন্টারি স্কুলে ভরতি হয়েছে। গোগোল যখন ভরতি হল, তখন বছরের দুটো সপ্তাহ কেটে গেছে। আসলে এই ক'দিন গোগোল মায়ের মতোই নিঃসাড়ে শুয়েছিল। বলছিল, তার পেটব্যথা হয়েছে। একবার তো মায়ের

গোলাপি বাস্কেটে বমিও করল। কিন্ডারগার্টেনে যাওয়ার ইচ্ছে তার ছিল না। সে মায়ের কেনা নতুন জামা ড্রেসার থেকে নিয়ে পরতে চায় না, চার্লি ব্রাউন লাঞ্চবক্স নিতে চায় না, পেম্বারটন রোডের মোড় থেকে হলুদ রঙের স্কুলবাসেও উঠতে চায় না। এই স্কুলটা নার্সারি স্কুলের মতো বাড়ির কাছে নয়। বাড়ি থেকে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেকটাই দূরে। ও বেশ কয়েকবার স্কুলটা দেখেছে। ইটের একতলা বাড়ি, নীচু আর লম্বা। সামনে সাদা পোল থেকে পতাকা ওড়ে।

গোগোলের কিন্ডারগার্টেন না যেতে চাওয়ার একটা কারণ আছে। বাবা-মা বলেছে, নতুন স্কুলে গোগোলকে গোগোল বলে কেউ ডাকবে না। একটা নতুন ভাল নামে ডাকবে। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শুরু করার আগে শেষ অবধি বাবা-মা একটা ভাল নাম ঠিক করতে পেরেছে। নামটা হল নিখিল, পুরনো নামটার সঙ্গে এই নতুন নামটার নান্দনিক যোগাযোগ আছে। বাঙালিদের মধ্যে প্রচলিত ভাল নাম তো বটেই, নিখিলের সঙ্গে লেখক গোগোলের প্রথম নাম 'নিকোলাই'য়ের একটা ধ্বনিগত সাদৃশ্যও আছে। লাইব্রেরিতে গোগোলের লেখা বইগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অশোকের হঠাৎই এই নামটা মাথায় আসে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরে অসীমার মতামত চেয়েছিল সে। বলেছিল, নিখিল নামটা উচ্চারণ করতে সুবিধে। অবশ্য আমেরিকানরা ছোট করে বলতে যা ভালবাসে, নিখিলকে 'নিক' বলে ডাকতে শুরু করলে কিছু করার নেই। অসীমা বলেছিল, নামটা তার পছন্দই হয়েছে। যদিও, পরে একা একা সে অনেক কেঁদেছে। দিদার কথা ভেবে, আর সেই চিঠিটার কথা ভেবে যাতে দিদার পছন্দ করা ভালনামটা রয়েছে আর যেটা ভারত আর আমেরিকার মধ্যে কোথাও ভাসছে। এখনও সেই চিঠিটার স্বপ্ন দেখে অসীমা। দেখে, এতকাল বাদে চিঠিটা সে পেম্বারটন রোডের চিঠির বাক্সে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু খুললে দেখা যায়, চিঠিটায় একটা শব্দও লেখা নেই।

কিন্তু গোগোল তো নতুন নাম চায়নি। অন্য কোনও নামে কেন তাকে সাড়া দিতে হবে সে বুঝতে পারে না। চোখে জল নিয়ে সে বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করে, "আমাকে নতুন নাম নিতেই হবে কেন?" যদি বাবা আর মাও তাকে নিখিল বলে ডাকত, তা হলে একটা কথা হত। কিন্তু তা নয়, নতুন নামটা নতুন স্কুলের টিচার ও ছেলেমেয়েরা ডাকবে। আর কেউ নয়। নিখিল হতে গোগোলের ভয় করে। সে তো নিখিলকে চেনে না। নিখিলও তো

তাকে চেনে না। বাবা-মা বলে সব বাঙালিদের দুটো নাম থাকে। বাবার আছে, মা-র আছে, আমেরিকায় ওদের বাঙালি বন্ধুদের আছে, কলকাতাতেও সবার আছে। বাঙালিরা নাকি এভাবেই বড় হয়। ওরা নামটা কাগজে লেখে, গোগোলকে বলে দেখে দেখে দশবার শব্দটা লিখতে। "কিচ্ছু ভেবো না," গোগোলের বাবা বলে, "আমার কাছে, তোমার মার কাছে, তুমি চিরকালই গোগোল থাকবে।"

স্কুলে পৌঁছে গোগোল আর অশোক সেক্রেটারি মিসেস ম্যাকন্যাবের সঙ্গে দেখা করল। তিনি অশোককে একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ভরতে বললেন। গোগোলের জন্মের সার্টিফিকেট আর টিকাকরণের কাগজপত্রও জমা দিতে হল। মিসেস ম্যাকন্যাব সবকিছু একসঙ্গে একটা ফোল্ডারে ভরে রাখলেন। তারপর ওদের বললেন, "এইদিকে চলুন। প্রিন্সিপ্যালের অফিসে।" প্রিন্সিপ্যালের দরজার উপর তাঁর নাম লেখা, ক্যানডেস ল্যাপিডাস। মিসেস ল্যাপিডাস অশোককে বললেন, কিন্ডারগার্টেনের প্রথম সপ্তাহটা না আসলে এমন কিছু ক্ষতি হয় না। এখনও তেমন কিছু শুরু হয়নি। ইনি এক দীর্ঘকায়, ছিপছিপে মহিলা, সাদাটে সোনালি চুল। চোখে ফ্রস্টেড নীল আই শ্যাডো আর উজ্জ্বল হলদে রঙের সুট। অশোকের সঙ্গে করমর্দন করে তিনি খবর দিলেন, স্কুলে আরও ভারতীয় ছাত্র আছে। থার্ড গ্রেডে জয়দেব মোদি আর ফিফ্‌থে রেখা সাক্সেনা। গাঙ্গুলি পরিবারের সঙ্গে তাদের আলাপ আছে কি? প্রশ্নের উত্তরে অশোক জানাল, না, তাদের সঙ্গে পরিচয় নেই। মিসেস ল্যাডিপাস রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা দেখে গোগোলের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন। গোগোল তখন তার বাবার হাত আঁকড়ে ধরে আছে। তার পরনে পাউডার ব্লু প্যান্ট, লাল-সাদা ক্যানভাসের স্নিকার জুতো, স্ট্রাইপ দেওয়া গলাতোলা জামা।

"এলিমেন্টারি স্কুলে স্বাগত, নিখিল। আমি তোমার প্রিন্সিপ্যাল মিসেস ল্যাপিডাস।"

গোগোল চোখ নামিয়ে নিজের জুতোর দিকে তাকাল। মিসেস ল্যাপিডাস যেভাবে তার নাম উচ্চারণ করছেন, সেভাবে ওর বাবা-মা করে না। বাবা-মা দ্বিতীয় অংশটা টেনে লম্বা করে বলে।

মিসেস ল্যাপিডাস নিচু হয়ে গোগোলের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেলেন। কাঁধে হাত রাখলেন। "তোমার বয়স কত জানো, নিখিল?"

নিস্তব্ধতা। আবার প্রশ্নটা করলেন প্রিন্সিপ্যাল। এবারেও কোনও সাড়া

নেই। মিসেস ল্যাপিডাস অশোককে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার ছেলে ইংরেজি বোঝে তো, মি. গাঙ্গুলি?"

"নিশ্চয়ই," অশোক বলল, "আমার ছেলে দুটো ভাষা বলতে-বুঝতে পারে।"

গোগোল যে ইংরেজি জানে, সেটা প্রমাণ করতে গিয়ে অশোক এবার এমন একটা কাজ করল যেটা সে আগে কখনও করেনি। সে সাবধানে আমেরিকান উচ্চারণে ছেলেকে বলল, "গোগোল, মিসেস ল্যাপিডাসকে বলে দাও তোমার বয়স কত।"

মিসেস ল্যাপিডাস হঠাৎ বললেন, "কী হল?"

"কোনটা, ম্যাডাম?"

" যে নাম ধরে আপনি ওকে ডাকলেন। জি দিয়ে..."।

"ও! ওটা? ওটা ওর ডাকনাম। বাড়িতে ডাকি," অশোক বলল, "তবে ওর ভালনাম হল নিখিল।"

"আমি বুঝতে পারলাম না। ভালনাম?" মিসেস ল্যাপিডাসের কপালে ভাঁজ।

"হ্যাঁ। ভালনাম।"

মিসেস ল্যাপিডাস রেজিস্ট্রেশন আবার ফর্মটা দেখলেন। এই গণ্ডগোলটা অন্য দুটি ভারতীয় ছেলেমেয়েকে নিয়ে হয়নি। ফোল্ডারটা খুলে জন্মের সার্টিফিকেট আর টিকাকরণের কাগজপত্রও দেখলেন তিনি। "এখানে একটা ভুল হচ্ছে, মি. গাঙ্গুলি। এইসব কাগজপত্র অনুযায়ী আপনার ছেলের নাম আইনত গোগোলই হওয়া উচিত।"

"হ্যাঁ, কিন্তু..."

"কিন্তু আপনি চান যে, ওকে আমরা নিখিল বলে ডাকি।"

"হ্যাঁ।"

মিসেস ল্যাপিডাস মাথা নাড়লেন, "কেন?"

"আমাদের তাই ইচ্ছে।"

"আমি বুঝতে পারছি না, মি. গাঙ্গুলি। নিখিল কি আপনার ছেলের মাঝের নাম? নাকি ডাকনাম? এখানে অনেককেই ডাকনাম ধরে ডাকা হয়। ফর্মে এই যে জায়গাটা দেখছেন, এখানে..."

"না, এটা ওর মাঝের নাম নয়," অশোক বলল। সে ততক্ষণে ধৈর্য হারিয়েছে। "ওর কোনও মাঝের নাম নেই। এটা ওর ডাকনামও নয়। আমার

ছেলের ভাল নাম, স্কুলের নাম, হল নিখিল।"

মিসেস ল্যাপিডাস ঠোঁট টিপে হাসলেন। "কিন্তু দেখাই যাচ্ছে, ও এই নামে সাড়া দেয় না।"

"প্লিজ় মিসেস ল্যাপিডাস," অশোক বোঝাবার চেষ্টা করে যায়, "একটা বাচ্চার পক্ষে এরকম গোলমাল করাটা স্বাভাবিক। ওকে কিছুটা সময় দিন। আমি বলছি ও ঠিক সব বুঝতে পারবে।" এবার অশোক নিচু হয়ে শান্ত বাংলায় গোগোলকে বলল, "ভয় পেয়ো না, গোগোল। তুমি এখন বড় হয়েছ। মিসেস ল্যাডিপাস যা জিজ্ঞেস করবেন, তার উত্তর দাও। কাঁদবে না।"

মিসেস ল্যাডিপাস বাংলা বোঝেন না, তবু তিনি সন্তর্পণে সবটা শোনার চেষ্টা করলেন। বিশেষ করে নামটা। গোগোল, গোগোল। খুব সাবধানে তিনি রেজিস্ট্রেশন ফর্মের উপর পেনসিল দিয়ে নামটা লিখে রাখলেন।

অশোক টিফিনবাক্সটা গোগোলের সঙ্গে দিয়ে দিল, আর একটা উইনচিটার। যদি পরে ঠান্ডা লাগে! মিসেস ল্যাডিপাসকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে গোগোলের দিকে ফিরল। ইংরেজিতে বলল, "ভাল হয়ে থেকো, নিখিল।" এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল অশোক।

খালি ঘরে মিসেস ল্যাডিপাস গোগোলকে জিজ্ঞেস করলেন, "এলিমেন্টারি স্কুলে কেমন লাগছে, গোগোল?"

"আমার বাবা-মা বলেছেন, স্কুলে আমাকে অন্য একটা নামে ডাকা হবে।"

"আর তুমি? তুমি কী চাও? অন্য একটা নাম তুমি চাও?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গোগোল মাথা নাড়ল।

"তার মানে কী? না?"

আবার মাথা নাড়ে গোগোল, "হ্যাঁ।"

"ঠিক আছে। তা হলে ব্যাপারটা মিটে গেল। এই কাগজের টুকরোটায় তোমার নাম তুমি লিখতে পারবে?"

গোগোল পেনসিলটা তুলে নিল। তারপর মন দিয়ে নিজের নামটা লিখল। এতদিনে এই একটাই শব্দ সে লিখতে শিখেছে। তাও ঘাবড়ে গিয়ে 'এল' অক্ষরটা উলটো লিখে ফেলল সে। "বাঃ, তোমার হাতের লেখা তো দিব্যি," মিসেস ল্যাডিপাস বললেন। তিনি পুরনো রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা ছিঁড়ে ফেলে মিসেস ম্যাকন্যাবকে একটা নতুন ফর্ম টাইপ করতে বললেন। তারপর তিনি গোগোলকে কার্পেট লাগানো একটা হল দিয়ে হাত ধরে নিয়ে গেলেন। হলটার দেওয়াল রং করা সিমেন্টের। একটা দরজা খুলে গোগোলকে তার

দিদিমণি মিস ওয়্যাটকিন্‌সের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। মিস ওয়্যাটকিন্‌সের পরনে ওভারল আর কাঠের জুতো। ভেতরে, ক্লাসরুমে, সকলে সকলকে সংক্ষিপ্ত নামে ডাকে। অ্যান্ড্রু হয়ে গেছে অ্যান্ডি, আলেকজান্ড্রার নাম স্যান্ডি, উইলিয়াম হল বিলি, এলিজাবেথ লিজি। গোগোলের বাবা-মায়ের ছোটবেলাকার স্কুলের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। শিশুবয়স থেকেই ঝরনা-কলম, পালিশ করা কালো জুতো, খাতাপত্র, ভালনাম আর স্যার-ম্যাডামের সঙ্গে কোনওভাবেই একে মেলানো যায় না। এখানে একমাত্র কেতাবি ব্যাপার হল রোজ সকালে আমেরিকার পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। বাকি দিনটা বাচ্চারা বিরাট গোল টেবিলের চারদিকে বসে পানচ আর কুকি খায়, মেঝের উপর ছোট ছোট কমলা রঙের কুশনে মাথা দিয়ে ঘুমোয়। প্রথম দিন গোগোলের গলায় একটা চিঠি সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে তাকে বাড়ি পাঠানো হল। চিঠিটা মিসেস ল্যাডিপাস লিখেছেন গোগোলের বাবা ও মাকে। তাতে লেখা, গোগোলের ইচ্ছে অনুযায়ী তাকে স্কুলে গোগোল বলেই ডাকা সাব্যস্ত হয়েছে। আর ছেলের বাবা-মায়ের ইচ্ছের কী হবে? অসীমা আর অশোক অনেক ভাবল। কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে আর কিছু করতে তারা এগোল না।

এইভাবেই শুরু গোগোলের লেখাপড়ার। একটা হলুদ খসখসে কাগজের উপর সে নিজের ডাকনামটা বারবার লিখতে থাকে। তারপর তাকে ছোট আর বড় হাতের অ্যালফাবেট লিখতে শেখানো হয়। যোগ-বিয়োগ শিখতে হয় তাকে, ছোট ছোট শব্দের বানানও। স্কুল থেকে দেওয়া পড়ার বইয়ের মলাটের উপর অন্য অনেক নামের নীচে সে দু' নম্বর পেনসিলে নিজের নামটি লেখে। তবে আর্ট ক্লাসই গোগোলের সবচেয়ে পছন্দের ক্লাস। গোটা সপ্তাহ এই একটা ক্লাসের জন্যই সে অপেক্ষা করে। আর্ট ক্লাসে তৈরি করা মাটির কাপ বা বাটির নীচে কাগজ আটকানোর ক্লিপ দিয়ে নিজের নামটা খোদাই করে দিতে হয়। কার্ডবোর্ডের উপর কাঁচা পাস্তা আঠা দিয়ে লাগায় সে, আর ছবি এঁকে মোটা তুলি দিয়ে ছবির নীচে নাম সই করে। গোগোল নিজের সৃষ্টিগুলো বাড়ি নিয়ে এলে অসীমা গর্ব করে সেগুলো ফ্রিজের চারপাশে আটকে রাখে। ডানদিকের নিজের কোনায় সই করে গোগোল, 'গোগোল জি', যেন স্কুলের অন্য কোনও গোগোলের থেকে তাকে আলাদা করে ফেলার আদৌ দরকার আছে।

মে মাসে গোগোলের ছোট একটা বোন হল। এবারে গর্ভযন্ত্রণা তাড়াতাড়িই উঠেছিল। এক শনিবার সকালে কাছের ইয়ার্ড সেলে যাওয়ার কথা ভাবা হচ্ছিল, স্টিরিয়োতে বাংলা গান বাজছিল। গোগোল ফ্রোজেন ওয়াফ্‌ল খেতে খেতে ভাবছিল, গানের আওয়াজটা একটু কমালে সে টিভিতে যে-কার্টুনটা দেখছে তার কথাগুলো শুনতে পায়। সেই সময় তার মা-র জল ভাঙল। গোগোলের বাবা গানটা থামিয়ে দিলীপ ও মায়া নন্দীকে ফোন করল। নন্দীরা এখন কাছেই শহরতলিতে থাকে, যাতায়াতের সময়ের হিসেবে মিনিট কুড়ি দূরে। তাদের একটা ছেলে হয়েছে। তারপর পাশের বাড়ির মিসেস মারটনকে ফোন করল বাবা, উনি নন্দীরা না আসা পর্যন্ত গোগোলের দেখাশুনো করবেন। বাবা-মা তাকে এই সময়টার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত করেছিল বটে, কিন্তু সেলাইয়ের কাজ হাতে নিয়ে মিসেস মারটন যখন ঢুকলেন, গোগোলের মনে হল একটা দ্বীপে তাকে একা রেখে দেওয়া হয়েছে। সে বাড়ির সামনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেখল, বাবা মাকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করছে। তারপর হাত নাড়িয়ে ওরা চলা গেল। সময় কাটানোর জন্য সে বাবা-মা আর নতুন বাচ্চাটার সঙ্গে নিজের ছবি আঁকতে লাগল। সকলে বাড়ির সামনে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। মার কপালে টিপ পরাতে সে ভুলল না, বাবাকে চশমা পরাল। বাড়ির সামনের পাথর গাঁথা রাস্তার পাশে ল্যাম্পপোস্টটাও আঁকল। মিসেস মারটন পিছন থেকে ঝুঁকে পড়ে ছবিটা দেখে বললেন, "বাঃ, এই না হলে নিখুঁত ছবি!"

সেই সন্ধ্যায় মায়ামাসি, যাকে গোগোল তার নিজের মাসির মতোই মনে করে, খাবার গরম করছিলেন। খাবারটা তিনিই রান্না করে এনেছেন। তখনই গোগোলের বাবা ফোন করে জানাল, বাচ্চা এসে গিয়েছে। পরদিন গোগোল মাকে দেখল। মা একটা কোনাচে বিছানায় বসে আছে, কবজিতে একটা প্লাস্টিকের ব্রেসলেট। পেটটাও আর তেমন বড়, গোল নয়। বিরাট একটা কাচের জানালা দিয়ে সে তার ছোট্ট বোনকে দেখতে পেল। কাচের বিছানায় ঘুমিয়ে আছে বোনটা। নার্সারির অতগুলো বাচ্চার মধ্যে শুধু ওরই মাথায় কালো চুল। মা-র দেখাশোনা করে যে নার্সরা, তাদের সঙ্গেও গোগোলের আলাপ হল। সে মায়ের জন্য আনা ট্রে থেকে জুস আর পুডিং খেল। লজ্জা-লজ্জা ভাব করে সে মাকে তার আঁকা ছবিটাও দিল। ছবির নীচে সে মা, বাবা আর নিজের নাম লিখেছে। চার নম্বর ছবিটা, মানে নতুন বাচ্চার ছবিটার তলায় কিছু লেখা নেই। "আমি ওর নাম জানতাম না," গোগোল বলল। এবার অশোক

আর অসীমা আর আগের মতো ভুল করেনি। ছেলে বা মেয়ে, যা-ই হোক না কেন, ওরা নাম ঠিক করে রেখেছে। গোগোলের ঘটনার পর শিক্ষা হয়ে গেছে ওদের। ওরা জেনে ফেলেছে, আমেরিকার স্কুলে বাবা-মার কথা অগ্রাহ্য করে বাচ্চার ডাকনাম নথিভুক্ত করা হয়। এ-সব ঝামেলা এড়াতে তারা ডাকনামের ব্যাপারটাই তুলে দিচ্ছে এবার। এখানকার বহু বাঙালিই এমন করেছে। মেয়ের জন্য তারা একটাই নাম ঠিক করেছে। সেটাই ডাকনাম, আবার সেটাই ভালনাম। সোনালি।

দু'দিন পরে স্কুল থেকে ফিরে গোগোল মাকে আবার বাড়িতে দেখতে পেল। তবে এখন মা শাড়ির বদলে বাথরোব পরে আছে। আর বোনকেও এই প্রথমবার জাগা অবস্থায় দেখল গোগোল। গোলাপি পাজামা আর জামায় ওর হাত-পা ঢাকা, চাঁদের মতো গোল মুখটা ঘিরে আছে গোলাপি বনেট। বাবাও বাড়ি আছে। বাবা আর মা গোগোলকে লিভিং রুমের সোফাতে বসিয়ে সোনালিকে ওর কোলে তুলে দিল। বলল, বুকের কাছে বোনকে জড়িয়ে ধরতে, একটা হাত মাথার তলায় দিতে। বাবা নতুন ৩৫ মিমি নিকন ক্যামেরা দিয়ে ওদের ছবি তুলল। শাটারটা নরম শব্দ করে পড়ল, বারবার। ঘরটা বিকেলের মনভোলানো আলোয় ভরে গেল। "হাই সোনালি," গোগোল শক্ত হয়ে বসে থাকতে থাকতেই বোনের মুখের দিকে তাকাল, তারপর ক্যামেরার দিকে। সোনালির বার্থ সার্টিফিকেটে ওই নাম থাকলেও বাড়িতে ওরা তাকে সোনু বলে ডাকতে শুরু করল। তারপর সোনা, সব শেষে সোনিয়া। সোনিয়া নামটা তাকে বিশ্বনাগরিক হতে সাহায্য করে। এ নামটা রাশিয়ানদের হয়, অর্থাৎ দাদার রাশিয়ান নামের সঙ্গে যোগাযোগ থাকছে। ইউরোপে সোনিয়া নাম হতে পারে, হতে পারে দক্ষিণ আমেরিকায়। পরবর্তীকালে এটা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ইতালিয়ান স্ত্রীর নামও হবে। প্রথমদিকে গোগোলের অবশ্য মনখারাপ হয়েছিল। কারণ বোন তার সঙ্গে খেলে না। সে শুধু ঘুমোয়, ডায়পার নোংরা করে আর কাঁদে। কিন্তু আস্তে আস্তে সোনিয়া তার কথায় সাড়া দিতে আরম্ভ করল। পেটে সুড়সুড়ি দিলে বা দোলনায় ঠেলা দিলে জোরে হাসে, 'পিকাবু' বললেও হেসে ওঠে। সে বোনকে স্নান করানোর সময়ে মাকে সাহায্য করে, তোয়ালে বা শ্যাম্পু এনে দেয়। শনিবার রাতে হাইওয়ে ধরে কারও বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেলে গাড়ির পেছনের সিটে গোগোল বোনকে খেলা দেয়। এতদিন কেমব্রিজের সব বাঙালি পরিবারই ডেডহ্যাম বা ফ্র্যামিংহ্যাম বা লেক্সিংটন বা উইনচেস্টারে বাস করছে, তাদের সকলের বাড়িতেই ড্রাইভওয়ে

ও ব্যাকইয়ার্ড আছে। এত বাঙালির সঙ্গে তাদের আলাপ হয়ে গেছে যে প্রায় কোনও শনিবারই ফাঁকা পাওয়া যায় না। কোথাও-না-কোথাও যেতে হয়। গোগোলের ছেলেবেলার সব শনিবারের স্মৃতিই তাই প্রায় এক রকম থাকবে। একটা নির্দিষ্ট ছবি। মফস্সলের কোনও তিন বেডরুমের বাড়িতে জনা তিরিশেক লোক, বেসমেন্টে বাচ্চারা টিভি দেখছে বা ইনডোর গেম খেলছে, বাবা-মায়েরা খেতে খেতে বাংলায় কথা বলছে, এমন একটা ভাষায় যাতে ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে না। তার মনে থাকবে কাগজের প্লেটে ঝোলঅলা তরকারি খাওয়ার কথা, কখনও কখনও অবশ্য বাচ্চাদের জন্য আলাদা করে পিৎজ়া বা চিনে খাবারও আসত। সোনিয়ার মুখেভাতে এত লোককে নেমন্তন্ন করতে হল যে, অশোক ক্যাম্পাসে একটা হলঘর ভাড়া করল। সেখানে আছে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টোভ আর কুড়িটা ফোল্ডিং টেবিল। দাদার মতো বাধ্য বাচ্চা সোনিয়া নয়। সে প্রায় কিছুই খেল না। উঠোন থেকে তুলে আনা মাটির ডেলাটা নিয়ে খেলতে শুরু করল আর ডলারের নোটটা মুখে পুরে দিতে চাইল। একজন বলল, "এই মেয়েটাই দেখছি আসল আমেরিকান।"

নিউ ইংল্যান্ডে তাদের জীবন আস্তে আস্তে বাড়ছিল, যেমন বাড়ছিল তাদের বাঙালি বন্ধুদের সংখ্যা। কিন্তু অন্যদিকে অশোক-অসীমার আগের জীবনটা কেমন যেন ধূসর হয়ে যাচ্ছিল। তাদের 'মনু' বা 'মিঠু' ডাকার লোকেদের সংখ্যা ক্রমশ কমছিল। আরও মৃত্যুর খবর আসে, আরও মাঝরাতের টেলিফোন কল, চিঠির বাক্সে আরও চিঠি তাদের কাকা-পিসি-মাসি-মামাদের না থাকার খবর দিয়ে যায়। অন্য চিঠির মতো মৃত্যুসংবাদের চিঠি কিন্তু কখনওই ডাকে হারিয়ে যায় না। ঠিক পৌঁছোয়। দুঃসংবাদ, যত পুরনো বা প্রত্যাশিতই হোক, হারিয়ে যায় না। বিদেশে থাকার এক দশক পার হতে না হতেই অশোক ও অসীমা দু'জনেই পিতৃমাতৃহীন হল। অশোকের বাবা-মা দুজনেই ক্যানসারে গত হয়েছেন, অসীমার মা কিডনির অসুখে। এইসব খবর আসার দিন ভোরবেলা বা গভীর রাতে গোগোল ও সোনিয়ার ঘুম ভেঙে গেছে। শোবার ঘরের পাতলা দেওয়াল ভেদ করে বাবা বা মা-র কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছে তারা। বাবা-মার ঘরে হুমড়ি খেয়ে ঢুকে পড়েছে তারা, অবুঝ চোখে তাকিয়েছে। বড়দের অশ্রু দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তাদের মন খারাপ হয়েছে সামান্যই। একদিক দিয়ে অশোক আর অসীমার জীবন অতিবৃদ্ধদের জীবনের মতোই। যাদের

তারা ভালবাসত বা জানত, তারা কেউই আর কাছে নেই। সম্বল বলতে শুধুই স্মৃতি। পরিবারের যে-সব লোকেরা বেঁচে আছে, তারাও তো একরকম মৃতই। কারণ তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে, অনেক দূরে। টেলিফোনে পরিবারে কোনও জন্ম বা বিয়ের খবর পেলে তাদের শিরদাঁড়া দিয়ে হিমস্রোত বয়ে যায়। এ কি সম্ভব? এরা এখনও বেঁচে? কথা বলছে? কয়েক বছর পর পর কলকাতা গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা হওয়াটা আরও স্বপ্নের মতো। ছ'-আট সপ্তাহ যেন কীভাবে কেটে যায়! পেম্বারটন রোডের ছোট বাড়িটায় ফিরলে সেটাই বিরাট বড় ঠেকে। মনে হয়, দুনিয়ায় 'গাঙ্গুলি' নামে তারা ছাড়া আর যেন কেউ নেই। কয়েকদিন আগে ভারতে শ'খানেক গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা হওয়াটাও কেমন যেন অসম্ভব লাগে। অশোকরা জানে, তাদের বড় হওয়ার সঙ্গীরা এই আমেরিকান জীবনটা কোনওদিন দেখতে পাবে না। নিউ ইংল্যান্ডের ভোরের ভেজা বাতাসে তারা শ্বাস নেবে না, প্রতিবেশীর বাড়ির চিমনি থেকে ওঠা ধোঁয়া দেখতে পাবে না, কাচ থেকে জমাট বরফ ঝরার আর ইঞ্জিন গরম হওয়ার অপেক্ষায় গাড়িতে বসে দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের কখনও হবে না।

অথচ, এত সব অন্যরকম ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, বাইরের লোকের দৃষ্টিতে চারপাশের অন্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের কোনও তফাত নেই। শুধু চিঠির বাক্সে লেখা নামটা অন্য রকম। তাতে *ইন্ডিয়া অ্যাব্রড* আর *সংবাদ বিচিত্রা* ফেলা হয়। এ ছাড়া, পার্থক্য আর তেমন নেই। অন্য সব গ্যারেজের মতোই তাদের গ্যারেজে বেলচা, বাগান করার কাঁচি আর একটা স্লেড রয়েছে। গ্রীষ্মে তাদের পোর্চে একটা বারবিকিউ উনুনে তন্দুরি হয়। তবে যত ছোট কাজই হোক না কেন, করার আগে তারা বাঙালি বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে নেয়। প্লাস্টিকের আর ধাতুর আঁচড়ার মধ্যে তফাত কী? আসল ক্রিসমাস ট্রি কেনা ভাল, না নকল? থ্যাংকসগিভিং উপলক্ষে টার্কির রোস্ট করতে শিখে গেছে তারা। তবে রসুন, জিরেবাটা আর লঙ্কাগুঁড়ো মাখিয়ে নিয়ে। ডিসেম্বরে তারা দরজায় সাদা গোলাকৃতি ফুলের রিথ ঝোলায়। স্নোম্যানের গলায় মাফলার জড়িয়ে দেয়। ইস্টারে সেদ্ধ ডিমে হলুদ আর গোলাপি রং করে বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখে। গোগোল আর সোনিয়ার কথা ভেবে তারা জিশুখ্রিস্টের জন্মদিন খুব ধুমধাম করে পালন করে। দুর্গাপুজো বা সরস্বতীপুজোর থেকে ক্রিসমাসেই বাচ্চাদের আগ্রহ বেশি। পুজো হয় সুবিধে বুঝে, বছরের দুটো শনিবারে। সেই দু'দিন গোগোলদের জোর করে টানতে টানতে কোনও হাই স্কুল বা নাইট্স অব কলম্বাস হলে নিয়ে যাওয়া হয়। সে-সময় জায়গাটা পুরোপুরি বাঙালিদেরই

দখলে। ওরা কার্ডবোর্ডের দেবীপ্রতিমায় গাঁদাফুলের পাপড়ি দিয়ে অঞ্জলি দেয় আর স্বাদহীন নিরামিষ খাবার খায়। ক্রিসমাসের সঙ্গে এ-সবের কোনও তুলনাই হয় না ! ক্রিসমাসে ওরা কী সুন্দর ফায়ারপ্লেসের ম্যান্টেলে স্টকিং ঝুলিয়ে রাখে, ফাদার ক্রিসমাসের জন্য কুকি আর দুধ বাইরে রাখে, অনেক অনেক উপহার পায় আর স্কুলে যায় না।

আরও অন্য বিষয়ে অশোক আর অসীমাকে হার মানতে হয়েছে। অসীমা সব সময় শাড়ি পরে, সঙ্গে বাটার চটি। অশোক আগে শুধুই দরজির বানানো প্যান্ট-শার্ট পরত, এখন পাকেচক্রে রেডিমেড জামাকাপড় পরতে বাধ্য হচ্ছে। তাকে আরও কিছু বদলাতে হয়েছে। ফাউন্টেন পেনের জায়গায় বলপয়েন্ট পেন, শেভিং ব্রাশ আর ব্লেডের জায়গায় বিক কোম্পানির রেজ়র ব্যবহার করতে হচ্ছে তাকে। সে এখন পাকাপাকিভাবে প্রোফেসর, কিন্তু স্যুট-টাই পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় না। যেখানে যায়, সেখানেই ঘড়ি দেখতে পায়। বিছানার পাশে, চা করার স্টোভের উপরে, পড়াতে যাওয়ার পথে গাড়িতে, ডেস্কের উলটো দিকের দেওয়ালে। তাই সে হাতঘড়ি পরা ছেড়েই দিয়েছে। সাধের ফাভর লিউবা ঘড়িটা মোজা রাখার দেরাজের কোন কোণে পড়ে আছে, তার খেয়ালও নেই। সুপার মার্কেটে গেলে তারা গোগোলকে নিজের পছন্দের জিনিস তুলে নিতে দেয়। এমন সব খাবার গোগোল নেয়, যা সে ও সোনিয়া খায়, অসীমা-অশোক খায় না। যেমন আলাদা করে প্যাক করা ছোট ছোট চিজ়ের টুকরো, মেয়োনেজ়, টুনা মাছ, হট ডগ। গোগোলের দুপুরের খাবারের জন্য তারা ডেলি থেকে ঠান্ডা মাংস কেনে। সকালে অসীমা বোলোনা বা রোস্ট বিফের স্যান্ডউইচ বানায়। গোগোল জেদ ধরলে সপ্তাহে একদিন আমেরিকান ডিনার রান্না করে দেয় অসীমা, পেষা ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি শেক-এন-বেক চিকেন বা হ্যামবার্গার হেল্পার। সেটা গোগোলের ভাল ছেলে হয়ে থাকার পুরস্কার।

তা সত্ত্বেও, যা পারা যায়, তারা করে। কেমব্রিজে অরসন ওয়েল্‌সে অপু ট্রিলজি দেখানো হলে তারা ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে অবশ্যই সেখানে যায়। মেমোরিয়াল হলে কথাকলি বা সেতারের অনুষ্ঠান হলেও, ঠিক হাজির হয়। গোগোল থার্ড গ্রেডে উঠলে তারা ওকে প্রতি শনিবার বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির ক্লাসে পাঠাতে শুরু করল। তাদের এক বন্ধুর বাড়িতেই সেটা হয়। আসলে, অশোক আর অসীমার একটা অস্বস্তি থেকে যায়। চোখ বুঝলে তাদের মনে হয়, দুই সন্তান একেবারে আমেরিকান বাচ্চাদেরই মতো। তারা এমন একটা ভাষায়,

এমন অ্যাকসেন্টে কথা বলে যা তাদের এতদিন পরেও অপরিচিত বলে মনে হয়। এমন ভাষা, যা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় তাদের। বাংলা ক্লাসে গোগোল তার পূর্বপুরুষের ভাষার অক্ষর লিখতে শেখে। এই বর্ণমালার শুরু শ্বাসাঘাতবর্জিত 'কে' দিয়ে, যা তার গলার পিছন থেকে শুরু হয় আর বিনা বাধায় গড়িয়ে গড়িয়ে মুখের সামনের দিকে এসে পড়ে। স্বরবর্ণগুলোও বড় ভাসাভাসা, ঠোঁটের চারদিকেই তাদের বেশি চলাফেরা। যে-অক্ষরগুলো সে লিখতে শেখে, তা মাত্রায় ঝোলে। সবশেষে সে এই অদ্ভুত বর্ণমালার সাহায্যে তার নাম লিখতে শেখে। তারা বাংলাদেশের নবজাগরণ বিষয়ে ইংরেজিতে লেখা হ্যান্ডআউট পড়ে। সুভাষচন্দ্র বোসের বৈপ্লবিক কাজকর্ম সম্পর্কেও পড়ে তারা। ক্লাসের ছেলে-মেয়েদের অবশ্য এতে কোনও আগ্রহ নেই। তারা বিরক্ত হয়ে বাংলা পড়ে, মনে মনে ভাবে, ব্যালে ক্লাসে বা সফটবল প্র্যাকটিসে গেলে কী ভালই না হত! গোগোলের এই ক্লাসটা একেবারেই ভাল লাগে না কারণ এতে আসতে গেলে তাকে এক শনিবার অন্তর ছবি আঁকার ক্লাসটা বাদ দিতে হয়। সেই ক্লাসেও সে নতুন ভরতি হয়েছে। সেটা পাবলিক লাইব্রেরির উপরতলায় হয়। দিন ভাল থাকলে তাদের ঐতিহাসিক বাড়িগুলোর দিকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে থাকে স্কেচপ্যাড আর পেনসিল। বলা হয় কোনও-না-কোনও অট্টালিকার সামনেটা আঁকতে। বাংলা ক্লাসে তারা হাতে সেলাই করা বর্ণপরিচয় বা অন্য প্রাথমিক বই পড়ে। তাদের টিচার সেগুলো কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছেন। বইগুলো আসলে পাঁচ বছরের বাচ্চাদের জন্য। গোগোল লক্ষ করে, বইগুলো কেমন যেন সস্তা কাগজে ছাপা! এ-রকম কাগজ তো ওরা স্কুলে টয়লেট পেপার হিসেবে ব্যবহার করে।

শিশু গোগোল তার নামটা নিয়ে বিশেষ কিছুই ভাবে না। বরং রাস্তার সাইনবোর্ডে নিজের নামের সঙ্গে মিলওয়ালা শব্দ খুঁজে পেয়ে সে মজা পায়: গো লেফট, গো রাইট, গো স্লো। জন্মদিনে মা একটা কেক অর্ডার দেয়। তাতে সাদার উপর নীল চিনিমাখা অক্ষরে তার নামটা লেখা থাকে। এতে সে অস্বাভাবিক কিছু দেখে না। তার নামলেখা চাবির রিং, ধাতুর পিন বা ফ্রিজের ম্যাগনেট যে কিনতে পাওয়া যায় না, এতেও তার কোনও হেলদোল নেই। গোগোল জানে, গত শতকের এক বিখ্যাত রাশিয়ান লেখকের নামে তার নাম রাখা হয়েছে। সেই লেখকের নাম, সঙ্গে তার নামটাও, সারা দুনিয়ায় বিখ্যাত। এ নাম অবিস্মরণীয়। একদিন বাবা তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে নিয়ে

গিয়ে দেখিয়েছে, অনেক উপরের একটা তাকে স্পাইনে গোগোলের নাম লেখা বইয়ের সারি। তার মধ্যে একটা বই নামিয়ে বাবা খুলল। গোগোল দেখল, বইটার ছাপা তার হার্ডি বয়েজ় বইয়ের ছাপার থেকে অনেকটাই ছোট। সম্প্রতি হার্ডি বয়েজ় সিরিজ়টা গোগোল পড়তে শুরু করেছে, আর তার পছন্দও হয়েছে। বাবা বলল, "কয়েক বছর পর তুমি নিজেই এই বইগুলো পড়তে পারবে।"

কোনও বদলি টিচার গোগোলদের ক্লাসে পড়াতে এলে রেজিস্টারে গোগোলের নামে পৌঁছে তিনি অবধারিতভাবে থেমে যান। লজ্জিত দৃষ্টিতে মুখ তুলে তাকান। গোগোল আর অপেক্ষা না করে বলে, "ওটা আমার নাম।" তবে নিয়মিত টিচাররা নামটার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা আলাদা কোনও প্রতিক্রিয়া দেখান না। বছর দুয়েক কেটে যাওয়ার পর ছাত্ররাও আর গোগোলকে 'গিগল' বা 'গার্গল' বলে খেপায় না। স্কুলের বড়দিনের নাটকে অভিনেতাদের নামের তালিকায় গোগোলের নাম দেখে বাবা-মায়েরাও অভ্যস্ত। রিপোর্ট কার্ডে প্রতি বছর লেখা থাকে, "গোগোল ইজ় অ্যান আউটস্ট্যান্ডিং স্টুডেন্ট, কিউরিয়াস অ্যান্ড কোঅপারেটিভ!" সোনালি অটামের দিনগুলোয় স্কুলের খেলা চলায় সময় গোগোলকে উৎসাহ দিতে সহপাঠীরা চেঁচায়, "গো গোগোল!"

আর তার পদবি? দশ বছর বয়সের মধ্যে গোগোল তিনবার কলকাতায় গেছে। দু'বার গ্রীষ্মকালে আর একবার দুর্গাপুজোর সময়ে। শেষবার গিয়ে সে দেখেছে, তার ঠাকুরদার বাড়ির হোয়াইটওয়াশ করা সামনের দেওয়ালে তার পদবিটা লেখা। কলকাতার টেলিফোন ডায়রেক্টরিতে ছ'পাতা ভরা গাঙ্গুলিদের নাম দেখে সে বিস্মিত। প্রতিটা পাতায় আবার তিনটে করে কলম। ইচ্ছে ছিল পাতাক'টা ছিঁড়ে সঙ্গে নিয়ে আসে, কিন্তু এক ভাইয়ের সে কথা শুনে কী হাসি! ট্যাক্সিতে করে কলকাতার অন্য আত্মীয়দের বাড়ি যাওয়ার সময় বাবা তাকে আরও অনেক জায়গায় পদবিটা দেখিয়েছে। মিষ্টির দোকানে, চশমার দোকানে, মুদির দোকানের শামিয়ানায় বা বোর্ডে। বলেছে, আসলে ওদের পদবিটা গঙ্গোপাধ্যায়, ছোট করে 'গাঙ্গুলি' বলা আসলে ব্রিটিশদের ঐতিহ্য বয়ে চলা।

পেম্বারটন রোডে গোগোল বাবাকে সাহায্য করেছে ওদের চিঠির বাক্সের এক কোণে 'গাঙ্গুলি' শব্দটা লাগাতে। সোনালি অক্ষরগুলো একটা হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে কিনে এনেছে ওরা। হ্যালউইনের পরের দিন সকালে বাসস্টপে যাওয়ার পথে গোগোল আবিষ্কার করল, পদবিটা থেকে শেষ অক্ষরটা খুলে নিয়েছে কেউ। আর পেনসিলে লিখে দিয়েছে 'গ্রিন', মানে

পড়তে হবে ‘গ্যাংগ্রিন’। এতে ভীষণ অপমানিত বোধ করেছিল গোগোল, কান লাল করে সে বাড়ির ভিতরে দৌড় লাগিয়েছিল। সে ভেবেছিল, বাবাও এতে অপমান বোধ করবে। মনে হয়েছিল, এই অপবাদটা তার বাবা আর মায়ের প্রতিই, তার ও সোনিয়ার প্রতি অতটা নয়। এখন সে বোঝে, দোকানের ক্যাশিয়াররা তার বাবা ও মায়ের কথা বলার অ্যাকসেন্ট শুনে মৃদু হাসে। সেলসম্যানরা গোগোলের সঙ্গে কথা বলতেই বেশি আগ্রহী হয়, যেন বাবা বা মা অশিক্ষিত বা কানে খাটো। কিন্তু বাবা এ-সবে কিছু মনে করে না, যেমন চিঠির বাক্সের ঘটনাটাকেও বাবা স্বাভাবিকভাবেই নিল। “বাচ্চা ছেলেরা মজা করেছে,” বাবা ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বলল। সেইদিন বিকেলে আবার হার্ডওয়্যারের দোকানে গিয়ে খোয়া যাওয়া ‘আই’ কিনে নেওয়া হল।

তারপর একদিন তার নামের অদ্ভুত ব্যাপারটা আর এড়িয়ে যাওয়া গেল না। গোগোলের বয়স তখন এগারো, পড়ে সিক্সথ গ্রেডে। স্কুল থেকে তাকে একটা ফিল্ড ট্রিপে নিয়ে যাওয়া হল। ঠিক হল, এই বেড়ানোতে ইতিহাসশিক্ষার উপর জোর দেওয়া হবে। স্কুলবাসে করে সকলে রওনা হল। দুটো ক্লাসের ছেলে-মেয়েরা, দু’জন টিচার, এই বেড়ানোটার জন্য নেওয়া হয়েছে দু’জন বিশেষ সঙ্গীকে। বাসটা শহর থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে ধরে চলল। নভেম্বর মাস। বেশ ঠান্ডা, কিন্তু আকাশ রোদে ঝকঝকে। গাছ থেকে ঝরে পড়া উজ্জ্বল হলদে পাতা মাটিতে কার্পেটের মতো বিছিয়ে রয়েছে। ছেলে-মেয়েরা চেঁচামেচি করছে, গান করছে, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে জড়ানো সোডার ক্যান থেকে সোডা খাচ্ছে। প্রথমে তারা রোড আইল্যান্ডে একটা বস্ত্র কারখানায় গেল। তারপর একটা বিরাট খালি জমির উপর একটা ছোট্ট, রংচটা বাড়িতে। বাড়ির জানালাগুলোও ছোট্ট। ভিতরে গিয়ে ওরা আবছা আলোয় দেখল, একটা লেখার টেবিলের উপর একটা দোয়াত, ঝুলপড়া চিমনি, একটা স্নানের টব আর একটা সরু বিছানা। বলা হল, এখানে কোনও এক বিখ্যাত কবি থাকতেন। সব আসবাবই ঘরের মাঝে দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে, সাইনবোর্ডে লেখা আছে ‘হাত দেওয়া মানা’। বাড়িটার ছাদটা এতই নিচু যে, টিচারদের মাথা নামিয়ে হাঁটতে হয়। রান্নাঘরে একটা লোহার স্টোভ আর একটা পাথরের সিংক। একটা সরু ময়লা পথ ধরে আউটহাউসে যেতে হয়। সেখানে একটা কাঠের চেয়ারের নীচে আটকানো একটা টিনের প্যান দেখে ছেলেমেয়েরা ঘেন্নায় আঁতকে উঠল। গিফট শপে গিয়ে গোগোল বাড়িটার ছবি দেওয়া একটা পোস্টকার্ড কিনল, আর পালকের কলমের মতো দেখতে একটা বলপয়েন্ট পেন।

ওরা শেষবারের মতো থামল একটা সমাধিক্ষেত্রে। জায়গাটা কবির বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয় এবং কবিও সেখানেই সমাধিস্থ। কয়েক মিনিট ধরে তারা স্মারক পাথরগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াল। কয়েকটা পাথর যেন বাতাসের চাপে হেলে আছে। পাথরগুলো মোটা, পাতলা, চৌকো, অর্ধচন্দ্রাকার, কালো, ধূসর। বেশিরভাগই ম্লান, কয়েকটা মোটে চকচকে। তার উপর শ্যাওলা জন্মেছে। অনেক হেডস্টোনের উপরকার লেখা পড়া যাচ্ছে না। ওরা সেই কবির নাম লেখা পাথরটা অবশ্য খুঁজে বের করতে পারল। "লাইন করে দাঁড়াও," টিচাররা বললেন, "একটা প্রজেক্ট করতে হবে।" প্রত্যেককে কয়েকটা করে নিউজপ্রিন্ট দেওয়া হল, সঙ্গে মোটা ক্রেয়ন। ক্রেয়নের লেবেলগুলো তুলে ফেলা হয়েছে। গোগোলের হঠাৎ শীত করতে লাগল। সে আগে কখনও সমাধিক্ষেত্রে ঢোকেনি, শুধু বাইরে থেকে দেখেছে। গাড়িতে যেতে যেতে দেখেছে, তাদের শহরের বাইরেই একটা বিরাট সমাধিক্ষেত্র আছে। একবার যানজটে ফেঁসে গিয়ে তারা দূর থেকে গোর দেওয়ার দৃশ্য দেখেছিল। তারপর থেকে যখনই তারা সেখান দিয়ে যায়, মা বলে চোখ ফিরিয়ে নিতে।

গোগোল অবাক হয়ে শুনল, ওদের টুম্বস্টোনগুলো আঁকতে হবে না। সেগুলো পরিষ্কার করতে হবে। একজন টিচার হাঁটু গেড়ে বসে তাদের দেখিয়ে দিলেন কীভাবে পরিষ্কার করতে হবে। বাচ্চারা সেভাবে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। মৃতদের সারির মধ্যে বাচ্চারা ঘুরে বেড়ায়, চামড়ার মতো খসখসে ঝরা পাতার উপর দিয়ে। তারা পাথরে লেখা নামের মধ্যে নিজের নিজের পদবি খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। যারা খুঁজে পায়, তারা আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে, "স্মিথ!", "কলিন্‌স!", "উড!" গোগোলের যা বয়স, তাতে সে বোঝে এখানে কোনও গাঙ্গুলি খুঁজে পাওয়ার আশা নেই। সে জানে, মৃত্যুর পর তাকে দাহ করা হবে, মাটিতে সমাধি দেওয়া হবে না। সে জানে, এ-দেশের কোনও একটুকরো মাটি সে মরার পর দখল করবে না, এ-দেশের কোথাও তার নাম লেখা কোনও পাথর মাথা উঁচিয়ে থাকবে না। কলকাতায় দাদুর বাড়ির ছাদ থেকে বা ট্যাক্সিতে যাওয়ার সময় সে দেখেছে অচেনা লোকদের মৃতদেহ কেমন করে খাটে তুলে কাঁধে করে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

সে একটা পাতলা কালচে পাথরের দিকে এগিয়ে গেল। পাথরটার আকারটাও বেশ পছন্দসই। উপরদিকটা গোলমতন, তারপর একটা ক্রসচিহ্নে পরিণত হয়েছে। ঘাসের উপর হাঁটু মুড়ে বসে সে পাথরটার উপর নিউজপ্রিন্টটা চেপে ধরল, তারপর আলতো করে ক্রেয়নটা দিয়ে কাগজটা

ঘষতে শুরু করল। ততক্ষণে সূর্য অস্ত যেতে চলেছে। গোগোলের আঙুলগুলো ক্রমশ ঠান্ডায় অসাড়। টিচার আর সঙ্গীরা হেডস্টোনে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছেন, তাঁদের মেনথল সিগারেটের গন্ধ ভেসে আসছে। গোগোল ঘষেই চলেছে। প্রথমে দানাদানা, অবয়বহীন ঘন নীল রং ফুটে বেরোল। তারপর হঠাৎ ক্রেয়নটা কিছুতে আটকে গেল, ফুটে উঠল কয়েকটা অক্ষর। পাথরটায় লেখা আছে *আবিজা ক্র্যাভেন, ১৭০১-৪৫*। গোগোল আবিজা নামের কোনও লোককে কখনও দেখেনি, চেনে না। তবে সেই মুহূর্তে তার মনে হল, গোগোল নামে আর কাউকেও তো সে চেনে না। 'আবিজা' নামটার সঠিক উচ্চারণ কীরকম হবে? এটা পুরুষের নাম, না মেয়েদের? সে অন্য একটা পাথরের কাছে গিয়ে কাগজ চেপে ধরল। এই পাথরটা লম্বায় এক ফুটও হবে না। তাতে লেখা আছে, *'অ্যাঙ্গুইশ ম্যাথার, এ চাইল্ড'*। গোগোল শিউরে উঠল। এখানে মাটির তলায় তার মতো কোনও ছোট ছেলের হাড় আছে? ক্লাসের অন্য বাচ্চারা প্রজেক্টে বিশেষ আগ্রহ দেখাল না। তারা ছুটোছুটি করে খেলছে, চুইংগাম চিবোচ্ছে, একে অন্যের পিছনে লাগছে। শুধু গোগোলই একা একা কাজ করে চলল। একটা সমাধি থেকে অন্য সমাধিতে কাগজ হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, এক এক করে পাথরে লেখা নামগুলো তার হাতের ছোঁয়ায় প্রাণ পাচ্ছে। *পেরিগ্রিন ওয়াটান, মৃত ১৬৯৯, এজেকিয়েল ও ইউরাইয়া লকউড, দুই ভাই, আর.আই. পি.*। গোগোলের এই পুরনো নামগুলো বেশ ভাল লাগে। কেমন অজানা সব নাম, প্রাচীনত্বে অভিজাত, উজ্জ্বল। একজন পাহারাদার সঙ্গী পিছন থেকে গোগোলের কাজ দেখে বলল, "এইসব নাম আজকাল আর শোনা যায় না, অনেকটা তোমার নামের মতো।" এতদিন গোগোলের মনে আসেনি যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নামেরও মৃত্যু হয়। ঠিক মানুষের মতো। স্কুলে ফেরার পথে বাসে গোগোলের বন্ধুরা তাদের ঘষার কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেলল, দলা পাকিয়ে একে অন্যকে ছুঁড়ে মারল, সবুজ সিটের তলায় হারিয়ে গেল সেগুলো। কিন্তু গোগোল সারা রাস্তাটা চুপ করে রইল। তার কোলে কাগজগুলো গুটিয়ে রাখা।

বাড়িতে মা একেবারে রেগে আগুন। এ আবার কী ধরনের ফিল্ড ট্রিপ? এখানকার লোকেরা মৃতদেহে লিপস্টিক লাগিয়ে দেয়, সিল্ক লাগানো বাক্সে করে গোর দেয়, এ পর্যন্ত ঠিক আছে। শুধু আমেরিকাতেই (এই কথাটা মা আজকাল খুব ব্যবহার করে) আর্টের নামে বাচ্চাদের গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এর পর কী করাবে? মর্গে নিয়ে যাবে? কলকাতায় শ্মশানে কেউ শখ

করে যায় না, মা বলল, সেটা এড়িয়ে চলাই দস্তুর। মায়ের চোখে দাদু-দিদিমার দেহ দাহ করার কাল্পনিক দৃশ্য ভেসে উঠে মাকে আরও বিষণ্ণ করে দেয়। "মৃত্যু মজার ব্যাপার নয়। আর ছবি আঁকার বিষয়ও নয়," দু'পরদা চড়ে গেল কাঁপতে কাঁপতে মা-র গলা। গোগোলের আঁকা অন্য ছবিগুলোর সঙ্গে রান্নাঘরে এই ঘষা কাগজগুলো টাঙাল না মা। চারকোল স্কেচ, কোলাজ, এনসাইক্লোপিডিয়া দেখে আঁকা গ্রিক মন্দিরের ছবি, প্যাস্টেলে পাবলিক লাইব্রেরির সামনের দৃশ্য (প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাওয়া) আর অন্য অনেক ছবির পাশে সেই কাগজগুলোর স্থান হল না। গোগোলের করুণ মুখ দেখে মনে যে স্নেহ উদয় হয়েছিল, যুক্তি দিয়ে তা নস্যাৎ করে দিল অসীমা। চোখের সামনে মরা মানুষের নাম ঝুলতে থাকলে রান্না করা যায় নাকি?

কিন্তু গোগোল ওগুলো রাখতে চায়। কেন, তা সে জানে না। তবে তার মনে হয়, এই পিউরিটান আত্মারা, আমেরিকায় প্রথমবার বসতি গড়ার এই পথিকৃৎরা, এই অদ্ভুত নামের মালিকরা যেন তার সঙ্গে অনেক কথা বলেছেন। মা রাগ করবে জেনেও সে কাগজগুলো ফেলে দিতে পারে না। সে কাগজগুলো পাকিয়ে তার ঘরের চেস্ট অব ড্রয়ারের পিছনে রেখে দিল। মা কোনওদিন দেখতে পাবে না। কাগজে তোলা নামগুলো সকলের নজর ফাঁকি দিয়ে ওখানেই থেকে যাবে, বছরের পর বছর ধুলো জমবে সেগুলোর উপর।

চার

১৯৮২

গোগোলের চোদ্দো নম্বর জন্মদিন। এরকম কোনও অজুহাত পেলেই গোগোলের বাবা-মা বাঙালি বন্ধুদের জন্য পার্টি দেয়। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি। আগের দিন ওর স্কুলের বন্ধুদের নেমন্তন্ন করা হয়েছিল বটে, কিন্তু সে নেহাতই মামুলি ব্যাপার। বাবা ফেরার পথে পিৎজ়া কিনে এনেছিল, তাই খাওয়া হল। একসঙ্গে টিভিতে একটা বেসবল ম্যাচ দেখেছিল ওরা, একটু পিংপং খেলেছিল। এই প্রথমবার গোগোল কয়েকটা ব্যাপারে 'না' করে দিয়েছিল। বলে দিয়েছিল, ওর ফ্রস্টেড কেক চাই না, আইসক্রিম বা হটডগ চাই না। দেওয়ালে কাগজের শিকলি বা বেলুন লাগাতে বারণ করেছিল। বাঙালিদের নিয়ে পার্টিটা হল আসল জন্মদিনের সবচেয়ে কাছের শনিবারটায়। প্রতিবারের মতো মা এবারও বেশ কয়েকদিন আগে থেকে রান্না করতে শুরু করে দিয়েছে, ফয়েলে প্যাক করা খাবারে ফ্রিজ ভরতি। অবশ্য গোগোলের সব প্রিয় খাবারই রান্না করেছে মা। অনেক আলু দিয়ে ভেড়ার মাংসের ঝোল, লুচি, কিসমিস দিয়ে ঘন ছোলার ডাল, আনারসের চাটনি, রিসোটা চিজ় থেকে বানানো জাফরান দেওয়া সন্দেশ। অসীমার মনে হয়, এতগুলো ভারতীয় রান্না করা বরং সোজা। তার চেয়ে কঠিন হল কয়েকটা আমেরিকান ছেলেকে খাওয়ানো। তাদের মধ্যে অর্ধেকেই আবার দুধ খেতে চায় না, বলে, তাদের অ্যালার্জি আছে। তারা কেউই পাউরুটির পাশের মোটা অংশটা খায় না।

বাঙালিদের অনুষ্ঠানটায় তিনটে আলাদা স্টেট থেকে চল্লিশজনেরও বেশি অতিথি এল। পুরুষরা সকলেই হালকা রংয়ের প্যান্ট ও পোলো শার্ট পরে। মহিলারা অবশ্য দারুণ ঝকমকে সব শাড়ি পরেছেন। একদল পুরুষ মেঝেতে বসে পোকার খেলা শুরু করে দিল। এদের সকলকেই গোগোল মাসি বা মেসো বলে ডাকে। সকলের সঙ্গেই বাচ্চা। সঙ্গে নিয়েই আসতে হয় কারণ,

গোগোলের বাবা-মায়ের বন্ধুরা বেবি-সিটার রাখায় বিশ্বাস করেন না। অন্যবারের মতো এবারও গোগোলই বাচ্চাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড়। সে আট বছরের সোনিয়া আর তার সমবয়সি ফাঁক-ফাঁক দাঁতওয়ালা বন্ধুদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার পক্ষে বড় হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাবা ও অন্য স্বামীদের সঙ্গে লিভিং রুমে বসে রিগ্যানের রাজনীতি আলোচনা করা বা মায়েদের সঙ্গে ডাইনিং রুমে বসে পরচর্চা করার পক্ষে সে এখনও ছোট। গোগোলের সবচেয়ে কাছের বয়সি হল একটি মেয়ে। তার নাম মৌসুমি। মৌসুমির বাবা-মা কিছুদিন আগে ইংল্যান্ড থেকে এসে ম্যাসাচুসেট্সে বাস করছেন। মাসকয়েক আগে মৌসুমির জন্মদিনও এভাবেই পালন করা হয়েছে। কিন্তু গোগোল আর মৌসুমি মোটেই একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছে না। মৌসুমি বাবু হয়ে মাটিতে বসে আছে। তার চোখে একটা মেরুন প্লাস্টিক ফ্রেমের চশমা, চিবুক পর্যন্ত লম্বা, ঘন চুল একটা ফুলো ফুলো ববি প্রিন্টের হেডব্যান্ড দিয়ে বাঁধা। কোলে রাখা সবুজ রংয়ের ব্যাগ থেকে সে মাঝেমধ্যেই একটা গন্ধওয়ালা লিপ-বাম বের করে ঠোঁটে লাগিয়ে নিচ্ছে। হাতে ‘প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস’ উপন্যাসের বহুপঠিত একটা পেপারব্যাক কপি। মৌসুমি সেটা পড়ছে। গোগোল আর অন্য বাচ্চারা সকলে অশোকদের বিছানার চারদিকে বসে বা শুয়ে টিভিতে *দ্য লাভ বোট* আর *ফ্যান্টাসি আইল্যান্ড* দেখছে। হঠাৎ একজন মৌসুমিকে বলল, তার ব্রিটিশ উচ্চারণে কিছু একটা বলতে। সোনিয়া জিজ্ঞেস করল, মৌসুমি কোনওদিন প্রিন্সেস ডায়ানাকে রাস্তায় দেখেছে কি না। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত মৌসুমি ঘোষণা করল, “আমি আমেরিকান টেলিভিশন ঘেন্না করি।” বই নিয়ে সে বাইরে চলে গেল। এতে অন্য সকলে বেশ খুশি হল বলেই মনে হয়।

অতিথিরা চলে গেলে উপহার খোলার পালা। গোগোল অনেক ডিকশনারি আর বেশ কয়েকটা ক্যালকুলেটর পেয়েছে, পেন-পেনসিলের সেট আর কয়েকটা বিশ্রী দেখতে সোয়েটারও পেয়েছে। বাবা-মা দিয়েছে একটা ইন্সটাম্যাটিক ক্যামেরা, নতুন স্কেচবই, রঙিন পেনসিল, মেকানিকাল পেন (গোগোলই এটা চেয়েছিল) আর নিজের ইচ্ছেমতো খরচ করার জন্য কুড়ি ডলার। সোনিয়া নিজের বানানো সুন্দর কার্ড দিয়েছে, তাতে লেখা ‘হ্যাপি বার্থডে গগল্স’। সোনিয়া ‘দাদা’ না ডেকে গোগোলকে এই নাম ধরে ডাকতেই পছন্দ করে। যেগুলো গোগোলের পছন্দ হয়নি সে-উপহারগুলো মা সরিয়ে রাখল। এর পর ভারতে গেলে কাউকে না কাউকে দেওয়া যাবে।

সেই রাতে গোগোল ঘরে শুয়ে বাবা-মার বাতিল করা রেকর্ড প্লেয়ারে হোয়াইট অ্যালবামের তৃতীয় পিঠটা শুনছিল। এই অ্যালবামটা আমেরিকান বার্থডে পার্টির দিন এক বন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছে। গোগোলের জন্মের সময় বিট্‌লস ব্যান্ডটা প্রায় শেষ নিশ্বাস ফেলছিল বটে, তবু জন, পল, জর্জ আর রিংগোর গান শুনতে গোগোলের দারুণ লাগে। এই ক'বছরে সে প্রায় সবক'টা অ্যালবাম সংগ্রহ করতে পেরেছে। ঘরের দরজার পিছনদিকে একটা জিনিসই সাঁটানো রয়েছে। বস্টন গ্লোব থেকে কেটে নেওয়া জন লেননের অবিচুয়ারি। সে বিছানার উপর বাবু হয়ে বসে গানের কথাগুলোয় চোখ বোলাচ্ছিল। ঠিক তখনই দরজায় টোকা পড়ল।

গোগোল চেঁচিয়ে বলল, "কাম ইন!" সে ভেবেছিল ম্যাজিক এইট বলপেন বা রুবিক কিউব ধার করতে সোনিয়া এসেছে। কিন্তু গোগোল অবাক হয়ে দেখল, বাবা। পায়ে শুধু স্টকিং, ভেস্টের নীচ থেকে ছোট্ট ভুঁড়ি উঁকি মারছে, গোঁফে পাক ধরেছে। গোগোল আরও অবাক হয়ে দেখল, বাবার হাতে একটা উপহার। মা যা কিনে আনে তার বাইরে বাবা গোগোলকে কোনও জন্মদিনের উপহার কখনও দেয়নি, কিন্তু ঘরে ঢুকে ওর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বাবা বলল, এবারেরটা বিশেষ উপহার। লাল, সবুজ আর সোনালি নকশাকাটা কাগজে উপহারটা মোড়া। এই কাগজটা গতবার ক্রিসমাসের সময় বেঁচে গিয়েছিল। মোড়াটা ভাল হয়নি, কোনাগুলো কাঁচা হাতে মুড়ে সেলোটেপ দিয়ে আঁটা। বোঝাই যাচ্ছে এটা একটা বেশ মোটা বই, বাবা নিজে প্যাক করেছে।

গোগোল খুব সাবধানে কাগজটা খুলল বটে, কিন্তু এক জায়গায় একটু আঠার দাগ লাগা এড়াতে পারল না। বইটার জ্যাকেটের উপরে লেখা *দ্য শর্ট স্টোরিজ় অব নিকোলাই গোগোল*। ভিতরে দামের কাগজটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

গানের শব্দের উপরে গলা তুলে গোগোলের বাবা বলল, " এটা তোমার জন্য স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়ে আনিয়েছি। হার্ডকভারটা পাওয়া এখন খুব কঠিন। ইংল্যান্ডের ছোট এক প্রকাশন সংস্থার বই। এখানে আসতে চার মাস লেগেছে। আশা করি তোমার ভাল লাগবে।"

গোগোল ঝুঁকে পড়ে গানের শব্দটা একটু কমিয়ে দিল। *দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি* পেলে সে বেশি খুশি হত, বা নিদেনপক্ষে গত গ্রীষ্মে কলকাতায় যে বইটা সে হারিয়ে ফেলেছিল সেই *হবিট*। *হবিট* বইটা সে নিউ

আলিপুরে বাবাদের বাড়ির ছাদে ফেলে এসেছিল, পরে সেটা কাকে নিয়ে যায়। কিন্তু বাবা বারবার উৎসাহ দেওয়া সত্ত্বেও সে গোগোলের বা অন্য কোনও রাশিয়ান লেখকের লেখা একটি শব্দও পড়তে চায়নি। তাকে অবশ্য কখনওই বলা হয়নি, কেন তার নাম গোগোল রাখা হল। বাবার অ্যাকসিডেন্ট বা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার বিষয়েও সে কিছুই জানে না। সে ভাবে, ছোটবেলায় ফুটবল খেলার সময় চোট পাওয়ার দরুন তার বাবা একটু খুঁড়িয়ে চলে। লেখক গোগোল সম্পর্কে সে যা জানে তা অর্ধসত্য। সে শুনেছে, বাবা গোগোলের ভক্ত।

গোগোলের মনটা গানের দিকে পড়ে আছে। সে বলল, "থ্যাংক ইউ বাবা।" সম্প্রতি সে বাবা আর মায়ের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করেছে। বাবা-মা অবশ্য বাংলাতেই বলে, গোগোল ইংরেজিতে উত্তর দেয়। কখনও কখনও সে দৌড়োবার জুতো পরে বাড়িতে ঘোরাঘুরিও করে। কাঁটা-চামচ দিয়ে খায়।

বাবা তখনও ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। হাতদুটো পেছনে। দেখছে। তাই গোগোল বইটা খুলে পাতা উলটে গেল। সামনের দিকে একটা পাতায় পেনসিলে আঁকা লেখকের একটা ছবি। এই পাতাটা বইয়ের অন্য পাতাগুলোর থেকে ভাল। লেখক ভেলভেটের জ্যাকেট, সাদা ফোলানো শার্ট ও ক্রাভাত পরে আছেন। মুখটা শেয়ালের মতো ছুঁচোলো, ছোট ছোট কালো চোখ, সরু করে ছাঁটা গোঁফ আর একটা বড়, তীক্ষ্ণ নাক। কালো চুল তাঁর কপালে সেঁটে রয়েছে, মাথার দু'পাশেও। লম্বা, সরু ঠোঁটের কোনায় একটা সন্দেহজনক, উন্নাসিক হাসি ভাসছে। গোগোল আশ্বস্ত হল। এই লোকটার সঙ্গে তার নিজের কোনও মিল নেই। তার নাকটা লম্বা কিন্তু এত লম্বা নয়, চুল কালো তবে নিশ্চয়ই এতটা কালো নয়, তার রং ফ্যাকাশে তবে এই ছবির লোকটার মতো ফ্যাকাশে নয়, সে-বিষয়ে ও নিশ্চিত। গোগোলের চুলের স্টাইলও অনেক আলাদা। বিট্‌লদের মতো, ভুরুর উপরে নেমে আসা চুল। গোগোল গাঙ্গুলি হার্ভার্ডের সোয়েটশার্ট পরে আর ছাইরঙের লিভাইস মার্কা কর্ডুরয় ট্রাউজার। সে জীবনে একবারই টাই পরেছে, এক বন্ধুর পার্টিতে। না, কোনও মিলই নেই।

এতদিনে সে তার নাম সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন ঘেন্না করতে শুরু করেছে। বারবার ব্যাখ্যা করতে করতে সে ক্লান্ত। 'ইন্ডিয়ান' ভাষায় তার নামের যে কোনও মানে নেই, সেটা যে কতবার কতজনকে বলতে হয়েছে! মডেল

ইউনাইটেড নেশন্‌স ডে স্কুলে সোয়েটারের উপরে নাম লেখা ট্যাগ পরতে তার খুব খারাপ লাগে। এমনকী, আঁকার ক্লাসে ছবির নীচে নিজের নামটা সই করতেও তার আর ভাল লাগে না। গোগোলের ভাবতেও ঘেন্না করে যে তার নামটা হাস্যকর আর বৈশিষ্ট্যহীন, তার নিজস্ব সত্তার সঙ্গে নামটার কোনও সম্পর্ক নেই, নামটা ভারতীয় বা আমেরিকান নয়, রাশিয়ান। এই ভালনাম হয়ে ওঠা ডাকনামটা নিয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটাতে তার একটুও ভাল লাগে না। গতবছর জন্মদিনে বাবা-মা তাকে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনের গ্রাহক করে দিয়েছিলেন। ম্যাগাজিনটা বাড়িতে এলে খয়েরি খামটার উপরে নিজের নামটা দেখে মেজাজ খিঁচড়ে যায়। এক-এক সময় এই আকারহীন, ওজনহীন নামটা তাকে শারীরিক কষ্ট দিতে থাকে। ঠিক যেন একটা কুটকুটে ট্যাগ লাগানো শার্ট পরতে তাকে বাধ্য করা হচ্ছে। কখনও কখনও সে ভাবে, কী করে নামটাকে ছোট করে ফেলা যায়, যেমন তার স্কুলের অন্য ভারতীয় ছেলেটি করেছে। তার নাম জয়দেব, কিন্তু সে সবাইকে বলেছে ‘জয়’ বলে ডাকতে। কিন্তু গোগোল নামটা এমনিতেই বেশ ছোট, সেটাকে আর ছাঁটকাট করা সম্ভব নয়। ওর বয়সের অন্য ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে ডেটিং করতে আরম্ভ করেছে। তারা বান্ধবীদের নিয়ে পিৎজ়া খেতে বা সিনেমা দেখতে যায়। কিন্তু গোগোল ভাবতেই পারে না কোনও রোমান্টিক পরিস্থিতিতে সে নিজেকে গোগোল বলে পরিচয় দিচ্ছে, বলছে, “হাই, ইট্‌স গোগোল!” সে এটা কল্পনাও করতে পারে না।

গোগোল রাশিয়ান লেখকদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। তবে যেটুকু জানে তাতে তার মনে হয়, বাবা-মা তার জন্য সবচেয়ে বোকা-বোকা রাশিয়ান নামটাই বেছেছে। লিও বা আন্তন নাম হলে তার এতটা অসুবিধে হত না। আলেকজ়ান্ডার বা আলেক্স নামটা তো দিব্যি। কিন্তু গোগোল নামটা কেমন যেন হাস্যকর, গাম্ভীর্যহীন। কেন যে তার নামটা গোগোল রাখা হল, তা সে বুঝতে পারে না। সে কয়েকবার ভেবেছে বাবাকে বলবে, গোগোল বাবার প্রিয় লেখক, তার প্রিয় লেখক তো আর নন। আবার এও সত্যি, আজ ‘গোগোল’ হয়ে বেঁচে থাকার পিছনে তার নিজেরই হাত আছে। এটা এক হিসেবে তারই দোষ। স্কুলে তার নাম নিখিল হতেই পারত। কিন্ডারগার্টেনের সেই প্রথম দিনটার কথা তার ভাল করে মনেই পড়ে না। তবে সেই দিনটাতেই সব কিছু পালটানোর বীজ ছিল। আর সে বীজ গোগোল নিজেই হাতছাড়া করেছে। সেদিন ভালনামটায় রাজি হয়ে গেলে অর্ধেক সময় সে গোগোল হতে

পারত, অর্ধেক সময় নিখিল। তার সত্তার একটা উলটো পিঠ থাকতেই পারত। ঠিক যেমন কলকাতায় গেলে তার বাবা-মায়ের একটা অন্য সত্তা বেরিয়ে আসে। যারা জিজ্ঞেস করে কেন গোগোলের ভালনাম নেই, তাদের অশোকরা বলে, "আমরা চেষ্টা করেছিলাম ভালনাম দিতে। কিন্তু ও যে গোগোল ছাড়া আর কোনও নামে সাড়াই দিতে চাইল না। স্কুল থেকেও বলল, গোগোল নামটাই রাখতে। আসলে, এমন একটা দেশে আমরা থাকি যেখানে রাষ্ট্রপতির নাম জিমি। আমাদের আর কিছু করারই ছিল না।"

এখন, গোগোলের লেখা বইটা হাতে নিয়ে, গোগোল বাবাকে আবার বলল, "থ্যাংকস এগেন।" বইটা বন্ধ করে খাট থেকে নামল, ওটা বইয়ের তাকে রাখবে। কিন্তু বাবা খাটের উপর তার পাশে বসে পড়েছে। কাঁধে হাত রেখেছে। এক মুহূর্তের জন্য। গত কয়েক মাসে গোগোল লম্বা হতে হতে বাবার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। মুখের শিশুসুলভ ফোলাভাব কমে গেছে। গলার স্বর ভাঙতে ভাঙতে খসখসে। অশোক ভাবছিল, এখন নিশ্চয়ই গোগোল আর সে একই সাইজের জুতো পরে। বেডসাইড ল্যাম্পের আলোয় সে ছেলের উপরের ঠোঁটের উপর আবছা গোঁফের রেখাও লক্ষ করল। গলার সামনে অ্যাডাম্‌স অ্যাপ্‌লটা বেশ স্পষ্ট। গোগোলের হাতগুলো অসীমার মতো। লম্বা, পাতলা। এই বয়সের অশোকের সঙ্গে গোগোলের মিল কতটা? অশোক ভাবে। কিন্তু হাতের কাছে অশোকের কিশোর বয়সের কোনও ছবি নেই যে তুলনা করা যাবে। আমেরিকায় বাসা বাঁধার আগে অশোকের যে-জীবন ছিল, তার কোনও দৃশ্যমান স্মৃতিচিহ্ন এ-বাড়িতে নেই। এমনকী, এ-দেশেই নেই। পাসপোর্টটাই এখানে তার সবচেয়ে পুরনো দলিল। বিছানার পাশে টেবিলে একটা ডিওর ক্যান, ক্লিয়ারাসিলের টিউব। অশোক ছেলে আর নিজের মধ্যে পড়ে থাকা বইটা বিছানা থেকে তুলে নিল, মলাটের উপর সযত্ন হাত বোলাল। "আমি বইটা প্রথমে পড়ে ফেলেছি। অনেকদিন এই গল্পগুলো পড়িনি তো! কিছু মনে কোরো না।"

"নো প্রবলেম।"

"আমি গোগোলের সঙ্গে একটা বিশেষ আত্মীয়তা টের পাই। অন্য কোনও লেখক সম্পর্কে আমার এরকম হয় না। কেন জানো?" অশোক বলল।

"ওঁর লেখা গল্প তোমার ভাল লাগে।"

"তা ছাড়াও একটা কারণ আছে। উনি আমারই মতো প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের বেশিরভাগ দেশের বাইরে কাটিয়েছিলেন।"

“ও!” গোগোল বলল।

“আর একটা কারণও আছে।”

রেকর্ড শেষ হতে গান থেমে গিয়েছে। নিস্তব্ধতা। কিন্তু গোগোল রেকর্ডটা উলটো করে লাগিয়ে দিল, ‘রেভলিউশন ওয়ান’ চালিয়ে ভলিউম বাড়িয়ে দিল।

“হ্যাঁ, অন্য কারণটা বলো,” গোগোলের গলায় অধৈর্য ফুটে ওঠে।

অশোক ঘরটার চারদিকে তাকাল। বোর্ডে লাগানো লেননের অবিচুয়ারিটাও নজরে পড়ল। তারপর দেখল, বেশ কয়েক মাস আগে ছেলেকে কিনে দেওয়া ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের একটা ক্যাসেট ঘরে পড়ে রয়েছে, তখনও মোড়ক খোলা হয়নি। মেঝেতে অনেক জন্মদিনের কার্ড ছড়িয়ে পড়ে আছে। কেমব্রিজে চোদ্দো বছর আগের চিটচিটে গরম আগস্ট মাসটা মনে পড়ে যায় তার, যেদিন সে প্রথম ছেলেকে কোলে নিয়েছিল। সেই দিনটার পর থেকে, বাবা হওয়ার পর থেকে, দুর্ঘটনার স্মৃতি তার মনে ফিকে হয়ে এসেছে। সেই অভিশপ্ত রাত ভোলা অসম্ভব, কিন্তু সেই স্মৃতি আর আগের মতো পীড়া দেয় না। সেই রাত মনে পড়ে জীবনটা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল, তা নয়। বরং পেম্বারটন রোড থেকে অনেক দূরে কোনও একটা জায়গায় সেই অভিশপ্ত মুহূর্তটা থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। এই দিনটা তার ছেলের জন্মদিন। আজ কি মৃত্যুর কথা বলতে হয়? আজ বেঁচে থাকার দিন। অশোক ঠিক করল, আজ সে ছেলেকে জানাবে না গোগোলকে এত ভাল লাগার মূল কারণটা কী।

“না, আর কোনও কারণ নেই। গুডনাইট।”

অশোক উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে গিয়ে অশোক ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, “ডস্টয়েভস্কি একবার একটা দামি কথা বলেছিলেন। জানো সেটা কী?”

গোগোল মাথা নেড়ে বলল, না।

“বলেছিলেন, আমরা সকলেই গোগোলের ওভারকোট থেকে বেরিয়েছি।”

“তার মানে?”

“একদিন বুঝতে পারবে। মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে।”

গোগোল উঠে ঘরের দরজাটা বন্ধ করল। বাবার বিচ্ছিরি স্বভাব, সবসময় দরজাটা একটু খুলে রেখে যাবে। ব্যাপারটাকে পাকা করতে সে দরজার

লকটাও লাগিয়ে দিল। তারপর গোগোলের বইটা সবচেয়ে উপরের তাকে দুটো হার্ডি বয়েজ় বইয়ের মাঝে ঢুকিয়ে দিল। গানের কথাগুলো নিয়ে খাটের উপর বসতে-না-বসতেই একটা কথা মনে পড়ল। গোগোল নামটা তো নাম নয়, পদবি। লেখকের নাম তো নিকোলাই। গোগোল গাঙ্গুলির ডাকনামটাই শুধু যে ভালনাম হয়ে গেছে তা নয়, একটা পদবি তার নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তাই, দুনিয়ায় আর কারও এই 'নাম' নেই। আমেরিকাতে, ভারতে কি রাশিয়ায়, কোথাও নয়। এমনকী, তার নাম যার নামে রাখা হয়েছে, তাঁর সঙ্গেও এই নামটা শেয়ার করে না সে।

তার পরের বছর অশোক সাবাটিক্যালের ছুটি পেল। গোগোল আর সোনিয়াকে বলা হল, তারা সকলে আট মাসের জন্য কলকাতায় যাচ্ছে। এক সন্ধ্যায় খাওয়াদাওয়ার পর কথাটা শুনে গোগোল প্রথমে ভেবেছিল, এটা আসলে রসিকতা। কিন্তু তারপর জানা গেল, টিকিট কাটা হয়ে গেছে, সব ঠিকঠাক। অশোক আর অসীমা মুষড়ে পড়া দুই ছেলে-মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করে, "ভাবো একটা লম্বা ছুটিতে যাচ্ছ।" কিন্তু গোগোল জানে আট মাসের ছুটি খেলা-কথা নয়। আটমাস তার নিজের কোনও ঘর থাকবে না। রেকর্ডপ্লেয়ার আর রেকর্ড থাকবে না, বন্ধুরা থাকবে না। গোগোলের কাছে আটমাসের জন্য কলকাতা যাওয়া প্রায় ওখানেই পাকাপাকি থেকে যাওয়ার মতো। এমনটা যে হতে পারে, তা ওর কখনও মনেই হয়নি। তা ছাড়া, এটা তার সোফোমোর বছর। খুব জরুরি সময়। সে বলে, "স্কুলের কী হবে?" বাবা-মার মতে, এর আগে বেশ কিছুদিনের জন্য ছুটিতে বাইরে গেলে গোগোলের শিক্ষকরা কিছু মনে করেননি। এবার করবেন কেন? তাঁরা গোগোলকে অঙ্ক আর ভাষাসাহিত্যের বইখাতা দিয়ে দিয়েছেন, কারণ এই বিষয়গুলোতে গোগোল কাঁচা। মাসদুয়েক পার করে ফিরলে তাঁরা সবসময় গোগোলের উন্নতি দেখে খুশি হয়েছেন। কিন্তু এবার এতদিনের জন্য বাইরে যাওয়ার কথা শুনে গোগোলের গাইডেন্স কাউন্সেলর মোটেই খুশি হলেন না। ভারতে যাওয়া মানে গোগোল টেন্‌থ গ্রেডের প্রায় অর্ধেক সময়ই ক্লাস করতে পারবে না। অসীমা আর অশোককে ডেকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হল। গাইডেন্স কাউন্সেলর জিজ্ঞেস করলেন গোগোলকে ভারতের কোনও আমেরিকান স্কুলে ভরতি করে দেওয়া যায় কি না। কিন্তু সবচেয়ে কাছের আমেরিকান স্কুলটা দিল্লিতে, মানে কলকাতা থেকে প্রায় ৮০০ মাইল দূরে। গাইডেন্স কাউন্সেলর পরামর্শ দিলেন, গোগোলকে এখানে কোনও আত্মীয়ের

বাড়িতে রেখে যেতে। জুনে স্কুলের বছর শেষ হলে সে ভারতে চলে যাবে। অসীমা বলল, “আমাদের এ-দেশে কোনও আত্মীয় নেই। আমাদের ভারতে যাওয়ার মূল কারণই তো সেটা।”

আর তাই ভারতে যেতেই হল। টেন্‌থ গ্রেডে চার মাস ক্লাস করার পরই। ভাত-আলুসেদ্ধ-ডিমসেদ্ধ দিয়ে পেটভরে খেয়ে ওরা এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হল। প্লেনে অবশ্য পুরো ডিনার খেতে দেবে, কিন্তু গোগোলের মা ওদের জোর করে খাইয়ে দিলেন। জিয়োমেট্রি আর আমেরিকান ইতিহাসের বইগুলো অন্য সব জিনিসের সঙ্গে গোগোলের সুটকেসে পুরে দেওয়া হয়েছে। সুটকেসে তালা লাগিয়ে, বেল্ট ও দড়ি দিয়ে মজবুত করে বেঁধে, তার উপর বাবার আলিপুরের বাড়ির ঠিকানা লেখা লেবেল সেঁটে ওরা তৈরি। এই লেবেলগুলো গোগোলের অস্বস্তিকর লাগে। মনে হয়, ওরা যেন আসলে পেম্বারটন রোডে থাকে না। ক্রিসমাসের দিন রওনা হতে হল। যে-সময় বাড়িতে বসে উপহার খোলার কথা, সে-সময়ে ওরা মালপত্র ডাঁই করে নিয়ে লোগান এয়ারপোর্টের দিকে চলল। সোনিয়ার মন খারাপ। টাইফয়েড ভ্যাকসিন নেওয়ার ফলে ওর একটু জ্বরও এসেছে। আসলে সকালে লিভিং রুমে ঢুকে প্রতিবারের মতো সাজানো ক্রিসমাস ট্রি না দেখতে পেয়ে ও দমে গেছে। সাজানো ক্রিসমাস ট্রির জায়গায় লিভিং রুমে পড়ে আছে কেনা উপহারের ধ্বংসাবশেষ। দাম লেখা ট্যাগ, প্লাস্টিকের হ্যাঙার, শার্ট থেকে বের করে ফেলা কার্ডবোর্ড। বাড়ি থেকে ওরা শীতে কাঁপতে কাঁপতে বেরোল কেন-না ওরা কোট বা গ্লাভ্‌স পরেনি। যেখানে ওরা যাচ্ছে সেখানে ও-সব লাগবে না, আর ফিরতে ফিরতে সেই আগস্ট মাস। গরম পড়ে যাবে। বাড়িটা আপাতত বারবারা আর স্টিভ নামে দু'জন আমেরিকান ছাত্রছাত্রীকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। তাদের বিয়ে হয়নি কিন্তু একসঙ্গেই থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ই ওদের জুটিয়ে দিয়েছে। এয়ারপোর্টের চেক-ইন লাইনে গোগোল তার বাবার সঙ্গে দাঁড়াল। বাবা সুট-টাই পরে আছে। প্লেনে চড়তে হলে বাবা এখনও এই কেতাবি পোশাক পরাটাকেই দস্তুর মনে করে। কাউন্টারে পৌঁছে বাবা দুটো আমেরিকান আর দুটো ভারতীয় পাসপোর্ট বের করে এগিয়ে দিল। বলল, “চারজনের পরিবার। দুটো হিন্দু মিল, প্লিজ়।”

প্লেনে গোগোলের সিট পড়ল বাবা-মা আর সোনিয়ার থেকে অনেকটা তফাতে। পিছনের দিকে। বাবা-মা এতে একটু চিন্তিত হলেও গোগোল একা বসতে পারবে জেনে মনে মনে দারুণ খুশি। বিমানসেবিকা পানীয়ের গাড়ি

নিয়ে এলে সে কপাল ঠুকে একটা ব্লাডি মেরি চেয়েই বসল। সেই প্রথম অ্যালকোহলের ধাতব স্বাদ জিভে স্পর্শ করল গোগোল। তারা প্রথমে লন্ডনে নামবে, তারপর দুবাই হয়ে কলকাতা। আলপ্‌স পর্বতশ্রেণির উপর দিয়ে যাওয়ার সময় বাবা সিট ছেড়ে উঠে জানালা দিয়ে বরফমোড়া শৃঙ্গগুলোর ছবি তুলল। আগে কলকাতা যাওয়ার সময় গোগোল উত্তেজিত হয়ে উঠত। কত দেশ পেরিয়ে উড়ে যাচ্ছে ওরা! সিট-পকেটে রাখা ম্যাপটা বারবার খুলে দেখত সে, আর অভিযানের শিহরন বোধ করত। কিন্তু এবার তার হতাশ লাগছে। কলকাতা ছাড়া আর কি যাওয়ার জায়গা নেই? আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া ছাড়া কলকাতায় কিছুই করার নেই। প্ল্যানেটেরিয়াম, চিড়িয়াখানা আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সে ডজনখানেকবার গেছে। কিন্তু ডিজ়নিল্যান্ড বা গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখতে একবারও যায়নি। একবারই, কানেক্টিং ফ্লাইট লেট হওয়ার কারণে ওরা ডবল ডেকার বাসে লন্ডনের টুর করেছিল।

যাত্রার শেষদিকে যারা ওদের সঙ্গে রইল, তারা বেশিরভাগই ভারতীয়। অভারতীয় প্রায় নেই। বাংলায় কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। মা তো প্যাসেজের উলটোদিকে বসা পরিবারটার সঙ্গে ঠিকানা বিনিময় পর্যন্ত করে ফেলেছে। নামার আগে মা প্লেনের ওই পুঁচকে বাথরুমে গিয়ে পরনের শাড়িটা পালটে অন্য একটা শাড়িও পরে ফেলল। শেষবারের খাবারটাও দিয়ে গেছে। মশলাদার অমলেট আর গ্রিল্‌ড টোম্যাটো। গোগোল প্রতিটা চামচ সময় নিয়ে মুখে তুলল, আরাম করে খেল। সে জানে, আগামী আটমাস এমন স্বাদ সে আর পাবে না। জানালা দিয়ে তালগাছ, কলাগাছ দেখা যায়। আকাশটা ভিজে, একঘেয়ে। প্লেনের চাকা মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে ডিসইনফেক্টান্ট ছড়িয়ে দেওয়া হল, তারপর দমদম এয়ারপোর্টের ট্যরম্যাকে ঢুকল ওরা। বাইরে ভোরবেলাকার হাওয়া তখন টক, গা-গোলানো গন্ধে ভরপুর। দেখার বারান্দা থেকে পাগলের মতো হাত নাড়ছে গাদাখানেক আত্মীয়স্বজন। ছোট বাচ্চারা বাবাদের কাঁধে বসে আছে। সব মালপত্র অটুট অবস্থায় পৌঁছেছে জেনে অন্যবারের মতো এবারও ওরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কাস্টম্‌স কোনও আপত্তি করেনি। তারপর ঘষা কাচের দরজাটা খুলে গেল। ওরা এবার পুরোপুরি ভারতে। রাস্তায় নয়, প্লেনে নয়, এয়ারপোর্টে নয়। ভারতের মাটিতে। মুহূর্তের মধ্যে কেউ জড়িয়ে ধরল, কেউ চুমু খেল, গাল টিপল বা শুধুই হাসল। অনেক ভালবাসায় ডুবে গেল ওরা। গোগোল আর সোনিয়াকে

এখন অনেক নাম মনে রাখতে হবে... মাসি, পিসি, মামা, মামিমা, কাকু, জেঠু, বাবার দিকে না মার দিকে, রক্তের সম্পর্ক না বৈবাহিক সম্পর্ক। অসীমা এখন মনু। তার চোখে স্বস্তির জল। অশোক এখন মিঠু। সে ভাইদের মুখগুলো দু-হাতে তুলে ধরছে। গোগোল আর সোনিয়া এদের চেনে বটে, কিন্তু বাবা-মায়ের মতো এদের নিজের লোক মনে করে না। কয়েক মিনিটের মধ্যে অশোক আর অসীমা নিজেদের আমেরিকান খোল থেকে বেরিয়ে ভারতীয় খোলে ঢুকে পড়েছে। আরও সাহসী, আরও সরল, আরও তীক্ষ্ণ। আরও জোরে কথা বলছে তারা, আরও খোলাখুলি হাসছে। পেম্বারটন রোডে এরকম আত্মবিশ্বাসী বাবা-মাকে কখনও লাগে না। সোনিয়া দাদার হাত ধরে ফিসফিস করে আমেরিকান ইংরেজিতে বলল, "আমার ভয় করছে, গগল্‌স।" দাদার হাত সে ছাড়ল না।

তারা ট্যাক্সিতে করে ভি আই পি রোড দিয়ে চলল। রাস্তার একপাশে অনেকখানি জলাজমি ভরাট হচ্ছে। সে-সব পার হয়ে উত্তর কলকাতার খাস জায়গায় পৌঁছোল। গোগোল আগে সবই দেখেছে। তবু সে তাকিয়ে থাকে। কালো বেঁটে লোকরা রিকশা টানছে, পুরনো লড়ঝড়ে বাড়িগুলো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, জালি কাজ করা ব্যালকনি, দেওয়ালে কাস্তে-হাতুড়ি আঁকা। দেখে, ট্রাম আর বাসে মানুষ ঝুলছে, যেন যে-কোনও সময়ে রাস্তায় উপচে পড়বে। ফুটপাথবাসী পরিবারগুলো রাস্তাতেই ভাত রাঁধছে, চুলে সাবান দিচ্ছে। আমহার্স্ট স্ট্রিটে তার মায়ের বাড়িতে এখন মামার পরিবার থাকে। গোগোলদের ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে পাড়াপড়শিদের বাড়ি থেকে উঁকিঝুঁকি শুরু হয়ে গেল। দামি রঙিন জুতো পরা, আমেরিকান কায়দায় চুল কাটা, পিঠে ব্যাকপ্যাকসহ তাদের চেহারা সহজেই ভিড় থেকে আলাদা করা যায়। ভিতরে নিয়ে গিয়ে গোগোল আর সোনিয়াকে হরলিক্‌স ও রসগোল্লা দেওয়া হল। রসগোল্লা মোটেই ভাল না বাসলেও ভদ্রতার খাতিরে খেতেই হয়। কাগজে ওদের পায়ের ছাপ এঁকে নিয়ে এক চাকরকে বাটার দোকানে পাঠানো হল, বাড়িতে পরার হাওয়াই চপ্পল কিনতে। সুটকেস খুলে উপহার বের করল মা। প্যাকেট খুলে, সেগুলো পরে সকলে সাইজ় দেখে নিল। প্রশংসাও করল।

আস্তে আস্তে মশারি টাঙিয়ে শোওয়া অভ্যেস করে ফেলল গোগোলরা, আর টিনের মগ দিয়ে মাথায় জল ঢেলে স্নান করতে শিখল। সকালে ভাইবোনেরা সাদা-নীল ইউনিফর্ম পরে গলায় ওয়াটার বটল ঝুলিয়ে স্কুলে

যায়। গোগোল দেখে। উমামামিমা সারা সকাল রান্নাঘরে থাকেন। কাজের লোকজন ড্রেনের ধারে বসে ছাই দিয়ে বাসন মাজে, তিনি বকাবকি করেন। টুম্বস্টোনের মতো দেখতে বড় বড় পাথরে গাদাগাদা মশলা বাটা হয়। আলিপুরে বাবার পৈতৃক বাড়িতে তারা একটা বড় ঘর দেখল। ভারতে থাকলে এই ঘরেই তাদের থাকতে হত, বড় আবলুশ কাঠের খাটে চারজনকে একসঙ্গে ঘুমোতে হত, একটা আলমারিতে জামাকাপড় রাখতে হত।

আটমাস ধরে তারা বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বাস করে কাটাল। অথচ এই সময়টার জন্য কোনও ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়াই যেত। তা নয়, এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে ঘুরে সময় কাটল তাদের। বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, বজবজ, সল্টলেক সর্বত্র কিছু সময় কাটাতে হল। আর কোথাও যাওয়া মানেই তো ট্যাক্সিতে করে ভাঙা রাস্তা দিয়ে লাফাতে লাফাতে যাওয়া। প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন বিছানা, একটা নতুন পরিবার, নতুন নিয়ম। কোথাও লাল সিমেন্টের মেঝেতে বসে খাওয়া, কোথাও শ্বেতপাথরের টেবিলে বসে। এত ঠান্ডা যে কনুই রাখা যায় না তাতে। সকলেই তাদের আমেরিকান জীবন সম্পর্কে জানতে চায়। তারা ওখানে সকালে কী খায়, ওদের বন্ধুরা কেমন। তাদের পেম্বারটন রোডের বাড়িটার ছবি দেখে অবাক হয়, "বাথরুমেও কার্পেট! ভাবো একবার!" বাবা গবেষণায় ব্যস্ত থাকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দেয়। মা নিউ মার্কেটে বাজার করে, সিনেমা দেখে, পুরনো স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যায়। আটমাস মা রান্নাঘরে পাও ফেলেনি। এমন একটা শহরে মা টোটো করে ঘুরে বেড়ায় যেখানে গোগোলের দিশাজ্ঞান কোনও কাজই করে না। এতবার আসা সত্ত্বেও। তিনমাসের মধ্যে সোনিয়া সঙ্গে আনা সব বই বারো-তেরোবার পড়ে ফেলেছে। গোগোল এক-আধবার তার পড়ার বই খুলেছে বটে। সেগুলো গরমে কেমন যেন ফুলে গেছে। সে সঙ্গে দৌড়োবার জুতো এনেছে, ভেবেছিল দূরপাল্লার দৌড়ের অভ্যাস বজায় রাখবে। কিন্তু এই ঘিঞ্জি, গর্তওয়ালা, ভিড় রাস্তায় দৌড়োনো অসম্ভব। একদিন সে চেষ্টা করেছিল। উমামামিমা ছাত থেকে দেখতে পেয়ে পিছনে একজন চাকরকে পাঠিয়েছিলেন, পাছে গোগোল হারিয়ে যায়।

তার চেয়ে বন্দিদশা মেনে নেওয়া ঢের ভাল। আমহার্স্ট স্ট্রিটে গোগোল দাদুর আঁকার টেবিলে বসে থাকে, কয়েকটা পুরনো শুকিয়ে যাওয়া নিব নিয়ে নাড়াচাড়া করে। জানালা দিয়ে যা দেখা যায় তাই আঁকে। এবড়োখেবড়ো

দিগন্তরেখা, উঠোন, পাথর বসানো ফাঁকা জায়গাটা যেখানে কাজের মেয়েরা টিউবওয়েল থেকে পেতলের কলসিতে জল ভরে, রিকশার ময়লা ছাউনির নীচে যাত্রীরা, বৃষ্টির মধ্যে থলি হাতে দৌড়ে বাড়ি ফেরা মানুষ। একদিন ছাতে (দূরে হাওড়া ব্রিজ দেখা যাচ্ছিল) এক চাকরের সঙ্গে সে বিড়িও খেয়েছে। তাকে সারাদিন ধরে ঘিরে থাকে যেসব লোকজন, তাদের মধ্যে সোনিয়া ছাড়া তার সত্যিকারের বন্ধু আর কেউ নেই। শুধু সোনিয়াই তার মতো কথা বলে, তার মতো ভাবে, তাকে বোঝে। যখন সবাই ঘুমোয়, গোগোল আর সোনিয়া ওয়াকম্যান নিয়ে ঝগড়া করে। আমেরিকায় গোগোলের ঘরে রেকর্ড করে আনা কয়েকটা টেপ শোনা নিয়ে যত সমস্যা। কখনও ওরা পরস্পরের কাছে নিজেদের পরম ইচ্ছার কথা স্বীকার করে। হ্যামবার্গার, পেপারোনি পিৎজ়া বা কোল্ড মিল্ক খাওয়ার বুকনিংড়ানো ইচ্ছের কথা।

গ্রীষ্মকালে হঠাৎ তাদের অবাক হওয়ার পালা এল। বাবা জানাল, ওরা দিল্লি যাবে এক কাকুর বাড়ি। সেখান থেকে আগ্রায়, তাজমহল দেখতে। সেই প্রথম গোগোল আর সোনিয়া কলকাতার বাইরে যাবে, ভারতীয় ট্রেনে ওদের প্রথম ভ্রমণ। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরল ওরা। সেই আশ্চর্য, বিরাট, প্রতিধ্বনিময় স্টেশন। লাল পোশাক পরা কুলিরা খালি পায়ে ছুটছে। তারা গাঙ্গুলিদের স্যামসনাইট লাগেজগুলো মাথায় তুলে নিল। স্টেশন চত্বরেই অনেক পরিবার বাস করে, রাতে সার বেঁধে সেখানেই ঘুমোয়। গোগোল জানে ট্রেনে যাওয়ার অনেক বিপদ। তুতো ভাইবোনেরা তাকে বলেছে, বিহারে রেলডাকাত আছে। বাবা বিশেষভাবে তৈরি একটা জামা শার্টের নীচে পরে ফেলেছেন, তাতে লুকোনো পকেটে নগদ টাকা রাখা আছে। সোনিয়া আর মা সোনার গয়না খুলে রেখেছে। স্টেশনে তারা এক কম্পার্টমেন্ট থেকে অন্য কম্পার্টমেন্টে ঘুরে বাইরে টাঙানো তালিকায় তাদের চারজনের নাম খোঁজে। ট্রেনের বার্থগুলো নীল রঙের। উপরেরগুলো দিনের বেলায় তোলা থাকে, রাতে ঝুলিয়ে নিয়ে শুতে হয়। একজন কর্মী বিছানাও দিয়ে গেলেন। মোটা সাদা সুতির চাদর আর পাতলা কম্বল। সকালে তারা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরার জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখল। তবে বাইরেটা যতই রোদে উজ্জ্বল হোক না কেন, রঙিন কাচের জন্য ভিতর থেকে গুমোট আর মেঘলাই দেখায়।

ভারতে বেশ কয়েক মাস তারা চারজন এভাবে একসঙ্গে হয়নি। আগ্রায়

কয়েকদিন ওরা পুরোপুরি টুরিস্টদের মতোই কাটাল কারণ ওরা কেউই শহরটা চেনে না। সুইমিংপুলওয়ালা হোটেলে থাকা, বোতলে ভরা জল খাওয়া, রেস্তোরাঁয় কাঁটাচামচ দিয়ে খাওয়া আর ক্রেডিট কার্ডে দাম দেওয়া। অসীমা আর অশোক ভাঙাভাঙা হিন্দিতে কথা বলে। তবে বাচ্চা ছেলেরা পোস্টকার্ড বা শ্বেতপাথরের ছোটখাটো কিছু জিনিস বেচতে এলে গোগোল ও সোনিয়াকে বাধ্য হয়ে বলতে হয়, "ইংলিশ প্লিজ়।" গোগোল লক্ষ করেছে, কোনও কোনও রেস্তোরাঁয় বেয়ারার দল আর ওদের পরিবার ছাড়া অন্য ভারতীয় নেই। দু'দিন তারা তাজমহলের চারপাশে বেড়াল। আলোর উপর নির্ভর করে তাজমহলের রং পালটানো দেখল। কখনও সাদা, কখনও হলুদ, কখনও গোলাপি, কখনও কমলা। তারা তাজমহলের সুষম আকৃতি দেখে মুগ্ধ হয়, মিনারের নীচে দাঁড়িয়ে ফোটো তোলায়। হঠাৎ অসীমা অশোককে বলে, "আমি এখানে তোমার সঙ্গে একটা ছবি তোলাতে চাই। শুধু তুমি আর আমি।" আর তাই, আগ্রার প্রখর রোদে, যমুনার শুকনো প্রবাহের সামনে, অশোক গোগোলকে নিকন ক্যামেরা ব্যবহার করার নিয়ম শিখিয়ে দেয়। কেমন করে ফোকাস ঠিক করে, কেমন করে ফিল্ম রোল করে, সব। এক গাইডের মুখে তাজ সম্বন্ধে সাংঘাতিক কিংবদন্তি শোনে ওরা। তাজ তৈরি সম্পূর্ণ হওয়ার পর বাইশ হাজার কারিগরের প্রত্যেকের হাতের বুড়ো আঙুল নাকি কেটে ফেলা হয়েছিল, যাতে তারা আর দ্বিতীয় তাজ তৈরি না করতে পারে। সেদিন রাতে ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠেছিল সোনিয়া। স্বপ্ন দেখেছে, তারও বুড়ো আঙুলটা কাটা পড়েছে। "এ তো বানানো গল্প," বাবা-মা ওকে বোঝাল। কিন্তু গোগোলও এই গল্পটা নিয়ে ভেবেছে। অন্য কোনও ইমারত দেখে তাজমহলের মতো দুর্দান্ত লাগেনি তার। দ্বিতীয় দিন সে তাজের গম্বুজ আর সামনেটার স্কেচ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা মোটেই ভাল হয়নি। সেটা ফেলে দিয়েছে গোগোল। তাজমহলের সৌন্দর্যের ছিটেফোঁটাও যদি ধরতে না পারে, সে স্কেচ রেখে কী লাভ? বরং সে গাইডবই পড়তে থাকে মন দিয়ে। মোগল স্থাপত্যের খুঁটিনাটি জানার চেষ্টা করে, সম্রাটদের নাম পরপর মনে রাখতে চায়। বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গির, শাজাহান, ঔরঙ্গজেব। আগ্রা দুর্গে তারা সেই ঘর ও জানালাটা দেখে যেখানে শাজাহানকে তাঁর নিজের ছেলেই কয়েদ করে রেখেছিল। আকবরের সমাধি সেকেন্দ্রায় প্রবেশপথের গিল্টিকরা ফ্রেস্কোগুলোর সৌন্দর্য এখন অনেকটাই ম্লান। পোড়া দাগ, ছুরি দিয়ে রত্ন তুলে নেওয়ার চিহ্ন দেখা

যাচ্ছে, রং উঠে গিয়েছে। দেওয়ালের গায়ে নাম বা মন্তব্য লিখে গিয়েছে দর্শকের দল। আকবর ফতেপুর সিক্রি শহরটা বেলেপাথরে তৈরি করেছিলেন। সেই পরিত্যক্ত দুর্গের দালানে-উঠোনে ওরা ঘুরে বেড়াল। আকাশে বাজপাখি আর টিয়ার দল উড়ে বেড়াচ্ছে। সেলিম চিশতির সমাধিতে অসীমা শ্বেতপাথরের জালিতে লাল সুতো বেঁধে মানত করল।

কিন্তু কলকাতায় ফেরার পথটা বেশ খারাপ কাটল। বেনারস স্টেশনে সোনিয়া কাঁঠাল খাওয়ার আবদার করেছিল বলে কিনে দিয়েছিল বাবা। এক কোয়া খেতে না খেতে ওর ঠোঁট ফুলে ঢোল, চুলকানি। বিহার দিয়ে যাওয়ার সময় পাশের কোনও কামরায় এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক খুন হলেন, চুরি গেল তিন লাখ টাকা। ট্রেন পাঁচঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল। স্থানীয় পুলিশ তদন্ত করছে, তাই। গাঙ্গুলি পরিবার দেরির কারণ জানতে পারল পরের দিন সকালে। তখন সকালের খাবার দেওয়া হচ্ছে। সকলের মুখেই এক কথা। "ওঠো! কেউ খুন হয়েছে," নিজের উপরের বার্থ থেকে পাশের বার্থে সোনিয়াকে ডেকে তুলল গোগোল। সকলেই ভয় পেয়েছে কিন্তু অশোকের মতো কেউ নয়। অশোকের অন্য একটা রাতের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, অন্য একটা মাঠের কথা, এইভাবে থেমে থাকার কথা। কিন্তু এবার কিছুই শুনতে পায়নি অশোক। সারারাত অঘোরে ঘুমিয়েছে।

কলকাতায় ফিরে গোগোল আর সোনিয়া দু'জনেই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। আত্মীয়রা নিজেদের মতো কারণ খুঁজতে লাগলেন। বাতাস, ভাত, আবহাওয়া, ইত্যাদি। আলোচনা হল, ভারতের মতো গরিব দেশে বেঁচে থাকা ওদের অভ্যেস নেই। গোগোল ও সোনিয়ার প্রথমে কনস্টিপেশন হল। তারপর উলটোটা। বিকেলবেলা চামড়ার ব্যাগে স্টেথোস্কোপ নিয়ে ডাক্তারবাবুরা এলেন। ওরা নিয়ম করে এন্ট্রোকুইনল খেল, জোয়ানের আরক খেল। জোয়ানের আরকে গলা জ্বলে যায়। যতদিনে ওরা সুস্থ হল, আমেরিকায় ফেরার সময় হয়ে গিয়েছে। ভালই হল, কেন-না গোগোলের ধারণা হতে শুরু করেছিল সেই দিনটা আর আসবে না। অশোকের বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের দেওয়ার জন্য কাশ্মীরি পেনসিলস্ট্যান্ড কেনা হল। গোগোল আমেরিকার বন্ধুদের দেওয়ার জন্য ভারতীয় কমিক্সের বই কিনল। রওনা হওয়ার দিন বিকেলে গোগোল দেখল, বাবা-মা দেওয়ালে ঝোলানো তার ঠাকুরদা-ঠাকুমা আর দাদু-দিদিমার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হাতজোড় করে, চোখে জল। তারপর অ্যামবাসাডর গাড়ি আর ট্যাক্সির লম্বা

মিছিল তাদের শেষবারের মতো শহরের বুক ফুঁড়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে চলল। তাদের প্লেন খুব ভোরে ছাড়বে, তাই তারা অন্ধকারের মধ্যেই রওনা হল। রাস্তাগুলো তখন এতই ফাঁকা যে চেনা যায় না। ওদের সঙ্গের গাড়িগুলো ছাড়া আর একটাই জিনিস নড়ছে, একটা ট্রাম। ওদের বিদায় জানাতে সবাই গিয়ে এয়ারপোর্টের ব্যালকনিতে দাঁড়াল। কলকাতার এই লোকগুলোর সঙ্গে গোগোলের জীবন কখনও এক হতে পারে না বটে, তবে সে তাদের অনেকেরই পদবির অংশীদার। গত কয়েকমাস এরাই তাদের খাইয়েছে, ঘুমোবার জায়গা দিয়েছে, আদর করেছে, যত্ন নিয়েছে। এরাই এয়ারপোর্টের বারান্দা থেকে সমবেতভাবে হাত নাড়বে। বিদায় জানাবে। গোগোল জানে কলকাতার ওরা ওই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ না প্লেনটা দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, যতক্ষণ না টেললাইট দপদপ করতে করতে হারিয়ে যায় অন্ধকার আকাশে। সে জানে, বস্টনে ফেরার পথে সারা রাস্তাটা মা চুপ করে জানালা দিয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকবে। কিন্তু গোগোলের মনে দুঃখের চেয়ে বেশি স্বস্তি। ব্রেকফাস্টের উপর থেকে ফয়েলটা টেনে খোলার সময় স্বস্তি, প্লাস্টিকের প্যাকেট থেকে কাঁটাচামচ বের করার সময় স্বস্তি। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের স্টুয়ার্ডেসের কাছ থেকে কমলালেবুর রস চেয়ে নেওয়ার সময় গোগোল স্বস্তি পায়। স্বস্তি পায় হেডসেট লাগিয়ে *দ্য বিগ চিল* দেখে আর ফেরার পথে মিউজ়িক চার্টের প্রথম ৪০টা গান শোনার সময়।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তারা পেম্বারটন রোডে পৌঁছে গেল। আগস্ট মাসের শেষদিক। বাগানের ঘাস বেশ বেড়ে গেছে। ছাঁটা দরকার। ভাড়াটেরা ফ্রিজে এক প্যাকেট দুধ আর কিছুটা পাঁউরুটি রেখে গিয়েছে। সিঁড়ির উপর চারটে মুদি দোকানের বস্তায় আটমাসের চিঠিপত্র ভরে রাখা আছে। প্রথম কয়েকদিন ওরা সারাদিন ঘুমোল, রাতে জেগে রইল। রাত তিনটের সময় পেট পুরে পাঁউরুটি খেল। সুটকেসগুলো একে একে খুলল। এটাই তাদের বাড়ি বটে, কিন্তু এত খালি জায়গা নিয়ে কী করবে তারা যেন ভেবে পায় না। চারদিকে আশ্চর্য নিস্তব্ধতা তাদের বিস্মিত করে। তারা যেন এদিকেও না, ওদিকেও না, মধ্যপথে কোথাও ভাসছে। যেন নিজেদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, এক বিকল্প সময়ের অধিবাসী তারা। আর এই অদ্ভুত মানসিকতা শুধু তাদের চারজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, চারজনে একই ভাবের শরিক। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই সবকিছু আবার স্বাভাবিকে ফিরে গেল। মায়ের বন্ধুরা এসে নতুন শাড়ি-গয়নার তারিফ করে গেলেন। আটটা সুটকেস খালি করে, রোদে

দিয়ে ঘরে তোলা হল। চানাচুর টুপারওয়্যারের পাত্রে ভরে ফেলা হল, লুকিয়েচুরিয়ে আনা আম সকালে-বিকেলে খাওয়া হয়ে গেল। মনে হল, তারা যেন কোনওদিনই কোথাও যায়নি। "কী কালো হয়ে গেছ তোমরা," বাবা-মার বন্ধুরা দুঃখ করে গোগোল-সোনিয়াকে বললেন। গাঙ্গুলিরাও মসৃণভাবে পুরনো বাঁধা গতে ফিরে গেল। তারা নিজেদের তিনটে আলাদা শোবার ঘরে শুতে গেল, তিনটে আলাদা খাটে। তাদের মোটা গদি, বালিশ আর মাপসই চাদরে ঘুমোল। একবার সুপার মার্কেট থেকে ফেরার পরেই ফ্রিজ আর আলমারিগুলো পুরনো, চেনা লেবেল লাগানো জিনিসে ভরে উঠল আবার: স্কিপি, হুড, বাম্বল বি, ল্যান্ড ও' লেক্স্। মা আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। বাবা গাড়ি চালায়, লনের ঘাস ছাঁটে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে যায়। গোগোল আর সোনিয়া ইচ্ছেমতো ঘুমোয়, টিভি দেখে, পিনাট বাটার আর জেলি স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিনের যে-কোনও সময়ে খায়। ফের তারা ঝগড়া করে, পরস্পরকে খেপায়, চিৎকার করে, 'শাট আপ' বলতে পারে। তারা গরম জলের শাওয়ারে স্নান করে, নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলে, সাইকেলে চড়ে পাড়ার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। তারা আমেরিকান বন্ধুদের ফোন করে। সেই বন্ধুরা ওদের দেখে খুশি হয় বটে, কিন্তু ওরা কোথায় গিয়েছিল, সে-বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞেস করে না। সুতরাং, সেই আটমাস ভুলে যেতে তাদের বিশেষ সময় লাগল না। অনুষ্ঠানে পরা জামাকাপড়ের মতো সেগুলো ছেড়ে ফেলল ওরা, ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেল। এমন একটা ঋতুর মতো সেই আটমাস যা অস্বস্তিকর। আসল জীবনের সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক নেই, থাকবেও না।

সেপ্টেম্বরে গোগোলের জুনিয়ার ইয়ার শুরু হল। বিষয় বলতে বায়োলজিতে আর আমেরিকার ইতিহাসে অনার্স, অ্যাডভান্স্ড ট্রিগনোমেট্রি, স্প্যানিশ, ইংরেজিতে অনার্স। ইংরেজি ক্লাসে পড়ানো হয় *এথান ফ্রোম, দ্য গ্রেট গ্যাটসবি, দ্য গুড আর্থ, দ্য রেড ব্যাজ অব কারেজ।* ছাত্ররা পালা করে পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে *ম্যাকবেথ* নাটক থেকে "মেরো অ্যান্ড টুমরো অ্যান্ড টুমরো" স্পিচটা আবৃত্তি করে। আর এই কয়েকটা লাইনই গোগোলের সারাজীবন মুখস্থ থাকবে। তাদের সাহিত্যের শিক্ষকের নাম মি. লসন। তিনি রোগাপাতলা গিঁটপাকানো চেহারার, কিন্তু তাঁর গলার স্বর গুরুগম্ভীর। চুল লালচে সোনালি, সবুজ চোখদুটো ছোট ছোট কিন্তু মর্মভেদী। তিনি হর্ন-রিম্ড

চশমা পরেন। তাঁকে নিয়ে গোটা স্কুলে ফিসফাস চলে, একটু নিন্দাও আছে কারণ তিনি নাকি একসময় ফরাসি শিক্ষিকা মিস সাগাঁকে বিয়ে করেছিলেন, পরে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। মি. লসন ঢলঢলে খাকি প্যান্ট পরেন, সঙ্গে উজ্জ্বল রঙের সোয়েটার। চলটা-ওঠা নীল কাপ থেকে সারাক্ষণই কফি খান, পঞ্চাশ মিনিটের ক্লাসে অন্তত একবার বেরিয়ে স্টাফরুমে গিয়ে সিগারেট না খেলে তাঁর চলে না। খুব একটা বড়সড় না দেখতে হলেও লসনের ব্যক্তিত্ব প্রবল। ক্লাসরুমে তিনি থাকলে কোনও গণ্ডগোল হয় না। অবশ্য তাঁর হাতের লেখা খুব খারাপ। ছাত্রদের লেখার কাজ মার্ক করে ফেরত দিলে তাতে প্রায়ই কফির কাপের গোল ছাপ দেখা যায়, এমনকী স্কচ হুইস্কির সোনালি ছাপও দেখা গিয়েছে। সবাই জানে, প্রত্যেক বছর প্রথম কাজের ভিত্তিতে তিনি সকলকেই 'ডি' বা 'এফ' দিয়ে থাকেন। প্রথম কাজটা হল ব্লেকের 'দা টাইগার' কবিতার বিশ্লেষণ লেখা। ক্লাসের কিছু মেয়ে অবশ্য ঘোষণা করে, মি. লসন নাকি অসম্ভব সেক্সি আর ওঁকে তারা ভালবাসে।

মি. লসনই গোগোলের প্রথম টিচার যিনি লেখক গোগোলকে চেনেন, জানেন। ক্লাস শুরুর প্রথম দিনে তিনি রোল কল করতে গিয়ে গোগোলের নামে পৌঁছে খুব অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকালেন। তবে অন্য টিচারদের মতো জিজ্ঞেস করলেন না ওটা গোগোলের আসল নাম কি না, নাকি ওটা ওর পদবি, নাকি ওটা অন্য কিছুর ছোট রূপ? বোকার মতো বললেন না, 'উনি লেখক ছিলেন, না'? সে-সব না করে তিনি বেশ স্বাভাবিকভাবেই নামটা জোরে ডাকলেন। থামলেন না, ইতস্তত করলেন না, দ্বিধা দেখালেন না, ঠোঁট চেপে হাসলেন না। ঠিক যেমন ব্রায়ান বা এরিকা বা টম বলে ডাকলেন, ঠিক সেভাবেই গোগোল বলে ডাকলেন মি. লসন। তারপরে বললেন, "ও হ্যাঁ, আমাদের 'দ্য ওভারকোট' পড়তে হবে। ওটা কিংবা 'দা নোস'।"

জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন গোগোল স্কুলে নিজের টেবিলে বসে মিহি, চিনির মতো বরফ পড়া দেখছিল। মি. লসন বললেন, "সামনের তিনমাস আমরা ছোটগল্প নিয়ে পড়াশোনা করব।" গোগোল বুঝতে পারল, তার আশঙ্কা সত্যি হতে চলেছে। ক্রমাগত বাড়তে থাকা ভয় তার বুকে চেপে বসছে, গা গোলাচ্ছে একটু। গোগোল দেখল, মি. লসন 'শর্ট স্টোরি ক্লাসিক্স' নামের বই ক্লাসে বিলি করছেন। বইগুলো জীর্ণ, গোগোলের টেবিলে যে-বইটা এসে পড়ল সেটা একটু বেশিই পুরনো। কোনাগুলো মোড়া, মলাটে ঘোলা ছাপ। সূচিপত্রে চোখ বুলিয়ে দেখল নিকোলাই গোগোলের নাম

রয়েছে ফকনারের পরে, হেমিংওয়ের আগে। কোঁচকানো পাতাটায় নামটা লেখা দেখে গোগোলের তলপেট কেমন যেন ঘুলিয়ে উঠল, সারা গায়ে অস্বস্তি। নিজের কোনও বিশ্রী ছবি দেখলে যেমন হয়। বলতে ইচ্ছে করে, "ওটা আসলে আমার নয়।" ঠিক সেরকম। গোগোলের ইচ্ছে করে হাত তুলে অনুমতি নিয়ে বাথরুমে যেতে, কিন্তু তাতে অন্যরা তাকে লক্ষ করবে। সেটা সে চায় না। তাই সে চুপ করে বসে থাকে, কোনও বন্ধুর দিকে তাকায় না। বইটার পাতা ওলটাতে থাকে। কয়েকটা গল্পের পাশে আগের পড়ুয়ারা পেনসিল দিয়ে দাগ দিয়ে রেখেছে কিন্তু নিকোলাই গোগোলের নামের পাশে তেমন কোনও দাগ নেই। প্রত্যেক লেখকের নামের পাশে একটা গল্পেরই নাম রয়েছে। গোগোলের লেখা গল্পটার নাম 'দ্য ওভারকোট'। কিন্তু সেদিন ক্লাসে মি. লসন গোগোলের নামও করলেন না। গোগোল গাঙ্গুলি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দেখল, ওরা পালা করে গি দ্য মপাসাঁর 'দ্য নেকলেস' থেকে রিডিং পড়ছে। হয়তো মি. লসন গোগোলের গল্পটা আদৌ পড়াবেন না। ওর মনে আশা জাগতে শুরু করে। হয়তো মি. লসন দ্য ওভারকোটের কথা ভুলে গিয়েছেন। কিন্তু ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে যেই ছেলে-মেয়েরা উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে, মি. লসন হাত তুলে থামালেন। তারপর চেঁচিয়ে বললেন, "কালকের জন্য গোগোলটা পড়ে আসবে।"

পরদিন মি. লসন বোর্ডে বড় হাতের অক্ষরে লিখলেন "নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগোল" আর তার চারধারে বাক্স টেনে দিলেন। তার নীচে ব্র্যাকেটে লেখকের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ। গোগোল অনিচ্ছুকভাবে তথ্যগুলো লিখে নিল। নিজেকেই সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল সে, ক্লাসে একজন উইলিয়ামও তো আছে। যদিও আর্নেস্ট বলে কেউ নেই। তা হলে গোগোল বলে একজন থাকতে পারে না? মি. লসন দ্রুত বোর্ডে লিখছিলেন। কিন্তু গোগোলের হাত আর চলছিল না। তার সামনে সাদা পাতা পড়ে রইল। চারদিকে বন্ধুরা তাড়াতাড়ি লিখে চলেছে, যা বলা হল এর উপর একটু পরেই প্রশ্ন করা হবে, গোগোল জানে। জন্ম ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে পোলটাভা রাজ্যের এক ইউক্রেনিয়ান কসাক পরিবারে। বাবা অল্প জমির মালিক ছিলেন, নাটক লিখতেন। গোগোলের বয়স যখন ষোলো, তিনি মারা যান। নেজহিনের হাইস্কুলে পড়াশোনা, ১৮২৮ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গে চলে যান। ১৮২৯ সালে সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। প্রথমে কাজ করতেন গৃহমন্ত্রকের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে। ১৮৩০

থেকে ১৮৩১ পাঠিয়ে দেওয়া হয় রাজদরবার-মন্ত্রকে, ডিপার্টমেন্ট অব রয়্যাল এস্টেট্‌সে। তারপর তিনি শিক্ষকতার চাকরি নেন। ইয়ং লেডিস ইন্সস্টিটিউটে ইতিহাস পড়াতেন। পরে সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়ান। বাইশ বছর বয়সে আলেকজান্ডার পুশকিনের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব হয়। ১৮৩০ সালে প্রথম ছোটগল্প প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৩৬ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গে *দ্য গভর্নমেন্ট ইনসপেক্টর* নামে তাঁর একটি নাটক অভিনীত হয়। সেই নাটক সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখে হতাশায় রাশিয়া ছেড়ে চলে যান গোগোল। পরের বারো বছর পারি, রোম ও অন্যান্য শহরে কাটিয়েছেন। সে সময়ে তাঁর সেরা কাজ বলে পরিগণিত উপন্যাস ‘ডেড সোল্‌স’-এর প্রথম খণ্ডটি লিখছিলেন।

মি. লসন পায়ের উপর পা তুলে ডেস্কের ধারে বসলেন। উকিলরা যে হলুদ প্যাডে কাজ করে, সেরকম একটা প্যাডের লেখাভরতি কয়েকটা পাতা উলটে গেলেন। প্যাডটার পাশে একটা মোটা বই। সেটা লেখকের জীবনী, নাম ‘ডিভাইডেড সোল’। সেটাতে ছেঁড়া কাগজের টুকরো দিয়ে চিহ্ন দেওয়া।

“আমার-তোমার মতো ছাপোষা সাধারণ লোক ছিলেন না এই নিকোলাই গোগোল,” মি. লসনের ভারী গলা গমগম করে ওঠে। “আজ অবশ্য রাশিয়ার সেরা লেখকদের মধ্যে ওঁর নাম করা হয়। তবে জীবিত থাকার সময়ে ওঁকে কেউ বুঝতে পারেনি। উনি নিজেই নিজেকে বুঝতে পারেননি। বলা যেতে পারে ‘একসেনট্রিক জিনিয়াস’ বলতে আমরা যা বুঝি, গোগোল ঠিক তাই-ই ছিলেন। ছোট করে বলতে গেলে গোগোলের জীবন সোজা উন্মাদের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। লেখক ইভান টার্গনেভ তাঁকে বুদ্ধিমান, অদ্ভুত আর রুগ্‌ণ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি অহেতুক আতঙ্কে ও হতাশায় ভুগতেন। স্নায়ুর অসুখও ছিল। একা থাকার রোগ ছিল গোগোলের, অবসাদ ছিল তাঁর জীবনেরই অঙ্গ। বন্ধুত্ব করতে তিনি মোটেই পটু ছিলেন না। প্রায় বন্ধুহীন জীবন কাটিয়েছেন। বিয়ে করেননি, সন্তানের জন্ম দেননি। মনে করা হয়, তাঁর জীবনে কোনও যৌনসংসর্গও ঘটেনি।”

গোগোলের পিঠ থেকে আরম্ভ করে গাল আর কান পর্যন্ত একটা গরমভাব ছড়িয়ে পড়ল। যতবার নিকোলাই গোগোলের নাম ক্লাসে উচ্চারিত হল, ততবারই সে কেঁপে উঠছিল। তার বাবা-মা তো তাকে এ-সব কথা বলেনি। সে ক্লাসের অন্য ছেলে-মেয়েদের দিকে তাকাল, তারা এ-সব নিয়ে ভাবিত নয়। আপনমনে নোট্‌স টুকে নিচ্ছে। মি. লসন বলেই চলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে

ব্ল্যাকবোর্ডে লিখছেনও। তাঁর তেরছা হাতের লেখায় বোর্ড ভরে উঠছে, লিখতে লিখতে পিছন ফিরে কাঁধের উপর দিয়ে ক্লাসের দিকে তাকাচ্ছেন। গোগোলের হঠাৎ মি. লসনের উপর দারুণ রাগ হল। মনে হল, মি. লসন ওকে ঠকিয়েছেন।

"গোগোলের সাহিত্যকর্ম ১১ বছর ধরে চলেছিল। তারপর উনি কিছু লিখতে পারেননি। একে বলে রাইটার্স ব্লক। তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো চরম মানসিক ঝড় আর শারীরিক অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে কেটেছে," মি. লসন বললেন, "স্বাস্থ্য আর সৃজনশীলতা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টায় গোগোল বেশ কয়েকটা স্পা আর স্যানিটোরিয়ামে থেকেছিলেন। ১৮৪৮ সালে প্যালেস্টাইনে তীর্থ করতেও গিয়েছিলেন। শেষে রাশিয়াতে ফিরে এলেন। ১৮৫২ সালে মস্কোয় তিনি সব কাজের ইতি করেন। তাঁর ধারণা ছিল, লেখক হিসেবে তিনি চূড়ান্ত অসফল। সব লেখালেখি বন্ধ করে দেন। তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে *ডেড সোলস*-এর দ্বিতীয় খণ্ডটা পুড়িয়ে ফেলেন। তারপর তিনি নিজেই নিজেকে মৃত্যুদণ্ড দেন। অনাহারে থেকে ধীরগতিতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যান তিনি।"

"কী বিশ্রী!" ক্লাসরুমের পিছন থেকে একটা গলা ভেসে এল। "এ-রকম কেন করলেন উনি?"

কয়েকজন পিছনে ঘুরে এমিলি গার্ডনারের দিকে তাকাল। সকলেই গুজব শুনেছে, এমিলি নাকি আনোরেক্সিয়ায় ভোগে।

মি. লসন আঙুল তুলে ক্লাসকে চুপ করালেন। তারপর বলে চললেন, "মৃত্যুর আগের দিন তাঁকে বাঁচাবার ঢের চেষ্টা করেছিলেন ডাক্তাররা। তাঁকে সুপের পাত্রে স্নান করানো হয় আর সেই সঙ্গে মাথায় বরফজলও ঢেলে দেওয়া হয়। নাকে সাতটা জোঁক আটকে দেওয়া হয়। যাতে জোঁক তিনি টেনে না সরাতে পারেন, তার জন্য হাতও বেঁধে দেওয়া হয়।"

একজন ছাড়া ক্লাসের প্রত্যেকে নিচু স্বরে গোঙাতে শুরু করল। আওয়াজের উপর গলা তুলে মি. লসন কিন্তু বলেই চললেন। গোগোল একদৃষ্টে ডেস্কের দিকে চেয়ে রইল। তার ক্রমশ বিশ্বাস হতে শুরু করেছে, মি. লসনের লেকচার সারা স্কুলে সবাই শুনছে। সে মাথা নিচু করে দু'হাতে কান চেপে রইল। সাবধানে, যাতে কেউ বুঝতে না পারে। কিন্তু তাতে মি. লসনের গলা চাপা দেওয়া গেল না, "সেই সন্ধেবেলায় গোগোলের পুরো জ্ঞান রইল না। এত ক্ষয়ে গিয়েছিল তাঁর শরীর যে পেটের উপর থেকে মেরুদণ্ড ছুঁয়ে

দেখা যাচ্ছিল।" গোগোল শিউরে উঠল। ইচ্ছে করছিল চেঁচিয়ে মি. লসনকে বলে, "চুপ! চুপ!" তারপর সহসাই সব চুপ। গোগোল মুখ তুলে দেখল, মি. লসন চকটা নামিয়ে রাখছেন।

"আমি আসছি," মি. লসন সিগারেট খেতে চলে গেলেন। ছাত্ররা এতে অভ্যস্ত, তারা কথা বলতে শুরু করে দিল। বলল, গল্পটা বড্ড লম্বা, বড্ড কঠিন। রাশিয়ান নামগুলো উচ্চারণ করা যায় না। কেউ কেউ বলল, তারা গল্পটা মোটেই পড়েনি। পাতা উলটে উপর উপর দেখে নিয়েছে। গোগোল কিছুই বলল না। সে নিজেও গল্পটা পড়ে আসেনি। চোদ্দো নম্বর জন্মদিনে দেওয়া গোগোলের বইটা সে উলটেও দেখেনি। আর গতকাল ক্লাস শেষ হওয়ার পরে সে মি. লসনের দেওয়া ছোটগল্পের সংকলনটা লকারের অনেক ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাড়ি গিয়েছে। ওই বইটা বাড়িতে নিয়ে যেতে তার মোটেই ইচ্ছে করেনি। তার কেমন যেন মনে হয়, গল্পটা পড়লে লেখক গোগোলকে মেনে নেওয়া হবে, তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া হবে। সেটা সে চায় না। তবু, বন্ধুদের নালিশ শুনতে শুনতে গোগোলের খারাপ লাগে, যেন তাকেই আক্রমণ করছে ওরা। তারই লেখার সমালোচনা করছে।

মি. লসন ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন। গোগোল আশা করে বসে আছে, লেখকের জীবনীর অংশটায় আর ফেরা হবে না। আর কী-ই বা বলার থাকতে পারে? কিন্তু মি. লসন *ডিভাইডেড সোল্স* নামের বইটা তুলে নিলেন। "এবার গোগোলের জীবনের শেষ কয়েকটা মুহূর্তের বর্ণনা পড়ে শোনাচ্ছি," বললেন তিনি। বইটার শেষদিকের একটা পাতা খুলে পড়তে থাকলেন, "তাঁর পা দুটো বরফের মতো ঠান্ডা। তারাসেনকভ বিছানায় একটা গরম জলের বোতল ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্তু কোনও ফল হল না, তিনি কাঁপছিলেন। শুকনো মুখটায় ঘাম। চোখের নীচে নীল ছাপ। মধ্যরাতে ডা. ক্লিমেনটভ এসে ডা. তারাসেনকভকে ছুটি দিলেন। মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটিকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য এক ডোজ় ক্যালোমেল দেওয়া হল। শরীরের চারদিকে রেখে দেওয়া হল গরম পাঁউরুটির লোফ। গোগোল আবার গোঙাতে আরম্ভ করলেন। সারারাত ধরে তাঁর মন নিরুদ্দেশে ঘুরে বেড়াল। ফিসফিস করে বলছিলেন তিনি, "চলো, এগিয়ে যাও। মিল চালাও।" তারপর আরও দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি, মুখ-চোখ যেন অন্ধকার গহ্বরে ঢুকে যাচ্ছিল। শ্বাস টের পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে তিনি শান্ত হয়ে গেলেন। কষ্ট পাচ্ছিলেন না। ২১

ফেব্রুয়ারি ১৮৫২ সালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তখনও তাঁর বয়স ৪৩ হয়নি।”

গোগোল হাইস্কুলে কারও সঙ্গে ডেটিং করেনি। অবশ্য মনে মনে অনেক চেনা মেয়ের প্রতিই সে আকৃষ্ট হয়। কাউকে বলা যায় না সে-সব। সে নাচতে বা পার্টিতে যায় না। সে আর তার বন্ধুরা, মানে কলিন, জেসন আর মার্ক, একসঙ্গে গান শুনতেই বেশি ভালবাসে। ডিলান, ক্ল্যাপটন, দ্য হু শোনে আর খালি সময়ে নিৎজ়ে পড়ে। তার বাবা-মায়েরও অবশ্য এতে কোনও মাথাব্যথা নেই। ছেলে ডেটিং করে না, জুনিয়ার স্কুলের নাচের আসরের জন্য কোট ধার করে না, এতে তাঁরা আশ্চর্য হন না। নিজেদের জীবনে তাঁরা কখনওই ডেটিং করেননি, তাই এই অল্প বয়সে ছেলেকে ডেটে পাঠাতে কোনও আগ্রহ তাঁদের থাকারও কথা নয়। বরং ম্যাথ্‌স টিমে নাম লেখাতে আর লেখাপড়ায় গড়ে ‘এ’ পাওয়ার জন্য তাঁরা ছেলেকে উৎসাহ দেন। বাবা তাকে এম আই টিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বলেন। গোগোল রেজাল্ট ভালই করে। মেয়েদের বিষয়ে তার খুব একটা আগ্রহ টের পাওয়া যায় না। তাই বাবা-মা ওকে আমেরিকান টিনএজার বলে মনেই করেন না। যেমন, তারা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেন না যে গোগোল গাঁজা খায়। কিন্তু বন্ধুরা মিলে একে অপরের বাড়িতে গান শোনার সময়ে ওরা কখনও কখনও গাঁজা খেয়েই থাকে। বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটাতে গেলে গোগোল পাশের টাউনে দ্য রকি হরার পিকচার শো দেখতে যায় বা বস্টনের কেনমোর স্কোয়্যারে ব্যান্ডের অনুষ্ঠান শুনতে যায়। ওর বাবা-মা ভাবতেই পারেন না গোগোল এসব করে।

এক শনিবার, গোগোল স্যাট পরীক্ষায় বসার ঠিক আগে, তার বাড়ির লোকেরা শনি-রোববারের জন্য কানেক্টিকটে বেড়াতে গেল। সেই প্রথমবার গোগোল একা ফাঁকা বাড়িতে থেকে গেল। ওর বাবা-মা স্বপ্নেও ভাবেননি, বাড়িতে বসে প্র্যাকটিস টেস্ট না করে গোগোল মার্ক, কলিন আর জেসনের সঙ্গে পার্টিতে চলে যাবে। কিন্তু তা-ই হল। ওদের পার্টিতে আসতে বলেছিল কলিনের দাদা। গোগোলের বাবা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান, সেখানেই প্রথম বছরের ছাত্র সে। গোগোল রোজ যেমন পোশাক পরে, পার্টির জন্যও তেমন পরেছিল। লিভাইস জিন্‌স, চেককাটা ফ্লানেলের শার্ট আর জুতো। গোগোল আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অনেকবার এসেছে। বাবার ডিপার্টমেন্টে, সাঁতার শিখতে বা জগিং করতে। কিন্তু কোনওবারই সে

ডর্মিটারিতে বা হস্টেলে ঢোকেনি। এবার তারা সেখানে একটু ভয়ে ভয়েই ঢুকল। কেউ যদি ধরে ফেলে! গাড়িতে আসার সময়ই অবশ্য কলিন তাদের শিখিয়ে দিয়েছে, "কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি আমরা আমর্হাস্টে ফ্রেশম্যান। দাদা তাই বলেছে।"

পার্টি চলছে পুরো হলঘর জুড়ে। ছাত্রদের ব্যক্তিগত ঘরের দরজাগুলো সব খোলা। যে ঘরটাতে প্রথম ঢুকতে পারল ওরা, সেটা পুরো ভরতি, অন্ধকারমতো, গরম। গোগোল আর তার তিন বন্ধু যে ঢুকে মদের পিপের দিকে এগোচ্ছে, তা কেউ লক্ষই করল না। কিছুক্ষণ তারা এক জায়গায় জোট বেঁধে দাঁড়িয়ে রইল। হাতে প্লাস্টিকের বিয়ারের কাপ। তারস্বরে গানবাজনা চলছে, কথা বলার জন্য রীতিমতো চেঁচাতে হচ্ছিল। তারপর কলিন প্যাসেজে তার দাদাকে দেখে সেদিকে চলে গেল। জেসনের বাথরুমে যাওয়ার দরকার হয়ে পড়ল আর মার্ক আর একটা বিয়ারের জন্য অন্যদিকে কেটে গেল। গোগোলও আর একলা না দাঁড়িয়ে হলঘরের দিকে এগোল। এখানে সবাই সবাইকে চেনে। পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছে যে, সেখানে যোগ দেওয়া অসম্ভব। বিভিন্ন ঘর থেকে বিভিন্ন রকম বাজনা শোনা যাচ্ছে। এই হট্টগোল গোগোলের মোটেই ভাল লাগছিল না। অন্য সকলেরই পরনে ছেঁড়া জিন্স আর টি শার্ট। সেই অগোছালো পোশাকের ভিড়ে নিজেকে একটু বেশিই ভদ্র মনে হচ্ছিল গোগোলের। যেন তার চুল বেশি পরিষ্কার আর বেশি পাট করে আঁচড়ানো। তবে ওকে নিয়ে ভাবার সময় নেই কারও। কেউ দেখছেই না ওকে। হলঘরের শেষ পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে একটা সিঁড়ি পেল সে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় আর একটা হলঘর। সেখানেও দারুণ ভিড়, কানফাটানো আওয়াজ। গোগোল দেখল, কোণে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে চুমু খাচ্ছে। দোতলার হলঘরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গেল না গোগোল। তিনতলার দিকে পা বাড়াল। তিনতলার হলঘরটা ফাঁকা, ঘন নীল রঙের কার্পেট আর সাদা রঙের দরজার সারি দেখা যাচ্ছে। হালকা শোনা যাচ্ছে নীচের থেকে ভেসে আসা বাজনা আর কথার শব্দ। গোগোল নেমে আসার জন্য সিঁড়ির দিকে ফিরেছে, এমন সময় প্যাসেজের একটা দরজা খুলে গেল। একটা মেয়ে বাইরে এল। ছিপছিপে, মিষ্টি চেহারার একটা মেয়ে। সে সস্তার দোকান থেকে কেনা পোলকা ডটওয়ালা একটা জামা পরে আছে। খয়েরি, ছোট করে ছাঁটা চুল গালের উপর গুটিয়ে আছে। কপালে কায়দা করে কাটা চুল ছড়ানো। মেয়েটার

মুখটা পানপাতা আকারের, ঠোঁটে উজ্জ্বল লাল রঙের লিপস্টিক।

গোগোল বলল, "সরি। আমার নিশ্চয়ই এখানে আসাটা ঠিক হয়নি?"

"হুঁ? এটা অবশ্য মেয়েদের থাকার জায়গা। কিন্তু তাতে কী? ছেলেদের এখানে আসা তার জন্য আটকায় না।" মেয়েটা মন দিয়ে গোগোলকে দেখল। এমনভাবে এর আগে কোনও মেয়ে ওকে দেখেনি। "তুমি তো এখানে পড়ো না?"

গোগোলের বুকে ধড়াস ধড়াস করছিল। তবু বলল, "না।" তারপরেই কলিনের বলে দেওয়া কথাটা মনে হতেই বলে ফেলল, "আমি আমহার্স্টে ফ্রেশম্যান।"

"বেশ তো," মেয়েটা গোগোলের দিকে এগিয়ে এল, "আমার নাম কিম।"

"নাইস টু মিট ইউ," গোগোল হাত বাড়িয়ে দিল। কিম হ্যান্ডশেক করল। গোগোলের মনে হল, দরকারের চেয়ে বেশি সময় ওর হাত ধরে রইল কিম। এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল সে, তারপর হাসল। কিমের সামনের দুটো দাঁত একটা অন্যটার উপর উঠে আছে।

"এসো, তোমাকে ঘুরিয়ে দেখাই," কিম বলল। দু'জনে একসঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নামল। একটা ঘরে ঢুকে কিম বিয়ার নিল, গোগোলও একটা নিল। দুজনে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। কিম বন্ধুদের হ্যালো বলার জন্য দাঁড়াচ্ছে, পাশে গোগোলকেও বোকার মতো দাঁড়াতে হচ্ছে। একটা খোলা জায়গায় এসে পৌঁছোল ওরা। সেখানে একটা টিভি, একটা কোক মেশিন, একটা প্রাচীন সোফা আর নানা রকমের কয়েকটা চেয়ার। ওরা দুজনে সোফাটায় বসল, কিন্তু মাঝখানে যথেষ্ট ফাঁক রেখে। কফি-টেবিলে একটা সিগারেটের প্যাকেট পড়ে থাকতে দেখে কিম একটা জ্বালিয়ে নিল।

"তো?" এবার সে কিছুটা সন্দেহ নিয়েই গোগোলের দিকে তাকাল।

"কী?"

"নিজের পরিচয়টা তো দিতে হয়।"

"ও," গোগোল বলল, "ও হ্যাঁ।"

কিন্তু কিমকে ও নিজের নামটা বলবে না। বললেই সেই পুরনো প্রতিক্রিয়া দেখতে হবে, কিমের সুন্দর নীল চোখদুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠবে। সেটা দেখতে চায় না গোগোল। ওর কেন আর একটা নাম নেই? শুধু অন্য একটা নাম, আজকে সন্ধ্যায় তরিয়ে দেওয়ার জন্য। তা হলে এতটা খারাপ হত না। আমহার্স্টে পড়ার কথাটা ও তো কিমকে মিথ্যে বলেইছে। ও নিজের

নামটাও তো মিথ্যে বলতে পারে। কলিন বা জেসন বা মার্ক বা অন্য কিছু। কিম বুঝতেও পারবে না, খেয়ালও করবে না। হাজার হাজার নামের মধ্যে একটা নাম বেছে নিলেই তো হল। তারপরই গোগোলের মনে হল, মিথ্যে বলার তো কোনও দরকার নেই। মানে পুরোপুরি মিথ্যে না বলেও ও বেরিয়ে যেতে পারে। ওর তো অন্য একটা নাম আছে, যেটা একবার ওকে আইনত দেওয়া হয়েছিল। যেটার অস্তিত্ব থাকার কথা ছিল।

"আমি নিখিল," জীবনে প্রথমবার নতুন নামটা উচ্চারণ করল গোগোল। কাঁপা গলায় বলল, নিজের কানে নিজের গলা অচেনা ঠেকল তার। যেন এটা বাক্য নয়, প্রশ্ন। সে ভুরু কুঁচকে কিমের দিকে তাকাল। যেন এই নতুন মেয়েটা তখনই ওকে চ্যালেঞ্জ করবে, ওর আসল নামটা ফাঁস করে দেবে, মুখের উপর হেসে উঠবে। গোগোল নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে। তার মুখে চাপা আবেগ। সেটা ভয়ের জন্য না জয়ের জন্য, তা জানা নেই।

কিন্তু কিম খুশিমনেই নামটা মেনে নেয়। "নিখিল!" ছাতের দিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়িয়ে সে বলে। গোগোলের দিকে তাকিয়ে অল্প হাসে। আবার বলে, "নিখিল। এ-রকম নাম আগে শুনিনি। সুন্দর নাম।"

ওরা আরও কিছুক্ষণ বসে রইল। কথা বলল। গোগোল ভাবতেও পারেনি ব্যাপারটা এত ভাল আর সহজ হবে। তবে কিমের কথার মধ্যে দিয়ে ওর মন ভাসতে থাকে। কিম বলছে, ওর ক্লাসের কথা। কানেক্টিকটের যে ছোট্ট শহরটা থেকে ও এসেছে, সেটার কথা। গোগোল মন দিয়ে শোনে না। তার একই সঙ্গে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে, আবার আনন্দও হচ্ছে। গোগোল জানে, কিমের সঙ্গে আর কোনওদিন দেখা হবে না। তাই সে একটু সাহসীও হয়ে উঠল। কথা বলতে বলতে কিমের ঠোঁটে আলতো করে চুমু খেল। ওদের দুজনের পা সোফায় পাশাপাশি, চাপ খাচ্ছে। ওর চুলের মধ্যে দিয়ে অল্প করে আঙুল চালিয়ে দিল গোগোল। এই প্রথম কোনও মেয়েকে চুমু খেল সে, এই প্রথম কোনও মেয়ের শরীর তার এত কাছাকাছি এল। "তুই ওকে চুমু খেলি, গোগোল? ধ্যাৎ, বাজে কথা..." ফেরার পথে গাড়িতে বন্ধুরা অবাক হয়ে বলে। গোগোল যেন ঘোরের মধ্যে মাথা ঝাঁকায়। ওর নিজেরও বিশ্বাস হতে চায় না। বুকের ভিতরে তখনও ঢিপঢিপ করছে। খুশির রেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। সে প্রায় বলেই ফেলেছিল, যে ছেলেটা চুমু খেয়েছে সে আসলে গোগোল নয়। কিন্তু বলল না। তবে সত্যিই তো, গোগোল চুমু খায়নি। যা ঘটেছে তাতে গোগোলের কোনও দায় নেই। কিন্তু বন্ধুদের সে তা বলবে কেন?

পাঁচ

অনেক লোক নাম বদলে ফেলে। অভিনেতা, লেখক, বিপ্লবী, হিজড়ে...। ইতিহাসে গোগোল পড়েছে, ইউরোপের অভিবাসীরা এলিস দ্বীপে নাম পালটে নিয়েছিল। মুক্তি পেলে ক্রীতদাসরা নাম বদলে নিত। অবশ্য একটা কথা গোগোল এখনও জানে না। নিকোলাই গোগোলও নিজের নাম বদলে নিয়েছিলেন। তাঁর আদত পদবি ছিল গোগোল-ইয়ানোভস্কি। বাইশ বছর বয়সে সেটাকে ছেঁটে শুধু 'গোগোল' করে নেন নিকোলাই। সেই নাম লিটেরারি গেজেটে প্রকাশিতও হয়। (অবশ্য গোগোল 'ইয়ানভ' নামেও লেখা প্রকাশ করেছিলেন, আর একবার 'ওওওও' নামেও প্রকাশ করেছিলেন। সেটা তাঁর সম্পূর্ণ পারিবারিক নামের চারটি 'ও' অক্ষরকে সম্মান জানাতে।)

১৯৮৬-এর গ্রীষ্মে, বাড়ি ছেড়ে বাইরে পড়তে যাওয়ার আগেকার ব্যস্ত সপ্তাহগুলোয়, গোগোল গাঙ্গুলিও সেটাই করল। ইয়েলে তার প্রথম বছর শুরু হওয়ার আগে। সে ট্রেনে করে বস্টনে গেল, নর্থ স্টেশনে গাড়ি বদল করে গ্রিন লাইন ধরে পৌঁছোল লেচমেয়ারে। জায়গাটা তার কিছুটা চেনা। সে বহুবার বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে লেচমেয়ারে এসেছে। কখনও ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কিনতে, কখনও টেলিভিশন কিনতে। স্কুল থেকে ফিল্ড ট্রিপে মিউজ়িয়াম অব সায়েন্সেও এসেছে। তবে একা-একা এ-অঞ্চলে সে কখনও আসেনি। একটা কাগজে ঠিকানা ও পথনির্দেশ লিখে আসা সত্ত্বেও মিডলসেক্স প্রোবেট ও ফ্যামিলি কোর্টে যাওয়ার রাস্তাটা সে কিছুক্ষণের জন্য ঠিক চিনে উঠতে পারেনি। আজ গোগোল পরেছে নীল অক্সফোর্ড শার্ট, খাকিজ়, পাঁশুটে-রং কর্ডুরয় ব্লেজ়ার। শেষেরটা কলেজ ইন্টারভিউয়ের জন্য কেনা। গুমোট দিনে পরার পক্ষে একটু বেশিই গরম। গলায় তার একমাত্র টাইটা বাঁধা— তাতে মেরুনের উপর হলুদ কোনাকুনি স্ট্রাইপ। সে সময় গোগোল লম্বায় ছ'ফুটের একটু নীচে, রোগাটে গড়ন, কালো-খয়েরি চুল

কাটার দরকার হয়ে পড়েছে। তার মুখটা লম্বাটে, বুদ্ধিদীপ্ত, হঠাৎ-হ্যান্ডসাম। হাড়গুলো বোঝা যায়, সোনালি-ফরসা গায়ের রং। দাড়ি পরিষ্কার করে কাটা। সে অসীমার চোখ পেয়েছে। বড়, গভীর চোখ, সুন্দর ঘন ভুরু। অশোকের মতো তার নাকের উপরটা একটু ঠেলে উঠেছে।

কোর্টের বাড়িটা বিশাল, পুরনো, থামওয়ালা, ইট দিয়ে তৈরি। একটা পুরো ব্লক জুড়ে তার অবস্থান। ঢোকার পথটা পাশের দিকে, সেখানে কয়েকটা সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। ভিতরে ঢুকে গোগোলকে পকেট খালি করতে হল, মেটাল ডিটেক্টরের মধ্যে দিয়ে যেতে হল, যেমন এয়ারপোর্টে হয়। যেন সে নতুন কোনও যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে। এয়ার কন্ডিশনিংটা অবশ্য ভারী স্বস্তিদায়ক। কারুকাজ করা প্লাস্টারের ছাত আর শ্বেতপাথরের অন্দরসজ্জা তাকে শান্তি দিচ্ছিল। আসলে সে ভাবতেই পারেনি, কোর্টের ভিতরটা এমন প্রাসাদ-প্রাসাদ হবে। তবে ভাবতে অবাক লাগে, এখানেই লোকে ডিভোর্স চাইতে, উইল-সংক্রান্ত ঝগড়া মেটাতে আসে। ইনফরমেশন বুথের একটা লোক তাকে উপরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলল। অপেক্ষা করার জায়গাটায় অনেক গোল টেবিল সাজানো আছে, সেখানে বসে অনেকে দুপুরের খাবার খাচ্ছে। গোগোলের ধৈর্য কম, সে বিরক্তভাবে বসে পা নাচাতে থাকে। সঙ্গে একটা বই আনলে হত! ভুলে গিয়েছে সে। কাছে পড়ে থাকা একটা পুরনো 'গ্লোব'-এর ছেঁড়া অংশ তুলে নেয় গোগোল। পাতা ওলটাতে ওলটাতে পৌঁছে যায় 'আর্ট্‌স' বিভাগে অ্যান্ড্রু ওয়াইথের হেলগা ছবিগুলোর উপর লেখা একটা প্রবন্ধে। শেষকালে সে কাগজটার মার্জিনে নতুন স্বাক্ষরটা অভ্যাস করতে থাকে। নানা স্টাইলে নামটা লিখে চলে সে। 'এন' অক্ষরটার ভাঁজগুলোর সঙ্গে তার পরিচয় বিশেষ নেই, দু'টো 'আই'য়ের মাথায় ফুটকি দেওয়ার ব্যাপারটাও কখনও করেনি। পুরনো নামটা কতবার লিখেছে সে? কতগুলো পরীক্ষার খাতার উপরে, কতগুলো হোমওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্টের নীচে? বন্ধুদের ইয়ারবুকে কতবার সেই নামটা সই করে থাকবে? সারা জীবনে একজন মানুষ কতবার নিজের নাম লেখে? দশলক্ষবার?

নাম বদলানোর এই মতলবটা প্রথম মাথায় এসেছিল কয়েকমাস আগে। সে দাঁতের ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল, অপেক্ষা করছিল রোগীদের বসার ঘরে। হাতে রিডার্‌স ডাইজেস্ট। এমনিই পাতা উলটোচ্ছিল, হঠাৎ একটা লেখা চোখে পড়ায় আটকে গেল। লেখাটার নাম, 'সেকেন্ড ব্যাপটিজ়ম্‌স'।

হেডলাইনের তলায় লেখা, "আপনি কি এই বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের চিনতে পারছেন?" তারপর কয়েকটা নাম। পাতার একেবারে তলায় উলটো করে ছাপা রয়েছে উপরের নামগুলি কোন-কোন বিখ্যাত ব্যক্তিদের। একমাত্র রবার্ট জ়িমারম্যানের নামটা চিনতে পারল সে। ওটা বব ডিলানের আসল নাম। তার কোনও ধারণাই ছিল না যে, মলিয়্যারের আসল নাম জঁ-বাপতিস্ত পোকল্যাঁ, লিয়ন ট্রটস্কি জন্মেছিলেন লেভ ডেভিডোভিচ ব্রনস্টাইন নাম নিয়ে। জেরাল্ড ফোর্ডের নাম ছিল লেসলি লিঞ্চ কিং জুনিয়র, এঙ্গেলবার্ট হাম্পারডিংক ছিলেন আনর্ল্ড জর্জ ডরসি। তাঁরা সকলেই নাম পালটেছিলেন। লেখাটাতে এও বলা ছিল যে, নাম পরিবর্তন করা প্রত্যেক মার্কিন নাগরিকের অধিকার। প্রতি বছর বহু আমেরিকান নাকি নাম বদলে নেয়। তাতে দরকার হয় শুধু একটা লিগাল পিটিশন। সেই মুহূর্তে গোগোল যেন দেখতে পেল, বড় করে ছাপা নামের তালিকায় 'গোগোল' নামটা ঝকঝক করছে। নীচে ছোট্ট করে উলটে লেখা আছে 'নিখিল'।

সেই রাতে খেতে বসে গোগোল বাবা-মা'র কাছে কথাটা পাড়ল। হাইস্কুল ডিপ্লোমায় ক্যালিগ্রাফি করে 'গোগোল' লেখা থাকবে বা ইয়ারবুকে তার ছবির তলায় নামটা ছাপা থাকলে সেটা মেনে নেওয়া যায়। পাঁচটি আইভি লিগ কলেজে বা স্ট্যানফোর্ড ও বার্কলিতে আবেদনপত্রে ও-নামটা টাইপ হয়ে থাকল, সে পর্যন্তও। কিন্তু আজ থেকে চার বছর পরে আর্টসে ব্যাচেলর ডিগ্রি সার্টিফিকেটেও কি সেটা লেখা থাকবে? রেজ়িউমের উপরে, বিজ়নেস কার্ডে? না। সেক্ষেত্রে ওই জায়গা নেবে সেই নাম, যা বাবা-মা আদতে তার জন্য ঠিক করেছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে ঠিক হওয়া 'ভালনাম'।

"যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে," বাবা বলল, "ও-সব করতে গেলে অনেক ঝামেলা। তা ছাড়া এটাই এখন তোর ভালনাম হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে," মা সায় দিল, "তুই এখন বড় হয়ে গিয়েছিস।"

"না," সে জেদ করে বলল, "আমি বুঝতে পারছি না। আমাকে তোমরা একটা ডাকনাম দিয়েছিলেই বা কেন? এর মানে কী?"

"এটা আমাদের প্রথা, গোগোল। বাঙালিরা এটাই করে," মা-রও জেদ কম নয়।

"কিন্তু নামটা মোটেই বাংলা নাম নয়।"

মি. লসনের ক্লাসে কী জেনেছে, খুলে বলল সে। গোগোলের সারা

জীবনের বিমর্ষতা, তাঁর পাগলামির কথা বলল। বলল, কীভাবে তিনি অনাহারে আত্মহত্যা করেছিলেন। "তোমরা কি এ-সব জানতে?" সে জিজ্ঞেস করল।

"উনি যে একজন জিনিয়াস ছিলেন, সেটা তো তুমি বললে না," বাবা বলল।

"আমি একটা জিনিস বুঝতে পারি না। তোমরা আমার নাম ও-রকম অদ্ভুত লোকের নামে রাখলে কেন? এইজন্যই কোথাও আমি পাত্তা পাই না।"

"কে? কে তোমাকে পাত্তা দেয় না?" অশোক প্লেট থেকে আঙুল তুলে সরাসরি ছেলের দিকে তাকাল।

"লোকজন," গোগোল বাবা-মাকে বেমালুম মিথ্যে বলে দিল। আসলে বাবার প্রশ্নটার উত্তর দিতে গেলে একটা অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি হতে হয়। যে একমাত্র মানুষটা ওকে পাত্তা দেয় না, যে ওর উপর অত্যাচার করে, যে নামটা নিয়ে সারাক্ষণ বিরক্ত আর অপ্রতিভ হয়ে থাকে, যে ক্রমাগত সেটাকে নিয়ে প্রশ্ন তোলে আর ভাবে নামটা অন্য রকম হলে বেশ হত, তার নাম গোগোল গাঙ্গুলি। সুতরাং গোগোল বলে যেতে লাগল। বাবা-মাকে বোঝাতে লাগল, তার ভালনামটা রাশিয়ান না হয়ে বাংলা নাম হলে তাঁদের কত খুশি হওয়া উচিত।

"আমি জানি না, গোগোল," মা মাথা নেড়ে বলল, "আমি সত্যি সত্যি কিছু বুঝতে পারছি না।" উঠে পড়ে প্লেট গোছাতে লাগল মা। সোনিয়া চুপচাপ নিজের ঘরে পালিয়ে গেল। গোগোল টেবিলে বসে রইল, বাবার সঙ্গে। কানে আসছিল, রান্নাঘরে মা প্লেট ধুচ্ছে, জল পড়ছে সিংকের কল দিয়ে।

"বেশ। তা হলে নাম পালটে নাও," বাবা কিছুক্ষণ পর চাপা গলায় বলল। এমনিই বলল, যেন কিছুই ঘটেনি।

"সত্যি?"

"আমেরিকায় সব সম্ভব। তোমার ইচ্ছে করলে বদলে নাও।"

তারপরই গোগোল কমনওয়েল্‌থ অব ম্যাসাচুসেট্‌সের নাম বদলানোর ফর্ম জোগাড় করে ফেলল। ফর্মটা তার জন্মের প্রমাণপত্রের একটা সার্টিফায়েড কপির সঙ্গে জমা দিতে হবে। আর দিতে হবে মিডলসেক্স ফ্যামিলি অ্যান্ড প্রোবেট কোর্টের নামে একটা চেক। ফর্মটা বাবার কাছে নিয়ে গিয়েছিল গোগোল। একবার চোখ বুলিয়ে সই করে দিল বাবা, ঠিক যেমনভাবে চেক বা ক্রেডিট কার্ডের রসিদে সই করে। ভুরুদুটো চশমার উপর তোলা, যেন

মনে মনে লাভক্ষতির হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছে। অনেক রাতে, বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়ার পর গোগোল নিজের ঘরে বসে ফর্মটা ভরে ফেলল। ঘিয়ে রঙের কাগজের একটা পিঠ জুড়ে ছোট্ট ফর্ম, কিন্তু সেটা ভরতেই ঢের সময় লেগে গেল গোগোলের। কলেজের অ্যাডমিশন ফর্ম ভরতেও তার এত সময় লাগেনি। প্রথম লাইনে যে-নামটা পালটাতে চাওয়া হচ্ছে, সেটা লিখতে হবে। তারপর জন্মের তারিখ আর জায়গা। তারপর যে নতুন নামটা সে নিতে চায়, সেটা লিখল গোগোল। তারপর নিজের পুরনো নামে ফর্মটা সই করল। শুধু একটা জায়গাতেই থমকে গেল গোগোল। নাম পালটানোর কারণ লিখতে হবে লাইন তিনেকের মধ্যে। প্রায় এক ঘণ্টা চুপচাপ বসে রইল গোগোল। কী লিখবে, ভাবতে থাকল। শেষে ওই শূন্যস্থানটা আর পূর্ণ করতে পারেনি। জায়গাটা খালিই রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত গোগোলের মামলার ডাক পড়ল। ঘরে ঢুকে পিছনের দিকে একটা কাঠের বেঞ্চে বসে থাকে সে। জজসাহেবা উলটোদিকে ডায়াসে বসে আছেন। তিনি মাঝবয়সি, মোটাসোটা, কালো চামড়ার মহিলা। চোখে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চশমা। ক্লার্কও মহিলাই; অল্পবয়সি, রোগা, ববকাটা চুল। তিনি গোগোলের আবেদনপত্রটি নিলেন, চোখ বুলিয়ে জজসাহেবার হাতে তুলে দিলেন। ঘরটা ফাঁকা। ম্যাসাচুসেট্‌স স্টেট আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা ছাড়া দেওয়ালে কোনও এক বিচারকের তেলরঙে আঁকা ছবি রয়েছে। এ ছাড়া শোভাবর্ধক কিছুই নেই। "গোগোল গাঙ্গুলি," কেরানি ভদ্রমহিলা নাম ধরে ডেকে গোগোলকে ডায়াসের কাছে এগিয়ে আসতে বললেন। এগিয়ে যেতে বা পুরো ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে গোগোল খুবই আগ্রহী, তবে এই মুহূর্তে তার সামান্য মনখারাপও হল। এই শেষবার সে আইনগতভাবে এই নামটায় সাড়া দিচ্ছে। বাবা-মার সম্মতি থাকা সত্ত্বেও, তার মনে হয়, সে তাদের উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের করা ভুল শুধরোচ্ছে সে।

"কী কারণে আপনি নাম পরিবর্তন করতে চান, মি. গাঙ্গুলি?" বিচারক জিজ্ঞেস করলেন।

প্রশ্নটার জন্য সে তৈরি ছিল না। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর বলল, "ব্যক্তিগত কারণ।"

বিচারক তার দিকে চেয়ে রইলেন। নিচু হয়ে দু'হাতের তালুতে মুখ রাখলেন। "একটু খুলে বলবেন কি?"

প্রথমে গোগোল কিছুই বলতে পারে না, সে বেশি কিছু বলার মতো

ভাবনাচিন্তাই করে আসেনি। জজসাহেবাকে কি পুরো গল্পটা বলবে সে? মায়ের দিদার চিঠি হারিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করবে? নাকি ভালনাম আর ডাকনাম থেকে? নাকি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রথম দিনটার কথা বলবে? কিন্তু এ-সব কিছুই বলে না সে। বরং দীর্ঘশ্বাস নিয়ে কোর্টের অচেনা লোকজনকে সেই কথাটা বলে গোগোল, যা এতদিন বাবা-মাকে বলতে পারেনি। "আমি গোগোল নামটাকে ঘেন্না করি, চিরকাল করে এসেছি।"

"বেশ," জজসাহেবা বললেন। তিনি ফর্মটায় সই করে, স্ট্যাম্প মেরে ক্লার্কের হাতে ফেরত দিয়ে দিলেন। গোগোলকে বলা হল, অন্য সব এজেন্সিকে নাম পরিবর্তনের ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে। রেজিস্ট্রি অব মোটর ভেহিকেল্‌স, ব্যাংক, স্কুল ইত্যাদিকে জানানোর দায়িত্ব গোগোলের। সে নাম পরিবর্তনের হলফনামার তিনটি সার্টিফায়েড কপি চেয়ে নেয়, দু'টি তার নিজের জন্য। তৃতীয়টি বাবা-মার কাছে সেফ ডিপোজ়িট বক্সে থাকবে। এই আইনি রাস্তাটায় সে একা, আর নাম বদল করে বাইরে বেরোলে কেউ তার জন্য অপেক্ষা করে নেই। এত বড় মুহূর্তটাকে স্মরণীয় করার জন্য ফুল, বেলুন বা পোলারয়েড ক্যামেরা নিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না। আদতে পুরো ব্যাপারটাই আড়ম্বরবিহীন। বেরোবার সময় ঘড়ি দেখে সে বোঝে, সময়ও বিশেষ লাগেনি, কোর্টে ঢোকা থেকে বেরোনো পর্যন্ত সাকুল্যে দশ মিনিট। সে ঘামতে ঘামতে গরম দুপুরবেলায় কোর্টের বাইরে পা রাখে। তার মনে হয়, এ-সবই যেন স্বপ্ন। নদী পেরিয়ে বস্টনে ফিরে যায় সে। ব্লেজারটাকে আঙুলের সাহায্যে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে নিয়ে হেঁটে যায় কমনের উপর দিয়ে, পাবলিক গার্ডেনের ভিতর দিয়ে, সেতুর উপর দিয়ে, লেগুনের পাশের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে। আকাশজুড়ে তখন ঘন মেঘের আনাগোনা। সেই মেঘ কোথাও কোথাও ছাড়া-ছাড়াভাবে জমাট বেঁধে আছে, যেমন মানচিত্রে হ্রদ দেখানো থাকে। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ।

কোনও মোটা লোক রোগা হয়ে গেলে, কোনও বন্দি মুক্তি পেলে, তারও কি এমনই লাগে? এই যে চারপাশে এত লোক হাঁটছে, কেউ কুকুর নিয়ে হাঁটছে, কেউ স্ট্রোলারে বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছে, কেউ হাঁসকে রুটি খাওয়াচ্ছে, এদের উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয় তার, "আমি নিখিল!" নিউবারি স্ট্রিট দিয়ে হাঁটার সময় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করল। সে ছুটে নিউবারি কমিক্‌সে ঢুকে পড়ে। জন্মদিনে পাওয়া অর্থ দিয়ে *লন্ডন কলিং* আর *টকিং হেড্‌স: ৭৭* কেনে। ডর্মে লাগানোর জন্য একটা চে পোস্টারও।

তারপর ছাত্রদের আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম তুলে নেয়। তার প্রথম ক্রেডিট কার্ডের নীচে উঁচু-উঁচু অক্ষরে 'গোগোল' লেখা থাকবে না ভেবে আশ্বস্ত হয়। দোকানের ক্যাশিয়ারটি দেখতে সুন্দর। নাকে একটা নোলক পরেছে, চুল কালো রং করা, ত্বক কাগজের মতো ফ্যাকাশে। তাকে "আমি নিখিল" বলার লোভ সামলাতে পারে না সে। ক্যাশিয়ার মেয়েটি গুনে গুনে খুচরো ফেরত দেয়, তারপর নির্বিকার মুখে পরের খদ্দেরের দিকে তাকায়। তাতে খারাপ লাগে না গোগোলের। সে ভাবে, এর পর সে তার নতুন নাম নিয়ে কত মেয়ের সঙ্গেই না আলাপ করতে পারবে। কিন্তু পরের তিন সপ্তাহে একটা অসুবিধে দেখা দিল। তার নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্সে 'নিখিল' লেখা, পুরনোটাকে সে মা'র সেলাই করার কাঁচি দিয়ে কুচিকুচি করে কেটেছে। প্রিয় বইগুলোর প্রথম পাতাতে পুরনো নাম লেখা থাকলে পাতাটাই ছিঁড়ে ফেলেছে সে। অথচ একটা বড় ফাঁক থেকেই যাচ্ছে তার জীবনে। তার চেনা সকলে এখনও তাকে গোগোল বলেই ডাকে। সে জানে, বাবা-মা, তাঁদের বন্ধুবান্ধব, বন্ধুবান্ধবের ছেলেমেয়ে, পুরনো স্কুলের বন্ধুরা কেউ তাকে নিখিল বলে ডাকবে না। ছুটির সময়ে সে গোগোলই থাকবে, প্রতি বছর জন্মদিনে গোগোলের সঙ্গে তার ফিরে দেখা হবে। তার কলেজে যাওয়ার আগের পার্টিতে যারা এল, সকলেই কার্ডে লিখল, "গুডলাক, গোগোল।"

নিউ হ্যাভেনে প্রথম দিনের আগে সে নিজেকে নিখিল বলে পরিচয় দিতেই পারল না। বাবা, সোনিয়া আর চোখ-ছলছল মা বস্টনের দিকে রওনা হওয়ার পর সে নিখিল নামে আত্মপ্রকাশ করল। তাকে নতুন নামে প্রথম ডাকল স্যুইটমেটরা; ব্র্যান্ডন আর জোনাথান। এদের দু'জনকেই অবশ্য গরমের ছুটির সময়ে ডাকমারফত জানানো হয়েছিল, তাদের সঙ্গীর নাম গোগোল। ব্র্যান্ডন লম্বা, রোগা, সোনালি চুল। সে ম্যাসাচুসেটসেরই ছেলে, অ্যান্ডোভারে পড়েছে। জোনাথান কোরিয়ান, তার বাড়ি লস এঞ্জেলেস, সে চেলো বাজায়। "গোগোল তোর নাম না পদবি?" ব্র্যান্ডনের প্রশ্ন। সাধারণত, এই প্রশ্নটায় সে বিরক্ত হয়। কিন্তু এবার তার কাছে আনকোরা নতুন একটা জবাব আছে। "আসলে ওটা আমার মাঝের নাম," গোগোল ঘরের লাগোয়া কমনরুমে বসে বুঝিয়ে বলে, "আমার নাম নিখিল। ওটা কোনও কারণে বাদ পড়ে গিয়েছিল।"

জোনাথান সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। সে মন দিয়ে শোনেইনি, স্টিরিয়োর

অংশগুলো ঠিকমতো লাগাচ্ছিল। ব্র্যান্ডনও মাথা নাড়ে। তারা প্রথমে ঘরের আসবাব নিজেদের পছন্দমতো সাজায়। কিছুক্ষণ পরে ব্যান্ডন বলে, "অ্যাই নিখিল, গাঁজা খাবি?" সবকিছুই নতুন, তাই নতুন নামে পরিচিত হতে অবাক লাগছিল না গোগোলের। সে এখন নতুন স্টেটে থাকে, নতুন টেলিফোন নম্বর তার। সে কমন্‌সে বসে ট্রে-তে নিয়ে খাবার খায়। একটা গোটা তলার বাসিন্দাদের সঙ্গে বাথরুম ব্যবহার করে। ছোট্ট একটা স্টলে শাওয়ারে স্নান করে। নতুন বিছানাতে ঘুমোয়, অবশ্য এই বিছানাটা মা ঠিকঠাক করে দিয়ে গিয়েছিল।

ওরিয়েন্টেশনের দিনগুলো ক্যাম্পাসের পাথর-বাঁধানো পথ ধরে এখান থেকে ওখানে দৌড়োদৌড়ি করে কেটে গেল। ক্যাম্পাসে একটা ঘড়িঘর আছে, ইমারতগুলো পুরনো আমলের, টাওয়ারযুক্ত। প্রথমদিকে সে এতই নাকাল হয়ে থাকত যে পুরনো ক্যাম্পাসে ঘাসের উপর অন্য ছাত্রছাত্রীদের মতো বসে থাকবার সময়ই পেত না। অন্যরা সেখানে বসে কোর্সের ক্যাটালগ দেখে, উড়ন্ত চাকি নিয়ে খেলে, তামাটে-সবুজ মরচেধরা বড় বড় মানুষের স্ট্যাচুর মধ্যে বসে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করে। যে-সব জায়গায় যেতে হবে, সেগুলোকে ক্যাম্পাসের ম্যাপে গোল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে গোগোল। ঘরে একা থাকার সময় সে নতুন টাইপরাইটারে রেজিস্ট্রারকে চিঠি লিখে তার নাম পরিবর্তনের খবরটা জানায়। পুরনো আর নতুন স্বাক্ষর পাশাপাশি দিয়ে দেয়। সে এই চিঠিটা রেজিস্ট্রারের অফিসের এক সেক্রেটারিকে দেয়, সঙ্গে নাম পরিবর্তনের ফর্মের একটা কপিও দেয়। নিজের ফ্রেশম্যান কাউন্সেলরকেও ব্যাপারটা জানাতে হয়। পরিচয়পত্র আর লাইব্রেরির কার্ডে নতুন নাম করাতে হবে না? সে এ-সবই করে লুকিয়ে লুকিয়ে, জনাথান আর ব্র্যান্ডনকে জানায় না, কী নিয়ে সে সারাদিন এত ব্যস্ত। তারপর একদিন হঠাৎই নামবদল সংক্রান্ত সব কাজ ফুরিয়ে গেল। এত ছোটাছুটি করার পর হঠাৎই হাতে কোনও কাজ রইল না। যতদিনে উপরের ক্লাসের ছেলে-মেয়েরা সবাই এল, ক্লাস আরম্ভ হল, ততদিনে সারা ইউনিভার্সিটি যেন তাকে 'নিখিল' ডাকে, সে-ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছে। নিখিল প্রথম চারটে ক্লাসের জন্য নাম নথিভুক্ত করাল। হিস্ট্রি অব আর্টের ইনট্রোডাকশন, মিডিয়েভাল হিস্ট্রি, ছ'মাসের স্প্যানিশ কোর্স আর বিজ্ঞানের বিষয় পড়তেই হবে বলে অ্যাস্ট্রোনমি। শেষ মিনিটে বিকেলবেলার ড্রয়িং ক্লাসেও ভরতি হয়ে যায় সে। অবশ্য বাবা-মাকে সে ড্রয়িং ক্লাসের কথাটা

বলেনি। এই সময়ে আঁকিবুকি নিয়ে সময় কাটানোকে ওঁরা মোটেই ভাল চোখে দেখবেন না। বাজে সময় নষ্ট মনে করবেন, যদিও ওর নিজের দাদুই শিল্পী ছিলেন! সে কোনও বিষয়ে মেজর করছে না আর কোনও বিশেষ পেশাও বেছে নিচ্ছে না বলে বাবা-মা এমনিতেই চিন্তিত। ওঁদের সব বাঙালি বন্ধুদের মতো ওঁরাও চান, ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হোক, বা ডাক্তার, বা আইনজীবী, নিদেনপক্ষে অর্থনীতিবিদ। এইসব পড়েই তাঁরা আমেরিকায় আসতে পেরেছিলেন কিনা। বাবা তাকে সব সময়ে মনে করিয়ে দেন, এই পেশাগুলোই নিশ্চিন্ত জীবন আর সামাজিক শ্রদ্ধা দিতে পারে।

কিন্তু এখন সে নিখিল। সুতরাং বাবা-মার ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনার প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতেই পারে। কলেজের কাজের কাগজে নতুন নামটা টাইপ করতে করতে তার ভারী স্বস্তি হয়। তার জন্য কোনও টেলিফোন এলে স্যুইটমেটরা টুকরো কাগজে 'নিখিল'-এর জন্য মেসেজ লিখে রাখে। সে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলে, পড়ার বইতে নতুন নামটা লিখে রাখে। স্প্যানিশ ক্লাসে বলে, "মে লামো নিখিল।" নিখিলের খোলসে থাকতে থাকতেই প্রথম সেমেস্টারে সে থুতনিতে ছোট্ট দাড়ি রাখে। পার্টিতে গিয়ে ক্যামেল লাইট্‌স সিগারেট খেতে শেখে। আর পরীক্ষার ঠিক আগে ব্রায়ান ইনো, এলভিস কস্টেলো আর চার্লি পার্কারকে খুঁজে পায়। নিখিলের ভূমিকাতেই সে জোনাথানের সঙ্গে মেট্রো করে ম্যানহাটনে যায়, জাল পরিচয়পত্র জোগাড় করে যাতে নিউ হ্যাভেনের মদের দোকানে মদ পেতে পারে। নিখিল হিসেবেই এজ়রা স্টাইলসের একটা পার্টিতে সে কুমারত্ব হারায়। মেয়েটা উলের স্কার্ট পরেছিল, উঁচু বুটজুতো আর কালচে-হলুদ রঙের টাইট্‌স। ভোর তিনটে নাগাদ প্রবল হ্যাংওভার নিয়ে জেগে উঠে সে দেখল, ঘরে কেউ নেই। মেয়েটার নাম মনে নেই নিখিলের।

আসলে এ-সব কিছুর মধ্যে দিয়ে একটাই অসুবিধে হচ্ছিল তার। নিজেকে নিখিল বলে মনেই হচ্ছিল না। এখনও নয়। মুশকিল হল, যারা এখন ওকে নিখিল নামে চেনে, তারা জানেই না যে, ও কোনও সময় গোগোল ছিল। এখানকার লোকেরা তাকে শুধু বর্তমানের নিরিখেই চেনে, এখানে ওর কোনও অতীত নেই। আঠারো বছরের গোগোলের তুলনায় দু'মাসের নিখিল বড়ই তুচ্ছ। কখনও কখনও মনে হয়, ও যেন একটা নাটকে যমজ ভাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করছে। বাইরের লোকের চোখে দুটো চরিত্র একেবারেই একরকম দেখতে, কিন্তু আসলে তারা দুটো আলাদা মানুষ। ও মাঝে মাঝে

পুরনো, ফেলে আসা নামটাকে টের পায়। হঠাৎই, কোনও পূর্বাভাস ছাড়াই, সেটা মাথা তোলে। ঠিক যেমন সামনের দাঁতে ফিলিং হবার কিছুকাল পর পর্যন্ত দাঁতটা হঠাৎই অস্তিত্ব জানান দিত, কফি বা ঠান্ডা জল খাবার সময় মনে হত মাড়ি থেকে ওটা খুলে পড়ে যাবে। ওর ভয় হয়, ধরা পড়ে যাবে! পুরো নাটকটা হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়বে। দুঃস্বপ্ন দেখে সে, তার পুরনো নামটা ইয়েল ডেলি নিউজের প্রথম পাতায় ছাপা। একবার, কলেজের বইয়ের দোকানে ক্রেডিট কার্ড স্লিপে সে ভুল করে আগের নামটা সই করে ফেলে। নিখিল নামটা অনেকবার শোনার পর সে সাড়া দেয়।

এর চেয়েও বেশি গণ্ডগোল হয়, যখন যারা ওকে এতদিন গোগোল বলে ডেকে এসেছে, তারা ওকে নিখিল বলে ডাকে। শনিবার সকালে বাবা-মা ফোন করে। তখন ব্র্যান্ডন বা জোনাথান ফোন ধরলে তাঁরা বলেন, নিখিলকে ডেকে দিতে। সে-ই বাবা-মাকে বলেছে নিখিল বলতে, তবু তার অস্বস্তি হয়। মনে হয়, সে যেন তার বাবা-মার নিজের সন্তান নয়। অক্টোবরে পেরেন্টস উইকএন্ডে অসীমা আর অশোক ক্যাম্পাসে এল। খুব তাড়াতাড়ি ঘর থেকে মদের বোতল, অ্যাশট্রে আর গাঁজা সরিয়ে ফেলতে হল। “কোনও উইকএন্ডে নিখিলের সঙ্গে আমাদের বাড়ি এসো,” অসীমা রুমমেট দু’জনকে বলে। অসীমার মুখে ‘নিখিল’ নামটা অচেনা শোনায়। ঠিক হলেও মনে হয় বেসুরো। বাবা-মা বাংলার বদলে গোগোলের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বললে যেমন শোনায়, তেমনই আর কী! আরও অদ্ভুত লাগল যখন বাবা রুমমেটদের সামনে তাকে বলল, “নিখিল, তোমার ক্লাস কোথায় হয় আমাদের দেখালে না তো?” সেই সন্ধেয় জোনাথানের সঙ্গে চ্যাপেল স্ট্রিটের এক রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে অসীমা ভুল করে বসল। জিজ্ঞেস করে ফেলল, “গোগোল, তোমার মেজর কোন বিষয়ে করছ, ঠিক করেছ কিছু?” জোনাথান অবশ্য শুনতে পায়নি। সে বাবার দিকে তাকিয়ে কথাবার্তা বলছিল। তবু গোগোলের অসহায় লাগে, বিরক্ত লাগে। মাকে কিছুই বলতে পারে না ও। কেন-না এই গোলমালটা তো সে নিজেই পাকিয়েছে।

প্রথম সেমেস্টার চলাকালীন গোগোল প্রতি শনি-রবিবার নিয়ম করে বাধ্য ছেলের মতো বাড়ি যেত। শুক্রবার ক্লাস শেষ হওয়ার পরে রওনা হত সে। আমট্র্যাক ধরে বস্টনে পৌঁছে সাধারণ রেলগাড়িতে বাড়ির দিকে যেত। সঙ্গে ব্যাগভরতি পড়ার বই আর ময়লা জামাকাপড়। আড়াই ঘণ্টার রাস্তায় নিখিল উবে যায়, গোগোল এসে জীবনের দখল নেয়। বাবা স্টেশনে তাকে নিতে

আসে, আর প্রত্যেকবারই আগে-আগে ফোন করে জেনে নেয় ট্রেন ঠিক সময় এসেছে কি না। দু'জনে একসঙ্গে গাড়িতে করে শহরের চেনা, গাছ-ঢাকা রাস্তা দিয়ে ফেরে। বাবা জিজ্ঞেস করে পড়াশোনা কেমন চলছে। শুক্রবার রাত থেকে রোববার রাতের মধ্যে ময়লা কাপড় কাচা হয়ে যায় বটে, তবে পড়ার বইগুলো পড়েই থাকে। পড়ার ইচ্ছে তার থাকে না তা নয়, কিন্তু বাবা-মায়ের বাড়িতে গোগোলের খাওয়া আর ঘুমোনো ছাড়া কিছু করে ওঠা হয় না। পুরনো পড়ার টেবিলটা কেমন যেন ছোট ছোট ঠেকে। টেলিফোন বাজলে তার মন বিক্ষিপ্ত হয়, বাবা-মা বা সোনিয়ার হাঁটাচলা বা কথা বলার শব্দ অসহ্য মনে হয়। ডিনারের পর যেখানে সে পড়ে সেই স্টারলিং লাইব্রেরির জন্য তার মন কেমন করে। কলেজের রাতের জীবন তাকে ডাকতে থাকে। ফারনামে তাদের স্যুইটটার কথা মনে হয়। ব্র্যান্ডনের আনা সিগারেটে টান দিতে দিতে জোনাথানের সঙ্গে গান শোনা, কীভাবে ধ্রুপদী কম্পোজারদের আলাদা করে চিনতে হয় তা শেখা...

বাড়িতে সে এমটিভি দেখে। পাশে সোনিয়া নিজের জিন্‌সের উপর কারিকুরি করে, পায়ের নীচের অংশটা কয়েক ইঞ্চি কেটে ফেলে তাতে চেন লাগায়। এক শনিবার ওয়াশিং মেশিন ফাঁকাই পাওয়া গেল না, কারণ সোনিয়া তার গাদাগাদা জামাকাপড় কালো রঙে ডাই করছে। সে এখন হাইস্কুলে, মি. লসন ওদেরও ইংরেজি পড়ান। সে বহু এমন নাচের পার্টিতে যায় যেখানে ছেলে-মেয়ে সকলেরই অবাধ গতি। সে-সব জায়গায় গোগোল কখনও যায়নি। এখন তার দাঁতে ব্রেস নেই। সোনিয়া আত্মবিশ্বাসী এক আমেরিকান হাসির মালিক। আগে তার চুল ছিল কাঁধ পর্যন্ত। কিছুদিন আগে এক বন্ধু তা কেটে কুচিয়ে দিয়েছে, এ-ছাঁটের নাম নাকি অ্যাসিমেট্রিকাল। অসীমার আতঙ্ক, মেয়ে যদি হঠাৎ একদিন চুলে সোনালি স্ট্রিক করে বাড়ি ফেরে! সোনিয়া অনেকবার তেমন হুমকি দিয়েছে কিনা। আর ভয়, যদি সে কানে আরও কয়েকটা ফুটো করিয়ে নেয়। এ-সব নিয়ে প্রায়ই মা-মেয়েতে কথা কাটাকাটি হয়। অসীমা কান্নাকাটি করতে থাকে, সোনিয়া দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয়। কোনও কোনও সন্ধেবেলা অসীমা আর অশোক পার্টিতে যায়, সোনিয়া আর গোগোলকেও যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে। পার্টিতে গেলে সে-বাড়ির মালিক বা মালকিন গোগোলকে এমন একটা ফাঁকা ঘর দেখিয়ে দেন যেখানে সে নির্বিঘ্নে পড়াশোনা করতে পারে। কিন্তু শেষ অবধি গোগোলকে দেখা যায়, অন্য ছেলে-মেয়ে আর সোনিয়ার সঙ্গে বসে টিভি দেখছে, যেমনটি

সারাজীবন করে এসেছে। একবার একসঙ্গে পার্টি থেকে ফেরার পথে গোগোল বাবা-মাকে বলেছিল, "আমার বয়স আঠারো।" অবশ্য এ তথ্যে অশোক-অসীমার কিছুই আসে-যায় না। একবার সে ভুল করে নিউ হ্যাভেনে তার ঘরটাকে 'বাড়ি' বলে ফেলেছিল। একটা জিনিস আনতে ভুলে গিয়েছিল বলে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, "ওটা বাড়িতে ফেলে এসেছি।" অসীমা রাগে ফেটে পড়েছিল, "মাত্র তিনমাস হয়েছে, আর কথা শোনো ছেলের! আমেরিকায় কুড়ি বছর হয়ে গেল আমার, তবু পেম্বারটন রোডকে তো বাড়ি মনে হয় না আমার।"

কিন্তু এখন ইয়েলে নিজের ঘরটাতে থাকতেই গোগোলের সবচেয়ে আরাম লাগে। ঘরটার পুরাতনী সৌন্দর্য ভাল লাগে। ওর আগে কত ছাত্র এ-ঘরে থেকে গিয়েছে, ভাবতেও কেমন ভাল লাগে তার। দাগধরা শক্ত প্লাস্টারের দেওয়াল আর কালচে কাঠের মেঝে ভাল লাগে। সকালে চোখ খুললে সামনের জানালার মধ্যে দিয়ে ব্যাটেল চ্যাপেল দেখতে পাওয়া ভাল লাগে। ক্যাম্পাসের গথিক স্থাপত্যও দুর্দান্ত লাগে তার। আশ্চর্য লাগে, কীভাবে এই সৌন্দর্য তাকে ঘিরে আছে আর তার মধ্যে চারিয়ে দিচ্ছে নিজের শিকড়, যেভাবে পেম্বারটন রোড কোনওদিন পারেনি। আঁকার ক্লাসে তাকে প্রতি সপ্তাহে আধ ডজন স্কেচ জমা দিতে হয়। সে ইমারতগুলো আঁকতেই বেশি পছন্দ করে, সব ছোটখাট সূক্ষ্ম কাজও মন দিয়ে আঁকে: বেরিয়ে থাকা আলম্ব, কোনাচে তোরণওয়ালা দরজার উপর ঢেউখেলানো কারুকাজ, হালকা গোলাপি পাথরের চৌকোনা থাম। স্প্রিং সেমেস্টারে সে আর্কিটেকচারের ইনট্রোডাক্টরি ক্লাসে ভরতি হল। পড়ল কীভাবে তৈরি হত পিরামিড, গ্রিক গির্জা, মধ্যযুগীয় উপাসনালয়। বইতে প্রাসাদ আর গির্জার প্ল্যানের ছবি দেখতে শিখল। অনেক নতুন শব্দ শিখল, পুরনো স্থাপত্যরীতির সঙ্গে যুক্ত শব্দের মানে জানল। সে-সব শব্দগুলো আলাদা-আলাদা ইনডেক্স কার্ডে লিখে তার পিছনে ছবি এঁকে রাখতে শিখল: এনটাব্লেচার, টিমপ্যানাম, আরকিট্রেভ, ভুসোয়ার। একসঙ্গে এই শব্দগুলো যেন নতুন এক ভাষার জন্ম দিল তার মনে, এমন ভাষা যাকে সে কাছ থেকে জানতে চায়। ইনডেক্স কার্ডগুলো সে জুতোর বাক্সে গুছিয়ে রাখল, পরীক্ষার আগে বারবার পড়ল। যা দরকার, তার চেয়ে বেশি শব্দের অর্থ মুখস্থ করে ফেলল। বাক্সটা সে পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও রেখে দিল, খালি সময়ে তাতে আরও নতুন-নতুন শব্দ যোগ করত।

সোফোমোর দ্বিতীয় বছরের অটামে সে ইউনিয়ন স্টেশন থেকে একটা বেশিরকম ভিড় ট্রেনে উঠে পড়ল। সেটা থ্যাংকসগিভিংয়ের আগের বুধবার। ডাফেল ব্যাগভরতি রেনেসাঁস আর্কিটেকচারের বই নিয়ে সে কামরাগুলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেল। সামনের পাঁচদিনে তাকে এই বিষয়ের উপর একটা পেপার লিখতে হবে। ভেস্টিবিউলের পথের উপর বহু যাত্রী নিজেদের মালপত্রের উপর বসে আছে। কনডাক্টর চেঁচিয়ে বলল, "শুধু দাঁড়ানোর জায়গা আছে।" একজন উত্তর দিল, "টাকা ফেরত চাই!" গোগোল এক কামরা থেকে অন্য কামরায় হেঁটে যায়। একটা মোটামুটি ফাঁকা ভেস্টিবিউল খোঁজে, যাতে একটু বসা যায়। ট্রেনের শেষ কামরাটায় সে একটা খালি সিট দেখতে পেল। একটি মেয়ে জানালার ধারে বসে আছে, হাতে ভাঁজকরা *দ্য নিউ ইয়র্কার* নিয়ে। তার পাশের সিটটায় চকোলেট রঙের সুয়েড কোট ভাঁজ করে রাখা। ওটা দেখেই গোগোলের আগের যাত্রীটি এগিয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু গোগোলের কেমন যেন মনে হল, কোটটা মেয়েটিরই। গোগোল থেমে গিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, "কোটটা কি আপনার?"

মেয়েটি তার পাতলা, ছিপছিপে শরীরটা একঝটকায় সরিয়ে কোটটা নিজের উরুর তলায় ঢুকিয়ে নিল। মেয়েটির মুখ গোগোলের চেনা, ক্যাম্পাসে দেখা হয়েছে অনেকবার। হয়তো ক্লাসে যাওয়ার পথে, কোনও করিডোরে...। গোগোলের মনে পড়ল, ফ্রেশম্যান ইয়ারেই মেয়েটার চুল ক্র্যানবেরি লাল রঙে রাঙানো ছিল, চিবুক ঘিরে কাটা। এখন তা কাঁধ পর্যন্ত লম্বা হয়েছে, আর এখন যে রং আছে সেটাই হয়তো চুলের আসল রং। অল্প সোনালির ছোঁয়া দেওয়া খয়েরি। সিঁথিটা মাঝখানে নয়, একটু পাশে আর সিঁথির শুরুটা বাঁকা। চুলের রঙের চেয়ে ভুরুর রং ঘন, তাতে মিশুকে মুখটাও গম্ভীর দেখাচ্ছে। তার পরনে সুন্দর একটা ফেডেড জিন্স, খয়েরি চামড়ার বুটজুতোতে হলুদ ফিতে বাঁধা, জুতোর সোলটাও বেশ মোটা। অবশ্য ছাই রঙের সোয়েটারটা তার পক্ষে একটু বেশিই বড়, হাতাদুটো বেশি নেমে রয়েছে। বাইরে থেকে দেখে বোঝা যাচ্ছে, জিন্সের সামনের পকেটে পুরুষদের মানিব্যাগ রাখা।

"হাই, আমি রুথ," মেয়েটা বলল। বোধহয় তাকে চিনতে পেরেছে।

"আমি নিখিল।"

গোগোল বসে পড়ল। বিরাট ব্যাগটা উপরের মালপত্র রাখার জায়গায় তুলল না। বড্ড ক্লান্ত লাগছে। সেটা সিটের নীচে ঢুকিয়ে দিল। তার ফলে

লম্বা পা-দু'টো বেঁকে রইল বটে। বেশ গরম, ঘামও হচ্ছে। সে নীল জ্যাকেটটার চেন খুলল। হাতের আঙুলগুলো এতক্ষণ ধরে ব্যাগটা বইবার ফলে ব্যথা করছে, চামড়ায় ব্যাগের স্ট্র্যাপের নকশার ছাপ পড়ে গিয়েছে। সে আঙুলগুলো ম্যাসাজ করতে লাগল।

ওকে দেখতে দেখতে রুথ বলল, "সরি, আমি বোকার মতো অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটাকে এড়ানোর চেষ্টা করছিলাম।"

বসে বসেই সে জ্যাকেটটা খুলে ফেলল, বলল, "তার মানে?"

"আমি চেষ্টা করছিলাম যাতে আমার পাশে কেউ না বসে। তাই কোটটা এমনভাবে দিয়ে রেখেছিলাম যেন কারও জায়গা আছে।"

"দারুণ করেছিলে কিন্তু। যেমন আমি মাঝে মাঝে ঘুমোবার ভান করি, আমি ঘুমোবার ভান করলে আমার পাশে কেউ বসতে চায় না।"

মেয়েটি নিচু স্বরে হাসল। একগুছি চুল কানের পিছনে ঠেলে দিল। তার সৌন্দর্যে কোনও ভান নেই। খোলামেলা, চোখে লাগে না। ঠোঁটে গ্লস ছাড়া সারা মুখে কোনও মেকআপ নেই। গায়ের উজ্জ্বল রং নিখুঁত, তার থেকে নজর সরিয়ে নেয় ডান গালের হাড়ের উপর দু'টো খয়েরি আঁচিল। হাত দুটো পাতলা, ছোট ছোট। নখে নেলপালিশ নেই, পাশের ত্বকও এবড়োখেবড়ো। মেয়েটি নিচু হয়ে পায়ের কাছে রাখা ব্যাগে পত্রিকাটা ঢুকিয়ে রাখল, বের করল একটা বই। গোগোল জিন্‌সের উপরে ওর কোমরের একঝলক দেখতে পেল।

জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি বস্টনে যাচ্ছে?"

"মেন। আমার বাবা সেখানে থাকেন। সাউথ স্টেশনে নেমে বাস ধরতে হবে। তারপর আরও চার ঘণ্টা। তোমার কোন কলেজ?"

"জে. ই.।"

মেয়েটি বলল, সে পড়ে সিলিমানে। ইংরেজিতে মেজর করবে। কলেজের কথা বলতে ওরা আবিষ্কার করল, গত স্প্রিং সেমেস্টারে দু'জনেই সাইকোলজি ১১০ নিয়েছিল। যে বইটা রুথ পড়বে বলে বের করেছিল, সেটা টিমন অব এথেন্সের একটা পেপারব্যাক কপি। সারা রাস্তা সে বইটার মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে পাতায় মার্কা দিয়ে রাখল বটে, তবে পড়ল না এক পাতাও। গোগোলও অবশ্য পারস্পেকটিভ বিষয়ক যে বইটা ব্যাগ থেকে বের করেছিল, সেটা খুলেও দেখেনি। রুথ বলল, ভারমন্টে একটা কমিউনে সে বড় হয়েছে। তার বাবা-মা হিপি, সাত ক্লাস পর্যন্ত সে বাড়িতেই পড়েছে।

বাবা-মায়ের এখন ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। বাবা তাঁর নতুন স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন, একটা ফার্মে লামা পালন করেন। মা অ্যানথ্রোপলজিস্ট, থাইল্যান্ডের দাইমাদের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে সেখানে গিয়েছেন।

সত্যি কারও বাবা-মা এমন হতে পারে? এমন পরিস্থিতিতে কীভাবে বড় হয় মানুষ? গোগোল এ-সব কল্পনাও করতে পারে না। নিজের জন্ম, বেড়ে ওঠার কথা বলতে গিয়ে তার মনে হয়, রুথের তুলনায় তার জীবন কী সাদামাঠা! কিন্তু রুথ আগ্রহ দেখায়, জানতে চায় কলকাতার কথা। তার বাবা-মা একবার ভারতে গিয়েছিল, তার জন্মের আগে। কোনও একটা আশ্রমে। সে জিজ্ঞেস করে সেখানকার রাস্তাঘাট কেমন, বাড়িগুলো কেমন। বোঝাতে গিয়ে গোগোলের বইটার পিছনের খালি পাতাটা ভরে ওঠে। সে রুথকে এঁকে দেখায় তার ঠাকুরদার বাড়ির প্ল্যান, কোথায় বারান্দা আর কোথায় কোথায় ঘর, টেরাজো ফ্লোর। চুনকাম করা নীল দেওয়াল, সরু পাথরলাগানো রান্নাঘর, বসার ঘরে বেতের আসবাব, যেমন বাগানে থাকে— সব খুলে বলল গোগোল। সে আত্মবিশ্বাস নিয়ে আঁকে, ভাগ্যিস এবারের ড্রাফটিং কোর্সটা করেছিল। এঁকে দেখায় কোন ঘরে বোনকে নিয়ে সে ঘুমিয়েছিল, এঁকে দেখায় ছোট্ট এঁদো গলিটা, তাতে লাইন দিয়ে টিনের ছাতওয়ালা দোকান। সব আঁকা হয়ে গেলে রুথ তার হাত থেকে বইটা নেয়। আঙুল বুলিয়ে যায় দাগগুলোর উপরে। বলে, "আমি ওখানে যেতে চাই," আর সঙ্গে সঙ্গে গোগোলের চোখে ভেসে ওঠে একটা ছবি। রুথের পিঠে ব্যাকপ্যাক, মুখ আর হাত রোদে তামাটে, চৌরঙ্গি রোড ধরে হাঁটছে, নিউ মার্কেটে জিনিস কিনছে, গ্র্যান্ড হোটেলে থাকছে। ঠিক যেমন অন্য বিদেশি পর্যটকরা করে।

ওদের বকবক শুনে সামনের সিটের মহিলা বিরক্ত হয়ে বললেন, তিনি ঘুমোতে চান। এতে কথা তো থামলই না, বরং ওরা ফিসফিস করে আরও কথা বলতে লাগল, পরস্পরের দিকে ঝুঁকে পড়ে, মাথায় মাথা ঠেকিয়ে। গোগোল জানে না কোন স্টেশন যাচ্ছে, তারা কোথায় আছে। ট্রেন একটা ব্রিজের উপর দিয়ে গুমগুম আওয়াজ করে গড়িয়ে গেল, অস্তগামী সূর্যকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। গোলাপি আভায় সেজে উঠছে জলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলো। আবার কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই গোলাপি রং ফিকে হয়ে এল, ধূসর হয়ে গেল চারদিক। ঠিক যেমন সন্ধে নামার আগে হয়। রাত হলে তারা জানালার কাচে নিজেদের প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছিল। কথা বলতে বলতে গলা শুকিয়ে উঠেছে দু'জনের। গোগোল বলল, কাফে-কারে

যাবে। রুথ বলল, তার জন্য এক ঠোঙা পোট্যাটো চিপস আনতে আর একটা দুধ দেওয়া চা। সে অবশ্য পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করার কোনও চেষ্টা করে না। সেটা গোগোলের ভালই লাগে। সে নিজের জন্য কফি, রুথের জন্যে চিপ্‌স আর চা নিয়ে ফিরে এল। সঙ্গে দুধের কাপ। সাধারণভাবে ক্রিমের কৌটো দেওয়া হয় বটে, কিন্তু সে বিশেষভাবে দুধ চেয়ে এনেছে। তারা ফের কথা বলতে থাকে। রুথ চিপ্‌স খায়, মুখের চারপাশে লেগে থাকা নুনের গুঁড়ো হাতের পেছন দিয়ে ঝেড়ে ফেলে। গোগোলকেও চিপ্‌স দেয় সে, প্যাকেট থেকে একটা-একটা করে টেনে বের করে হাতে তুলে দেয়। খেতে খেতে ভারতে ট্রেনের খাবারের গল্প বলে গোগোল। ট্রেনে দিল্লি আর আগ্রা যাওয়ার সময়ে তারা কীভাবে চাপাটি আর টক ডাল অর্ডার দিয়েছিল। এক স্টেশনে অর্ডার নেয় আর পরের স্টেশনে গরম-গরম খাবার দিয়ে যায়। সকালবেলা মোটা মোটা ভেজিটেবল কাটলেট নিয়ে আসে, সঙ্গে পাউরুটি আর মাখন। ভারতে চা বিক্রি করে প্ল্যাটফর্মের বিক্রেতারা। বিশাল অ্যালুমিনিয়ামের কেটলি থেকে দুধ-চিনি মেশানো চা ঢেলে দেওয়া হয়, এবড়োখেবড়ো মাটির ভাঁড়ে সেই চা জানালার গরাদের মধ্যে দিয়ে নিতে হয়। ভাঁড়গুলো পরে রেললাইনে ছুড়ে ফেলে দিলেই হল। রুথ এ-সব খুঁটিনাটি শুনে খুশি হয়। গোগোল ভাবে, ভারতের অভিজ্ঞতা নিয়ে এর আগে কোনও আমেরিকান বন্ধুর সঙ্গে সে তো আলোচনা করেনি!

হঠাৎই চলে আসে বিদায় জানানোর সময়। শেষ মুহূর্তে সাহস জুটিয়ে রুথের ফোন নম্বর চেয়েই বসে গোগোল। কলকাতার ছবি যে-পাতায় এঁকেছিল, সে-পাতাতেই লিখে ফেলে নম্বরটা। ইস, যদি মেন স্টেশনে নেমে রুথের সঙ্গে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে পারত। কিন্তু তার নিজেকেই একটা অন্য ট্রেন ধরতে হবে। ছুটির দিনগুলো ফুরোতে চায় না সেবার। গোগোল খালি ভাবে, কতক্ষণে নিউ হ্যাভেনে ফিরে গিয়ে রুথকে ফোন করবে। ভাবে, কতবার তারা দু'জনে পরস্পরের পাশ দিয়ে যাতায়াত করেছে, হয়তো কমন্‌সে একসঙ্গে খেয়েছেও। সাইকোলজির ক্লাসটার কথা মনে করে গোগোল। রুথের কোনও ছবিই কি তার মনে পড়তে পারে না? যেমন, ঘরের ওদিকের কোনও চেয়ারে বসে রুথ নোট নিচ্ছে, মাথাটা ঝুঁকে আছে টেবিলের উপর? সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে ট্রেনের সময়টা। কতক্ষণে আবার ওই রকম কাছাকাছি বসবে তারা? মনে পড়ে, কামরার গরমে তাদের ঘেমো মুখ দুটো, আড়-না-ভাঙা শরীর, কামরার ভিতরের হলদে আলোয়

ওর চুল চকচক করছে। ফেরার পথে ওকে খোঁজে সে। প্রত্যেকটা কামরা তন্নতন্ন করে দেখে। কিন্তু রুথ কোথায়? শেষ পর্যন্ত এক বয়স্কা সন্ন্যাসিনীর পাশে বসতে হয় ওকে, তাঁর পরনে খয়েরি পোশাক আর নাকের নীচে সাদা লোম। তিনি সারা রাস্তা ভোঁসভোঁস করে ঘুমোলেন।

তার পরের সপ্তাহে, ইয়েলে, রুথ ওর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হল। ঠিক হল, ওরা 'অ্যাটিকাস' নামের বইয়ের দোকানে কফি খাবে। রুথ কয়েক মিনিট দেরি করেই এল। ওর পরনে সেই প্রথম দিনের পোশাক, সেই জিন্‌স আর বুটজুতো আর চকোলেট রঙের সোয়েড কোট। এবারও সে বলল, কফি নয়, চা খাবে। কিন্তু গোগোলের এই প্রথম অস্বস্তি হতে থাকল। এ-রকম ট্রেনে হয়নি। কফিশপটা যেন ভিড়ে ভরতি, লোকে বড্ড কথা বলছে, ওদের দু'জনের মাঝের টেবিলটা বাড়াবাড়ি রকমের চওড়া। রুথও আগের বারের চেয়ে বেশি চুপচাপ। চোখ নামিয়ে কাপের দিকে চেয়ে আছে, চিনির প্যাকেটগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেওয়ালের গায়ে বইয়ের র‍্যাকগুলোর দিকে তাকাচ্ছে। তবে এ-সময়টা কিছুক্ষণের মধ্যে কেটে গেল। ওরা আবার আগের মতো সহজভাবে কথা বলতে শুরু করে দিল। নিজের-নিজের ছুটি কাটানোর গল্প করতে লাগল ওরা। গোগোল রুথকে বলল, কেমন করে সে আর সোনিয়া পেম্বারটন রোডের রান্নাঘরটা পুরো একদিন দখল করে রেখে টার্কি স্টাফিং করেছে আর পাই তৈরির ময়দা মেখেছে। এ-কাজগুলো অসীমা করতে পছন্দ করে না। "আমি ফেরার পথে তোমাকে খুঁজেছিলাম," শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে ফেলল গোগোল, বলল সেই সন্ন্যাসিনীর নাক ডাকার কথাও। পরে ওরা দু'জন সেন্টার ফর ব্রিটিশ আর্টের মধ্যে দিয়ে হেঁটে একটা প্রদর্শনী দেখতে গেল। রুথকে হস্টেলে পৌঁছে দিল সে, আর ফের দেখা করার দিনটাও ঠিক করে ফেলল। গুডনাইট বলার পরও কিছুক্ষণ গেটের পাশে দাঁড়িয়ে রইল রুথ। বইগুলো বুকের কাছে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। গোগোল ভাবছিল, ওকে চুমু খাবে কি না। আসলে গত কয়েক ঘণ্টা ধরেই এই ইচ্ছেটা ওর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। তবে রুথ কি ওকে শুধু বন্ধু বলেই ভাবে? শেষে রুথ এক পা-এক পা করে হস্টেলের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। বেশ কয়েক পা ওইভাবে হাঁটতে হল ওকে। দরজার কাছে পৌঁছে শেষবারের মতো হাত নেড়ে ভিতরে চলে গেল।

ক্লাসের পর প্রায়ই দেখা হতে লাগল ওদের। রুথের রুটিনটা ইতিমধ্যে

মুখস্থ করে ফেলেছে গোগোল। যেখান দিয়ে রুথের যাওয়ার কথা, তার কাছাকাছি দেওয়ালের আড়ালে বা দরজার নীচে দাঁড়িয়ে থাকে সে। যেন, কোনও কাজে এসেছে। রুথ অবশ্য ওকে দেখে খুশিই হয়। বান্ধবীদের দল থেকে বেরিয়ে এসে হ্যালো বলে। "ও তোকে নিশ্চয়ই পছন্দ করে," জোনাথান রুথের সঙ্গে সময় কাটানোর বিস্তারিত বর্ণনা শুনতে শুনতে একদিন গোগোলকে বলল। কয়েকদিন পরে গোগোল রুথের সঙ্গে ওর হস্টেলে গেল। একটা বই আনতে ভুলে গিয়েছিল রুথ। দরজা খোলার সময় রুথের হাতের উপর হাত পড়ে গেল ওর। ওর রুমমেটরা কেউ ঘরে নেই। গোগোল কমনরুমের সোফায় বসে অপেক্ষা করছিল, কখন ও বই নিয়ে আসে। তখন দুপুরবেলা। দিনটা মেঘলা, ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। রুথ ঘরে ঢুকে বলল, "পেয়েছি।" দুজনেরই ক্লাস ছিল সেদিন, তাও ওরা কেউই শেষ পর্যন্ত ক্লাসে গেল না। সোফাতে বসে অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেতে লাগল। শেষে এত দেরি হয়ে গেল, সেদিন আর যাওয়াই হল না কলেজে।

প্রতি সন্ধেবেলায় তারা একসঙ্গে লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করে । দু'জনে বসে টেবিলের দু'প্রান্তে, যাতে ফিসফিস করা আটকানো যায়। একে অপরের ডাইনিং হলে খেতে যায়। স্কাল্পচার গার্ডেনে বেড়াতে যায়। রুথের কথা সারাক্ষণ মনে পড়ে গোগোলের। ড্রাফটিং ক্লাসের তেরছা বোর্ডটার উপর নুয়ে কাজ করার সময়, স্টুডিয়োর জোরালো, সাদা আলোর নীচে, প্রজেক্টরের ছবি স্ক্রিনে দেখার সময়ও। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সেমেস্টারের শেষটা ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। সামনেই পরীক্ষা। নোট আর হাজার-হাজার পাতা পড়া নিয়ে দু'জনেরই নাকাল অবস্থা। কিন্তু পরীক্ষার প্রস্তুতির চাইতেও গোগোলের সমস্যা বেশি হচ্ছে এই ভেবে যে, রুথের সঙ্গে সামনের শীতের ছুটিতে দেখা হবে না। সেদিন শনিবার, লাইব্রেরিতে রুথ জানাল, সারাদিন তার দুই রুমমেটের কেউই ঘরে থাকবে না। তারা একসঙ্গে ক্যাম্পাস দিয়ে হেঁটে মেয়েদের হস্টেলে ফিরে গেল। রুথের ঘরে অগোছালো খাটের উপর বসল গোগোল। ঘরের ভিতরের গন্ধ রুথের গায়ের গন্ধের মতোই। পারফিউমের উগ্রতা নেই তাতে, পাউডারের সুবাসের মতো মৃদু ফুলেল সুগন্ধ। ডেস্কের পাশে অস্কার ওয়াইল্ড আর ভার্জিনিয়া উলফের ছবি সাঁটা। বাইরে ভীষণ ঠান্ডা, ওদের মুখ আর ঠোঁট যেন হিমে জমে আছে। প্রথম-প্রথম দু'জনেই কোট পরে বসে রইল। তারপর রুথের কোট বিছিয়ে তার উপর পাশাপাশি শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। রুথ আস্তে-আস্তে গোগোলের হাতটা ধরল,

নিজের মোটা সোয়েটারের নীচে ঢুকিয়ে দিল সেটা। যেন কোনও গোপন পথ দেখাচ্ছে নতুন মানুষকে। প্রথমবার এমন অভিজ্ঞতা হয়নি গোগোলের। সেবার কী হয়েছিল, তা স্পষ্ট মনেই পড়ে না। শুধু মনে আছে ভারী স্বস্তি হয়েছিল। ভেবেছিল, যাক, আর 'আনাড়ি' হয়ে থাকতে হবে না।

কিন্তু এবার পুরোটাই অন্য রকম। প্রতিটা মুহূর্ত অনুভব করছে সে। রুথের তলপেটের উষ্ণ গভীরতা, বালিশের উপর ছড়িয়ে থাকা ঘন চুল, শুয়ে থাকা অবস্থায় রুথকে কেমন অন্য রকম দেখায়... সব বুঝতে পারছে। সে আঙুল দিয়ে ওর স্তন স্পর্শ করে। দেখে, ছোট ছোট স্তন দুটো কেমন দূরে দূরে সরে আছে, একটা ফ্যাকাশে বোঁটা অন্যটার চেয়ে সামান্য বড়। ওর ছোঁয়ায় ডুবে যেতে যেতে রুথ বলে ওঠে, "নিখিল, তুমি দারুণ..."। ওর বুকে চুমু খায় গোগোল, পেটে ছড়িয়ে থাকা আঁচিলে ঠোঁট ছোঁয়ায়। রুথ আশ্লেষে শরীর বাঁকিয়ে দেয়। মাথা আর কাঁধে ওর হাত দুটো টের পায় গোগোল। তারপর রুথ মুখটা দু'পায়ের ফাঁকে এগিয়ে দেয়। জিভে রুথের স্বাদ আর নাকে নতুন গন্ধ নিতে নিতেও গোগোলের নিজেকে বড্ড আনাড়ি ঠেকে, অনভিজ্ঞ মনে হয়। কিন্তু শুনতে পায়, ও ফিসফিস করে তাকেই ডাকছে, বলছে ভাললাগার কথাই। অবশ্য রুথ জানে কী করতে হবে। একসময় উঠে দাঁড়িয়ে ও গোগোলের জিন্‌সটা খুলে দেয়। ড্রয়ার থেকে বের করে আনে ডায়াঁমের বাক্স।

এক সপ্তাহ পরের কথা। বাড়ি ফিরে এসেছে গোগোল। সোনিয়া আর মাকে ক্রিসমাস ট্রি সাজাতে সাহায্য করেছে। বাবার সঙ্গে বেলচা দিয়ে ড্রাইভওয়েতে জমে থাকা বরফ সরাচ্ছে। শেষ মুহূর্তে শপিং মলে গিয়ে উপহার কিনে আনছে। কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পায় না সে। ঠান্ডা লাগার ভান করে সে আলাদা থাকার চেষ্টা করেছে আর ভাবে, ক্রিসমাসের পর বাড়ির গাড়িটা ধার করে মেনে গিয়ে যদি রুথের সঙ্গে দেখা করা যেত! বা যদি রুথ আসত এখানে? রুথ বলেই দিয়েছে, সে গিয়ে পড়লে কোনও সমস্যা নেই। ওর বাবা আর সৎমা কিচ্ছু মনে করবেন না। ওকে গেস্টরুমে শুতে দেওয়া হবে; রাতে রুথ টুক করে ওর বিছানায় ঢুকে পড়তে পারবে। গোগোল কল্পনা করে, রুথদের ফার্মহাউসটা কেমন হবে। রুথের বর্ণনামতো সকালে স্কিলেটে ডিম ভেজে খাওয়া হবে? রুথের সঙ্গে সে হাঁটতে যাবে ফাঁকা, বরফঢাকা মাঠে? কিন্তু সেখানে যেতে হলে প্রথমে মা-বাবাকে রুথের কথা বলতে হবে যে! সেটা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই গোগোলের। বললেই বাবা-মা বিরাট

প্রশ্নের ঝাঁপি খুলে বসবে। ওদের অবাক হওয়া, ঘাবড়ে যাওয়া, হতাশ হওয়া, রুথের বাবা-মা কী করেন বা সম্পর্কটা কতটা সিরিয়াস সে-বিষয়ে ওদের প্রশ্ন— এ-সবের জন্য গোগোলের ধৈর্য নেই। রুথকে দেখতে যতই ইচ্ছে করুক, এই পেম্বারটন রোডের রান্নাঘরে তাকে কল্পনা করতে পারে না গোগোল। জিন্‌স আর মোটা সোয়েটার পরে এখানে বসে মায়ের দেওয়া খাবার ভদ্রতাবশত খাচ্ছে রুথ, এটা কেমন অসম্ভব *ঠেকে*। যে-বাড়িতে সে এখনও গোগোল, সেখানে রুথকে কল্পনা করতে চায়ও না সে।

রাতে রান্নাঘরে ঢুকে রুথের সঙ্গে ফোনে কথা বলে গোগোল। তখন বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে। বিল অবশ্য সে কলেজের টেলিফোনে চার্জ করিয়ে দেয়। একদিন ওরা বস্টনে দেখা করে দিনটা একসঙ্গে হার্ভার্ড স্কোয়্যারে কাটাবে ঠিক করল। সেদিন মাটির উপর বরফের এক ফুট পুরু আস্তরণ, আকাশটা তীব্র নীল। প্রথমে একটা সিনেমা দেখল ওরা। বেশি বাছাবাছিতে না গিয়ে হলে ঢুকে যে সিনেমা শুরু হতে চলেছে, সেটার টিকিট কেটে নিল। ব্যালকনির শেষ রোতে বসল ওরা। আর সারাটা সময় চুমু খেয়ে গেল। হলের লোকজন পিছনে তাকিয়ে হাঁ করে দেখছিল ওদের। কাফে পাম্পালোনায় হ্যাম স্যান্ডউইচ আর গারলিক সুপ দিয়ে দুপুরের খাওয়া সারা হল। উপহার দেওয়া-নেওয়াও হল। রুথ দিল গোয়ার ছবির একটা ছোট বই। গোগোল দিল নীল দস্তানা আর ওর নিজের প্রিয় বিট্‌লদের গানের টেপ। কাফের উপর একটা দোকানে শুধুই আর্কিটেকচারের বই বিক্রি হয় দেখে দু'জনেই অবাক। সেই দোকানের শেলফ ঘাঁটতে ঘাঁটতে গোগোল ল্য করবুজ়িয়েরের লেখা *জার্নি টু দ্য ইস্ট* বইটার পেপারব্যাক কপি কিনে ফেলল। সে ভেবে রেখেছে, সামনের স্প্রিং-এ সে আর্কিটেকচারে মেজর করবে। তারপর দু'জনে হাত ধরে ঘুরতে লাগল। কোনও বাড়ির দেওয়ালে হেলান দিয়ে চুমু খেল, হাঁটল সে-সব রাস্তা দিয়ে, যেখানে শিশু অবস্থায় গোগোলকে স্ট্রোলারে করে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হত। রুথকে তার ছেলেবেলার বাড়িটাও দেখাল গোগোল। সেই আমেরিকান প্রোফেসরের বাড়ি, যেখানে বাবা-মা ছোট্ট গোগোলকে নিয়ে ভাড়া থাকত। সোনিয়া তখনও জন্মায়নি। অবশ্য সে-সময়ের কোনও স্মৃতি গোগোলের নেই। সে পুরনো ছবিতে বাড়িটা দেখেছে, বড়দের মুখে রাস্তার নামটা শুনে শুনে চিনেছে। এখন সেখানে কে থাকে কে জানে? তারা বোধহয় বাড়ি নেই। সামনের সিঁড়ির বরফ পরিষ্কার হয়নি, দরজার সামনের পাপোশে কয়েকটা

গোল করে গোটানো খবরের কাগজ। "যদি ভিতরে যেতে পারতাম, যদি আমরা একটু একলা থাকতে পারতাম," গোগোল বলে। এই মুহূর্তে, বাড়িটার সামনে রুথের দস্তানা পরা হাতটা ধরে দাঁড়িয়ে, গোগোলের অসহায় লাগে। শিশু অবস্থায় এই বাড়িতে থাকার সময় সে জানত না, এভাবে একদিন ফিরে এসে এখানে দাঁড়াবে। আর তখন এত সুখী মনে হবে নিজেকে। বাড়িটাকেই বিশ্বাসঘাতক মনে হয় তার, নাকি নিজের শৈশবকেই দোষ দিতে চায়?

নতুন বছরের কয়েক মাস যেতে না যেতে অশোক ও অসীমা রুথের ব্যাপারটা জেনে ফেললেন। গোগোল এর মধ্যে দু'বার মেনের ফার্মহাউসে গিয়ে রুথের বাবা আর সৎমায়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছে। তবে সোনিয়া ছাড়া গোগোলের বাড়ির আর কারও সঙ্গে রুথের দেখা হয়নি। একবার উইকএন্ডে নিউ হ্যাভেনে এসেছিল সোনিয়া, তখনই রুথের সঙ্গে ওর আলাপ হয়। সোনিয়ার আজকাল একটি গোপন বয়ফ্রেন্ডও আছে। বাবা-মা অবশ্য গোগোলকে তার গার্লফ্রেন্ড সম্পর্কে একটা কথাও জিজ্ঞেস করেনি। এই প্রেমের সম্পর্কটাতে ছেলে জড়িয়ে পড়ায় তাঁরা খুশি নন, গর্বিতও নন। রুথের অবশ্য তাতে কোনও হেলদোল নেই। সে বলেছে, গোগোলের বাবা-মার এই অখুশি হওয়াকে তার রোমান্টিক মনে হয়। কিন্তু গোগোল জানে, এটা ঠিক হচ্ছে না। বাবা-মায়ের উচিত স্বাভাবিকভাবে রুথকে মেনে নেওয়া। ঠিক যেমন ওর পরিবারে সকলে গোগোলকে মেনে নিয়েছে। এর মধ্যে কোনও চাপ থাকার কারণ কী? অশোক আর অসীমা কিন্তু ছেলেকে বলে, এত তাড়াতাড়ি এ-সবে জড়িয়ে পড়াটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। তারা বহু এমন বাঙালি লোকের উদাহরণ টেনে এনেছে যারা মার্কিন মেয়ে বিয়ে করে শেষ পর্যন্ত ডিভোর্স করতে বাধ্য হয়েছে। গোগোল যখন বলে, সে এখন বিয়ের কথা মোটেই ভাবছে না, তখন তারা আরও আতঙ্কিত হয়। কোনও কোনও সময় গোগোল কথা বলাই থামিয়ে দেয়। বাবা-মা এ-রকম কথা বললে তার করুণা হয়। বাবা বা মা কোনওদিন অল্পবয়সে প্রেম করেনি, তারা কী-ই বা বোঝে? রুথ ছ' মাসের কোর্স করতে অক্সফোর্ড গেলে অশোক আর অসীমা হয়তো মনে-মনে খুশিই হয়। প্রথম আলাপ হওয়ার পরেই রুথ অক্সফোর্ডে যাওয়ার ইচ্ছার কথা বলেছিল বটে, কিন্তু সে-সময় পুরো ব্যাপারটা মনে হয়েছিল অনেক দূরের স্বপ্ন। রুথ ওকে জিজ্ঞেসও করেছিল, ইংল্যান্ড যাওয়ার জন্য আবেদন করলে ও কিছু মনে করবে

কি না। প্রেমিকাকে এতদিন ছেড়ে থাকার ভয় ওর মনে দলা পাকিয়ে থাকলেও আপত্তি করেনি গোগোল। বলেছিল, মনে করার কী আছে? বারোটা সপ্তাহ দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

সে-বছর স্প্রিং টার্মে রুথকে ছাড়া ওর নিরাশ্রয় লাগে। সমস্ত সময়টাই স্টুডিয়োতে কাটায় গোগোল। বিশেষ করে শুক্রবার রাত আর শনি-রবিবার, যে-সময়টা সাধারণত রুথের সঙ্গে কাটত ওর। দু'জনে নেপ্‌লসে খেতে যেত, ল স্কুল অডিটোরিয়ামে সিনেমা দেখত। রুথের পছন্দের মিউজ়িক শুনত ওরা: সাইমন অ্যান্ড গারফাঙ্কেল, নিল ইয়ং, ক্যাট স্টিভেন্‌স। রুথ যে-অ্যালবামগুলো ওর বাবার কাছ থেকে পেয়েছে, সেগুলো কিনে ফেলত গোগোল। এখন রুথ আর নিজের মধ্যে দূরত্ব কতটা, তা ভেবে গোগোলের গা শিউরে ওঠে। সে যখন ঘুমোচ্ছে, রুথ তখন দাঁত মাজছে, মুখে-চোখে জল দিচ্ছে, পরের দিন শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে রুথের জন্য কষ্ট পায়, ঠিক যেমন তার বাবা-মা এতদিন ভারতে ফেলে আসা নিজেদের মানুষের জন্য কষ্ট পেয়েছে। জীবনে এই প্রথমবার সে বুঝতে পারল স্বজনকে ছেড়ে থাকার কষ্ট ঠিক কেমন। কিন্তু ছুটিতে ইংল্যান্ড যাওয়ার খরচ দিতে বাবা-মা নারাজ। ডাইনিং হলে কাজ করে যেটুকু রোজগার করে সে, তা রুথকে সপ্তাহে দু'বার ফোন করতেই ফুরিয়ে যায়। দিনে দু'বার সে মেলবক্স খুলে দেখে রানির ছবি দেওয়া খাম, পোস্টকার্ড কিছু এসেছে কি না। রুথের লেখা চিঠিগুলো সে চব্বিশ ঘণ্টা সঙ্গে নিয়ে ঘোরে, বইয়ের ফাঁকে গুঁজে নিয়ে যায়। রুথ বেগুনি কালিতে লিখেছে, "আজকের শেকসপিয়র ক্লাসটা আমার জীবনের সেরা ক্লাস। তবে এখানকার কফি খাওয়া যায় না। সবাই সারাক্ষণ 'চিয়ার্স' বলে চেঁচায়। আমি সবসময় তোমার কথা ভাবি।"

একদিন সে ইংরেজিতে লেখা ভারতীয় উপন্যাসের উপর একটা প্যানেল ডিসকাশন শুনতে গেল। আসলে যাওয়াটা তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। একজন বক্তা তার দূরসম্পর্কের ভাই, নাম অমিত, থাকে বম্বেতে। তার সঙ্গে অবশ্য এর আগে গোগোলের কখনও দেখা হয়নি। মা বলে দিয়েছে, অমিতকে ভালবাসা জানাতে। বক্তৃতা শুনতে শুনতে গোগোল হেদিয়ে গেল। সকলেই বক্তব্যে 'মারজিন্যালিটি' নামে কোনও অদ্ভুত বিষয় এনে ফেলছিলেন, যেন ও-ব্যাপারটা কোনও শারীরিক অসুখ। কিছুক্ষণ ও বক্তাদের ছবি আঁকতে থাকল। তবে ওঁরা সবাই একইরকমভাবে লম্বাটে টেবিলের পিছনে কাগজপত্রের উপর ঝুঁকে বসে আছেন। একজন

সোশিয়োলজিস্ট বললেন, "টেলিয়োলজিক্যালি স্পিকিং, এবিসিডি আর আনএব্‌ল টু অ্যানসার দ্য কোয়েশ্চেন, হোয়্যার আর ইউ ফ্রম?" গোগোল কখনও 'এবিসিডি' কথাটা শোনেনি। পরে বুঝল ওর পুরো কথাটা হচ্ছে, "আমেরিকান বর্ন কনফিউসড দেশি"। মানে, ওর মতো লোকজন। ও জানে, বাবা-মা বা এখানকার অন্য ভারতীয়রা ভারতবর্ষ বোঝাতে হলে বলে, 'দেশ'। কিন্তু গোগোল কখনও ভারতকে দেশ মনে করে না। সে আমেরিকানদের মতোই ভারতকে ভারত মনে করে।

গোগোল সিটের ভিতর এলিয়ে বসে কতকগুলো অস্বস্তিকর সত্যিকথা ভাবতে শুরু করল। যেমন, মাতৃভাষা বাংলা বলতে বা বুঝতে পারলেও ও লিখতে-পড়তে তেমন পারে না। ভারতে গেলে তার মার্কিন টানের ইংরেজি শুনে সকলে হাসে। সোনিয়ার সঙ্গে ও যখন কথা বলে, মামা, মামি, ভাই-বোনেরা মাথা নাড়িয়ে বলে, "কী যে বলল, কিছুই বুঝলুম না।" যে দেশে মানুষের দুটো নাম হয় না, সেখানে একটা ডাকনাম আর একটা ভালনাম নিয়ে বাস করতে হয় তাকে। সেটাই নিশ্চয়ই গোগোলের জীবনে সবচেয়ে বড় গোলমেলে কাণ্ড। সে চারদিকে তাকিয়ে দেখে, কোনও চেনা মুখ দেখা যায় কি? কিন্তু এখানে যারা এসেছে তাদের সঙ্গে ওর মেলামেশা নেই। এরা বেশির ভাগই সাহিত্যের ছাত্র। চামড়ার ঝোলব্যাগ আর সোনালি রিমের চশমা তাদের, ফাউন্টেন পেন দিয়ে লিখছে। রুথ সম্ভবত এদের চেনে, বা চিনত। অবশ্য বেশ কিছু এবিসিডি-ও রয়েছে। গোগোল জানতই না, ক্যাম্পাসে ওর মতো এত ছাত্র আছে। কলেজে ওর কোনও এবিসিডি বন্ধু নেই। কারণ ও তাদের এড়িয়ে গিয়েছে। ভারতীয়দের দেখলে ওর বাবা-মার জীবনের ধারাটা মনে পড়ে যায়। অশোকরা এমন লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে যারা একই অতীতের শরিক। বন্ধুত্বটা পরস্পরকে পছন্দ করার উপর দাঁড়িয়ে থাকে না, দাঁড়ায় পুরনো স্মৃতির উপর। "গোগোল, তুমি এখানকার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হওনি কেন?" অমিত পরে জিজ্ঞেস করে। ওরা দু'জনে তখন একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসেছে। "আমার সময় নেই," বলে গোগোল কথাটা সেখানেই শেষ করে দেয়। অমিতকে খুলে বলতে পারে না সত্যি কথাটা কী। এমন কোনও সংস্থার সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়তে চায় না, যেখানে সবাই আগ্রহ নিয়ে সেই সব অনুষ্ঠানগুলোই পালন করে, যেগুলো পালন করতে ছেলেবেলা থেকে বাবা-মা ওকে জোর করে বাধ্য করেছেন। তা তো দুমুখোপনা হবে। "আমি এখন নিখিল," অমিতকে

মনে করিয়ে দেয় সে। ভীষণ হতাশ লাগে। কতবার কত লোককে মনে করিয়ে দিতে হবে, ভুলে যেতে বলতে হবে। যেন সর্বক্ষণ সে বুকে একটা রিমাইন্ডার স্লিপ আটকে ঘুরছে।

সেবার থ্যাংকসগিভিংয়ে সে একা-একাই ট্রেনে করে বস্টনে গেল। রুথের সঙ্গে তার পাকাপাকিভাবে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। সেই বারো সপ্তাহ শেষ হওয়ার পর রুথ আর ফিরে আসেনি। একটা সামার কোর্স করার জন্য অক্সফোর্ডে থেকে গিয়েছে। তার প্রিয় এক প্রোফেসর নাকি অবসর নেবেন, তাই শেষবারের মতো তাঁর কাছে পড়ার সুযোগ ছাড়া যায় না। পুরো গ্রীষ্মকাল গোগোল পেম্বারটন রোডের বাড়িতে কাটিয়েছে। কেমব্রিজের একটা ছোট্ট আর্কিটেকচারাল ফার্মে সে ইন্টার্নশিপ পেয়ে গিয়েছিল; অবশ্য পারিশ্রমিক কিছু পায়নি। সেখানে ডিজ়াইনারদের কথামতো সে ছোটাছুটি করেছে, কাছেপিঠে কোনও সাইটে গিয়ে ছবি তুলে এনেছে, কোনও কোনও ড্রয়িং-এ সাহায্য করেছে। রোজগার বাড়ানোর জন্য নিজের শহরের একটা ইতালিয়ান রেস্তোরাঁয় গভীর রাত পর্যন্ত প্লেট ধুয়েছে পর্যন্ত। আগস্ট মাসের শেষদিকে সে রুথকে আনতে লোগান এয়ারপোর্টে গেল। গেটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিল সে, তারপর সেদিন রাতের জন্য রুথকে নিয়ে একটা হোটেলে গিয়েছিল। হোটেলভাড়া দিতে প্লেট ধোয়ার রোজগার সব শেষ। ঘরটার জানালা দিয়ে পাবলিক গার্ডেনের দৃশ্য দেখা যায়। দেওয়ালে গোলাপি-ঘিয়ে রঙের ওয়ালপেপার। সেই প্রথমবার তারা ডবল বেডে শুয়ে মিলিত হল। খেতে তাদের বাইরে যেতে হয়েছিল। রুম সার্ভিসের মেনুতে খাবারের যা দাম, তা দেওয়ার ক্ষমতা দু'জনের কারও ছিল না। নিউবারি স্ট্রিট ধরে হেঁটে তারা ছোট্ট একটা গ্রিক রেস্তোরাঁর ফুটপাথে বিছিয়ে দেওয়া টেবিলে বসল। দিনটা অসহ্য গরম। রুথকে দেখতে একই রকম আছে। কিন্তু ওর ইংরেজিতে ইংল্যান্ডে শেখা বহু শব্দ ঢুকে পড়েছে, যেমন 'আই ইমাজিন', 'আই সাপোজ়' বা 'প্রিসিউমেব্‌লি'। রুথ বলল, ইংল্যান্ডে তার কত ভাল লেগেছে। বলল, বার্সেলোনা আর রোমে বেড়াতে যাওয়ার কথা। বলল, সে গ্র্যাজুয়েট স্কুলে পড়তে ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে চায়, "ওখানে নিশ্চয়ই ভাল আর্কিটেকচার স্কুলও আছে। তুমিও চলো না।" পরদিন ভোরবেলা গোগোল ওকে মেনের বাসে তুলে দিল। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ওদের ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। ততদিনে বন্ধুদের সঙ্গে নিউ হ্যাভেনে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

নিয়েছে গোগোল। সেখানেই, নানা মতান্তরের মধ্যে, ওরা দু'জনেই বুঝতে পেরেছিল, কিছু একটা বদলে গিয়েছে।

তারা দু'জনে এখন লাইব্রেরিতে বা রাস্তায় দেখা হলে পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। গোগোল নিজের খাতায় রুথের মেন আর অক্সফোর্ডের ফোন নম্বর ও ঠিকানা কেটে দিয়েছে। কিন্তু ট্রেনে উঠে দু'বছর আগের সেই দুপুরটার কথা সে ভুলতে পারে না, যেদিন রুথের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল। এবারও ট্রেনে অসম্ভব ভিড়। গোগোল বেশির ভাগ সময় ভেস্টিবিউলেই বসে রইল। ওয়েস্টারলি পেরোনোর পর সে বসার জায়গা পেল। পরের সেমেস্টারের কোর্স সিলেকশান গাইডটা নিয়ে গুছিয়ে বসল সে। তবে মনে অদ্ভুত চাপ বোধ করে সে, অস্বস্তি টের পায়। যেন ট্রেন থেকে নামতে পারলে বেঁচে যায়। সে কোটটা খোলার কথা খেয়াল করে না, তেষ্টা পেলেও কফি বা অন্য কিছু সংগ্রহ করতে যায় না। কোর্স গাইডটা ঢুকিয়ে রেখে সে লাইব্রেরি থেকে ধার করে আনা রেনেসাঁস ইতালি ও মোগল স্থাপত্যের তুলনামূলক আলোচনার উপর বইটা খুলে বসে। সিনিয়র প্রজেক্ট থিসিসে সাহায্য হতে পারে। কিন্তু কয়েক প্যারা পড়তে না পড়তে বইটা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। ততক্ষণে পেটে ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে রাতে কী রান্না হয়েছে, কে জানে? বাবাই রান্না করেছে নিশ্চয়ই, কারণ মা আর সোনিয়া তিন সপ্তাহের জন্য ইন্ডিয়া গিয়েছে এক তুতো-বোনের বিয়ে উপলক্ষে। এ-বছর গোগোল আর বাবা থ্যাংকসগিভিং কাটাবে ইন্ডিয়ান বন্ধুদের বাড়িতে।

সে জানালায় মাথা ঠেকিয়ে বাইরের হৈমন্তিক দৃশ্য দেখে। কলপ কারখানা থেকে বেরোনো গোলাপি ও বেগুনি জলের ধারা, বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্টেশন, মরচে ধরা গোলাকার জলের ট্যাংক, পরিত্যক্ত কারখানার ভাঙাচোরা জানালা। গাছের উপরের দিকের ডালগুলো ন্যাড়া, নীচের দিকে যে-ক'টা পাতা আছে সেগুলোও হলুদ, পাতলা আর দুর্বল। ট্রেনটা অন্যদিনের চেয়ে বেশি আস্তে চলছে বলে মনে হয়। ঘড়ি দেখল গোগোল। সত্যিই তারা ঠিক সময়ের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। তারপর হঠাৎই একটা ধু ধু মাঠের মধ্যে ট্রেনটা থেমে গেল। একঘণ্টার উপর স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে হল। লাল গোলাকার সূর্য পশ্চিমদিকের গাছে ভরা দিগন্তে টুপ করে ডুবে গেল। ট্রেনের লাইটগুলোও নিবে গেল এ-সময়। ভিতরটা গরম হয়ে উঠতে লাগল। ট্রেনের কন্ডাক্টররা ব্যস্তসমস্ত হয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে দেখে গোগোলের পাশে বসা এক ভদ্রলোক বললেন, "তার-টার ছিঁড়ে গিয়েছে বোধহয়।"

প্যাসেজের অন্যদিকে এক বয়স্কা পাকাচুলো মহিলা বই পড়ছিলেন। তাঁর কোটটা দলা পাকিয়ে বুকের কাছে ধরা। তাঁর পিছনে দু'জন ছাত্র বেন জনসনের কবিতা নিয়ে আলোচনা করছে। ইঞ্জিনের শব্দ না থাকায় কারও ওয়াকম্যানে অপেরা বাজার শব্দ মৃদু শোনা যাচ্ছে। জানালা দিয়ে গোগোল অন্ধকার হয়ে আসা গোলাপি আকাশ দেখতে লাগল। বাইরে অবশ্য একগাদা মরচেধরা রেললাইন ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। ট্রেনটা ফের চলতে শুরু করল। লাউডস্পিকারে শোনা গেল, দেরির কারণ "মেডিক্যাল এমারজেন্সি"। তবে আসল কারণটা কী, তা শিগগিরি জানা গেল। কন্ডাক্টরের মারফত খবরটা জেনে এক যাত্রী বললেন, কেউ রেললাইনে আত্মহত্যা করেছে।

গোগোল খবরটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল। এতক্ষণ কী বিরক্তিই না লাগছিল, কী অধৈর্য হচ্ছিল সে! সে ভাবতে লাগল, যে আত্মহত্যা করেছে সে নারী না পুরুষ, বুড়ো না তরুণ। তার ব্যাকপ্যাকে যে টাইম-টেবলখানা আছে, ঠিক তেমনই একটা টাইম-টেবল দেখেই নিশ্চয়ই ঠিক করেছিল কোন ট্রেনের তলায় ঝাঁপ দেবে। সে নিশ্চয়ই ঝাঁপ দেওয়ার আগে ট্রেনের হেডলাইটটা দেখতে পেয়েছিল... শিউরে উঠল গোগোল। দেরি হওয়ার ফলে বস্টনের প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা ধরতে পারা গেল না। পরের গাড়িটা চল্লিশ মিনিট পরে। বাড়িতে ফোন করেও কোনও উত্তর মেলে না। ফোন বেজে যায়। বাবার ডিপার্টমেন্টের ফোনও ক্রমাগত বেজে যায়। শেষ পর্যন্ত বাড়ির স্টেশনে পৌঁছে গোগোল দেখে, অন্ধকার প্ল্যাটফর্মের কোনায় বাবা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে কর্ডুয়ের প্যান্ট আর স্নিকার্স। মুখটা চিন্তায় কালো। বাবার ট্রেঞ্চ কোটটা কোমরে বেল্ট দিয়ে বাঁধা, মায়ের বোনা একটা স্কার্ফ গলায় প্যাঁচানো, মাথায় টুইডের টুপি।

"আমার পৌঁছোতে দেরি হয়ে গেল," গোগোল বলল, "তুমি কি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ?"

"পৌনে ছ'টা থেকে," বাবা বলল। গোগোল ঘড়ি দেখল। প্রায় আটটা বাজে।

"একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।"

"শুনেছি। তোমার কিছু হয়নি তো?"

গোগোল মাথা নাড়ে। "কেউ রেললাইনে ঝাঁপ দিয়েছিল। রোড আইল্যান্ডের কাছে কোথাও। আমি তোমাকে ফোন করার চেষ্টা করেছিলাম। হয়তো পুলিশ আসার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ট্রেনটা দেরি করেছে।"

"আমার চিন্তা হচ্ছিল।"

"তুমি কি এতক্ষণ এভাবে ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলে?"

বাবাকে চুপ করে থাকতে দেখে গোগোল বুঝল বাবা ঠিক সেটাই করেছে। কে জানে, মা আর সোনিয়াকে ছাড়া বাবা কেমন করে আছে এখন। নিশ্চয়ই একা লাগে। কিন্তু বাবা কখনও সে-সব কথা মুখ ফুটে বলবে না, কী দরকার বা কী অসুবিধে তা কাউকে জানতে দেবে না। তারা দু'জনে পার্কিং লটে হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসে। বাবা বাড়ির দিকে গাড়ি চালায়।

সে-রাতটায় বড্ড হাওয়া দিচ্ছিল। এতই বেশি যে, গাড়িটা কখনও কখনও দুলে উঠছে। হেডলাইটের আলোয় মানুষের পায়ের মতো বড় বড় খয়েরি পাতা উড়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। সাধারণত, এভাবে ফেরার সময়ে বাবা গোগোলের পড়াশোনা নিয়ে প্রশ্ন করে, গ্র্যাজুয়েশনের পর কী করবে বা টাকাপয়সার অবস্থা কী, তা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু আজ সব চুপচাপ। বাবা মন দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। গোগোল গাড়ির রেডিয়োটার স্টেশন বদলাতে লাগল।

একটা গান শেষ হওয়ার পর বাবা বলল, "তোমাকে আমি কিছু বলতে চাই।" গাড়ি তখন পেম্বারটন রোডে ঢুকে পড়েছে।

"কী?"

"তোমার নাম সম্বন্ধে।"

গোগোল অবাক হয়ে বাবার দিকে ফিরে তাকায়, "আমার নাম?"

বাবা রেডিয়োটা হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দেয়। "হ্যাঁ। তোমার নাম। গোগোল।"

আজকাল সে গোগোল নামটা এত কম শোনে যে শুনলে আর মন খারাপ হয় না। তিন বছর নিখিল হয়ে বেঁচে থাকার পর গোগোল নামটা তাকে আর পীড়া দেয় না।

"ওই নামটা রাখার একটা কারণ আছে, জানিস," বাবা বলে।

"জানি। উনি তোমার প্রিয় লেখক।"

"না," বাবা ড্রাইভওয়েতে ঢুকে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে। হেডলাইটও নিভিয়ে দেয়। সিট-বেল্টটা খুলে ফেলে পিছনে সরিয়ে দেয়। "অন্য একটা কারণ আছে।"

সেই সন্ধেয় পেম্বারটন রোডে গাড়িতে বসে গোগোলের বাবা ফিরে গেল হাওড়া থেকে ২০৯ কিমি দূরে একটা মাঠে। স্টিয়ারিং হুইলের নীচটুকু আঙুল দিয়ে চেপে ধরে, উইন্ডশিল্ডের মধ্যে দিয়ে গ্যারেজের দরজাটার

দিকে তাকিয়ে অশোক গোগোলকে আটাশ বছর আগেকার এক ট্রেনযাত্রার গল্প বলল। অক্টোবর ১৯৬১। অশোক জামশেদপুরে নিজের ঠাকুরদার বাড়ি যাচ্ছিল। গোগোল শুনল, কীভাবে সেই রাতে তার বাবার জীবনটাই চলে যাচ্ছিল আর কীভাবে একটা বইয়ের পাতার জন্য বাবা জীবন ফিরে পেয়েছে। তার পরের বছরটা পুরোপুরি বিছানায় শুয়ে থাকার কথাও শুনল সে।

শুনতে শুনতে গোগোল হতভম্ব হয়ে যায়। বাবা আর তার মধ্যে বাহ্যিক দূরত্ব মাত্র কয়েক ইঞ্চির। কিন্তু গোগোল যেন এক সম্পূর্ণ অচেনা মানুষকে দেখছে। এই লোকটা এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনা লুকিয়ে রেখেছে! গোগোল কল্পনা করে কুড়ি বছরের বাবাকে, তার মতোই তরুণ, গল্পের বই পড়তে পড়তে ঠিক তার মতোই ট্রেনে করে যাচ্ছে। আর হঠাৎই মৃত্যু তার সামনে এসে দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল কল্পনা করতে চায় সে, যদিও বেশিবার তা দেখেনি। সে ভাবে, তার বাবার দুমড়ানো দেহ স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চারপাশে বহু মৃতদেহ ছড়িয়ে পড়ে আছে। মেরুন রঙের মোচড়ানো ট্রেনের কামরার পাশ দিয়ে বাবাকে নিয়ে যাচ্ছে কেউ। হঠাৎই, আবেগের বশে, সে বাবাকে ছাড়া পৃথিবী কল্পনা করতে চেষ্টা করে। বাবাকে ছাড়া জীবন কল্পনা করে।

"তুমি আমাকে আগে এ-সব বলোনি কেন?" নালিশের সুরে গোগোল বলে ওঠে। তার গলা রুক্ষ। কিন্তু চোখে জল। "তোমার সম্পর্কে এ-সব কেন জানি না আমি?"

"এর আগে ঠিক সময় আসেনি।"

"কিন্তু এ তো আমাকে মিথ্যে বলার মতো।"

বাবা উত্তর না দিতে গোগোল আবার বলে, "এইজন্যেই তুমি খুঁড়িয়ে হাঁটো, তাই না?"

"অনেক আগেকার কথা। আমি তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করতে চাইনি।"

"আমি কী ভাবলাম, তাতে কী আসে-যায়? আমাকে বলা উচিত ছিল।"

বাবা এক পলকের জন্য গোগোলের দিকে তাকায়, "হয়তো বলা উচিত ছিল।" তারপর হাত বাড়িয়ে ইঞ্জিনের চাবিটা খুলে নিয়ে বলে, "ভিতরে আয়। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। গাড়িটাও ঠান্ডা হয়ে উঠছে।"

কিন্তু গোগোল ওঠে না। বসে বসে সদ্য পাওয়া খবরটা হজম করার চেষ্টা করে। তার লজ্জা করে, অস্বস্তি হয়, মনে হয় এ-সব ওরই দোষ। "আই অ্যাম সরি, বাবা।"

বাবা নরম করে হাসে, "তোমার কী দোষ?"

"সোনিয়া জানে?"

"এখনও না। আমি একদিন ওকেও বুঝিয়ে বলব। এ-দেশে শুধু তোর মা জানে। আর এখন তুই জানলি। আমি চিরকালই তোকে জানাতে চেয়েছি, গোগোল।"

এই সময়ে গোগোল নামটা শুনে তাপর অদ্ভুত অনুভূতি হল। এটা তার ডাকনাম। সারা জীবন বাবা এভাবেই তাকে ডেকে এসেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে গোগোলের অন্য রকম লাগল। যেন এটা সম্পূর্ণ নতুন, প্রথমবার শোনা নাম। এক অজানা ভয়ানক ট্র্যাজেডির সঙ্গে তার নামটা জড়িয়ে আছে। "তাহলে কি আমি তোমাকে সেই রাতটার কথা মনে করিয়ে দিই?" গোগোল বাবাকে জিজ্ঞেস করে।

"না।" উত্তর দেওয়ার আগে বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। বাবার হাতটা আনমনে নিজের পাঁজরের কাছে উঠে আসে। এই ভঙ্গি ছোটবেলা থেকে অনেকবার দেখেছে গোগোল। কিন্তু এই প্রথম সে ভঙ্গিটার অর্থ বুঝতে পারে। "তোকে দেখে সেই অ্যাকসিডেন্টের পর থেকে নতুন করে বেঁচে ওঠার কথা মনে পড়ে আমার।"

ছয়

১৯৯৪

সে এখন নিউ ইয়র্কে থাকে। মে মাসে কলম্বিয়া থেকে সে আর্কিটেকচারে স্নাতক হয়েছে। তারপর থেকেই সে নিউ ইয়র্কের একটা বড় সংস্থায় কাজ করে। অবশ্য ছাত্র থাকার সময় সে মোটেই এ-রকম কাজ করার কথা ভাবেনি। ভেবেছিল, ব্যক্তিগত বাড়ি ডিজ়াইন করা আর নতুন করে সাজানোই হবে তার পেশা। কিন্তু কলেজ ছাড়ার সময় পরামর্শদাতারা বললেন, ওসব পরে হবে। আগে কোনও নামকরা সংস্থায় আর্কিটেকচার নিয়ে শিক্ষানবিশ থাকা জরুরি। তাই, এখন, সামনের ছোট্ট ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে পাশের বাড়ির দেওয়ালটা দেখতে দেখতে সে অন্য অনেকের সঙ্গে হোটেল, মিউজ়িয়াম বা কর্পোরেট হেডকোয়ার্টার্সের প্ল্যান তৈরি করে, এমন সব শহরের জন্য যেখানে সে কোনওদিন যায়নি: ব্রুসেল্‌স, বুয়েনোস এয়ারস, আবু ধাবি, হংকং। এই প্ল্যানগুলোর মধ্যে তার অবদান যৎকিঞ্চিৎ, আর সেটুকুও পুরোপুরি তার নিজের, তা বলা যায় না। হয়তো একটা সিঁড়ির ডিজ়াইন করল সে, বা একটা ঘুলঘুলি, করিডোর কি একটা এয়ার কন্ডিশনিং ডাক্ট। সান্ত্বনা এই যে, বাড়ির যত ছোট অংশই হোক, সেটা পুরো বাড়িটার পক্ষে প্রয়োজনীয়। বেশ ক'বছর পড়াশোনা করার পর, গাদাগাদা ছবি এঁকে প্ল্যান শেখার পর, অন্তত সেটা যে কোথাও কাজে লাগছে, তা কি যথেষ্ট নয়? সে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে। এমনকী শনি-রোববারও ছুটি নেয় না। কম্পিউটারে ডিজ়াইন আঁকে, প্ল্যান ড্রাফ্‌ট করে, লেখালেখি করে, স্টাইরোফোম আর কার্ডবোর্ড দিয়ে মডেল বানায়। মর্নিংসাইড হাইট্‌সে একটা ছোট্ট স্টুডিয়ো অ্যাপার্টমেন্টে তার বাস। তাতে দুটো পশ্চিমমুখো জানালা, আমস্টারডাম এভিনিউ দেখা যায়। বাড়িটায় ঢোকার রাস্তাটা চোখে না পড়াই স্বাভাবিক। ছোট্ট কাচের দরজা একটা, একদিকে খবরের কাগজের স্টল আর অন্যদিকে নখ সাজানোর দোকানে প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তবে

এই পুঁচকে অ্যাপার্টমেন্টটা তার একার। কলেজে ঘর শেয়ার করেই থাকতে হয়েছে। ঘরে এত রাস্তার শব্দ যে, ফোন করলে ওপাশের লোক ভাবে, সে বুথ থেকে ফোন করছে। ঢোকার পথের উপরেই রান্নাঘরটা, এত ছোট জায়গা যে ফ্রিজটা রাখতে হয়েছে কয়েক ফুট দূরে বাথরুমের দরজার পাশে। স্টোভের উপর কেটলিটা বসানো থাকে, কোনওদিন সেটা ব্যবহার করা হয়নি। কাউন্টারের উপর রাখা টোস্টারটারও সেই দশা।

তার রোজগারের অবস্থা দেখে বাবা আর মা মন খারাপ করে। কখনও কখনও বাবা চেক পাঠায়, যাতে নিয়মিত খরচ চালাতে অসুবিধে না হয়। সে কলম্বিয়ায় পড়তে যাওয়ায় তাঁরা এমনিতেই দুঃখ পেয়েছিলেন। সে এম আই টি-তে চান্স পেয়েছিল আর তাঁদের ইচ্ছে ছিল ছেলে সেখানেই পড়ে। কিন্তু চার বছর নিউ হ্যাভেনে কাটানোর পর আবার বাড়ির কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে তার হয়নি, আমেরিকায় তার বাবা-মা'র চেনা একমাত্র শহর ম্যাসাচুসেট্‌সে আর যায়নি সে। বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে ইচ্ছে করেনি তার, বাবা-মার মতো সেন্ট্রাল স্কোয়্যারে বাড়ি ভাড়া করতে ইচ্ছে করেনি, সে চায়নি বাবা-মার মুখে গল্প শোনা সেই রাস্তাগুলো দিয়ে হাঁটতে। সে উইকএন্ডে বাড়ি যেতে চায়নি। বাবা-মার সঙ্গে পুজো আর বাঙালি পার্টিতে সামিল হতে চায়নি। আসলে প্রশ্নহীনভাবে বাবা-মা'র পৃথিবীতে ঢুকে পড়ার সহজ রাস্তায় যেতে সায় দেয়নি তার জীবন।

সে বরং নিউ ইয়র্কে থাকতে চায়। বাবা-মা এই শহরটাকে চেনে না। এর সৌন্দর্য বোঝে না। ভয় পায়। ইয়েলে পড়ার সময়ে আর্কিটেকচার ট্যুরে আসতে আসতে সে এই শহরটাকে সামান্য জেনেছিল। কলম্বিয়াতে সে কয়েকটা পার্টিতে এসেছে। মাঝে মাঝে সে আর রুথ চলে আসত, মিউজ়িয়ামে যেত, বেড়াত, বই খুঁজত। ছেলেবেলায় সে একবারই বাবা-মায়ের সঙ্গে এখানে এসেছিল। তখন নিউ ইয়র্ক সম্পর্কে সে কিছু বুঝতেই পারেনি। এক সপ্তাহশেষে তারা কুইন্‌সে কিছু বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে থেকেছিল। সেখান থেকে ম্যানহাটানে বেড়াতে গিয়েছিল তারা। তখন গোগোলের বয়স দশ, সোনিয়া চার বছরের। সোনিয়া বলেছিল, "আমি সিসেম স্ট্রিটে যাব।" সে ভেবেছিল ও-নামে নিউ ইয়র্কে সত্যিই একটা রাস্তা আছে। গোগোল তা শুনে হেসেছিল, বলেছিল ওরকম কোনও রাস্তা নেই। শুনে সোনিয়া কেঁদে ফেলেছিল। তারা সেবার গাড়ির জানালা দিয়ে রকফেলার সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং দেখেছিল।

গোগোল জানালা দিয়ে মাথা বের করে দেখার চেষ্টা করেছিল, বাড়িগুলো কতটা লম্বা। বাবা-মা নিউ ইয়র্কের ভিড়, লোকজন, পথচারী, যানজট, আওয়াজ ইত্যাদি নিয়ে ক্রমাগত মন্তব্য করছিল। বলেছিল, কলকাতা এর চেয়ে খারাপ নয়। তার মনে আছে, গাড়ি থামিয়ে কোনও আকাশচুম্বী বাড়ির উপরের তলায় উঠতে খুব ইচ্ছে করেছিল তার। যেমন, আরও ছোট থাকার সময় বাবা তাকে বস্টনের প্রুডেনশিয়াল সেন্টারের ছাতে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা লেক্সিংটন্ এভিনিউয়ের আগে গাড়ি থেকে বেরোতে পারেনি। সেখানে একটা ভারতীয় রেস্তোরাঁয় তারা দুপুরের খাবার খেয়েছিল। মা ভারতীয় মশলাপাতি আর আনাজ কিনেছিল। কেনা হয়েছিল পলিয়েস্টারের শাড়ি আর ২২০ ভোল্টের ইলেকট্রিকাল যন্ত্রপাতি। সে-সব কলকাতার আত্মীয়স্বজনকে উপহার দেওয়ার জন্য। বাবা-মার কাছে, এই কেনাকাটাই ছিল ম্যানহাটনে আসার লক্ষ্য। সে চেয়েছিল, বাবা-মা তাকে পার্কে হাঁটতে নিয়ে যাক, মিউজ়িয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রিতে নিয়ে গিয়ে ডাইনোসর দেখাক, মেট্রোতে চড়াক। কিন্তু বাবা-মায়ের এ-সবে কোনও আগ্রহ ছিল না।

এক রাতে, সহকর্মী ড্রাফ্টসম্যান ইভান তাকে পার্টিতে যেতে রাজি করিয়ে ফেলল। ইভানের সঙ্গে তার কিছুটা বন্ধুত্ব রয়েছে। ইভান বলল, যেখানে পার্টিটা হচ্ছে, সে বাড়িটা দেখা উচিত। সেখানে এই সংস্থারই কোনও পার্টনারের তৈরি দারুণ একটা বারান্দা আছে। পার্টিটা দিচ্ছে ইভানের পুরনো বন্ধু রাসেল। সে ইউনাইটেড নেশন্সে কাজ করে, বহুদিন কেনিয়ায় ছিল। তার ফলে রাসেলের কাছে দারুণ সব আফ্রিকান আসবাব, স্কাল্পচার আর মুখোশ রয়েছে। গোগোলের মনে হয়েছিল, পার্টিতে শয়ে-শয়ে লোক আসবে, তাকে কেউ লক্ষই করবে না। কিন্তু গোগোল আর ইভান যখন গিয়ে পৌঁছোল, পার্টি তখন শেষের মুখে। একটা নিচু কফি টেবিলের চারদিকে জনাবারো লোক বসে। চারদিকে কুশন ছড়ানো। তারা আঙুর আর চিজ় খাচ্ছে। একসময় রাসেল জামা তুলে ইনসুলিন ইনজেকশন নিল। তার ডায়াবেটিস আছে। রাসেলের পাশে বসা মেয়েটির দিক থেকে গোগোল চোখ ফেরাতেই পারছিল না। সে হাঁটু মুড়ে বসে একটা ক্র্যাকার খাচ্ছে। রাসেল কী করছে-না করছে, তার দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। সে কফি-টেবিলের অন্যদিকে বসা একটি পুরুষের সঙ্গে বুনুয়েলের একটি সিনেমা নিয়ে আলোচনা করছে। একটু মাতলামিও করছে অবশ্য। বারবার বলছে, "ছাড়ো

তো! ছবিটা ব্রিলিয়্যান্ট।” মেয়েটির চুল ধুলোটে, ময়লা সোনালি। অগোছালো খোঁপা বাঁধা রয়েছে। কিন্তু মুখের চারদিকে ঝুলতে থাকা চুলের গুছিতে তাকে দিব্যি দেখাচ্ছে। তার কপাল মসৃণ, উঁচু। চোয়াল একটু বেশিই লম্বা। চোখগুলোতে সবজে আভা, মণির চারদিকে গাঢ় কালো বৃত্ত। তার পরনে সিল্কের কাপ্রি প্যান্ট আর সাদা স্লিভলেস শার্ট, তাতে ত্বকের পোড়াভাব বোঝা যাচ্ছে। “তোমার কী মনে হয়?” হঠাৎই গোগোলকে কথাবার্তার মধ্যে টেনে নিল সে। বাধ্য হয়ে গোগোল বলল, সে সিনেমাটা দেখেনি। শুনে মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে নিল।

পরে, যখন গোগোল একা দাঁড়িয়ে আছে, মেয়েটি আবার তার দিকে এগিয়ে এল। কাছেই টাঙানো একটা বিরাট মুখোশের দিকে তাকাল। মুখোশটা ভয়াবহ। চোখের জন্য একটা ছ'কোনা ফাঁক আর মুখের গোল ফাঁকটার মধ্যে দিয়ে পেছনের দেওয়ালের সাদা রং দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি বলল, “এর চেয়ে ঢের বেশি ভয়ংকর একটা মুখোশ শোবার ঘরে আছে। ভাবো, সকালবেলা চোখ খুলে প্রথমেই দেখবে ও-রকম একটা কদাকার মুখ তোমার দিকে চেয়ে আছে।” গোগোলের সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, মেয়েটা নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলছে না তো? ও কি রাসেলের প্রেমিকা বা প্রাক্তন প্রেমিকা? সেটাই বোঝাতে চাইছে না তো?

জানা গেল, মেয়েটির নাম ম্যাক্সিন। সে কলম্বিয়া-বার্নার্ড থেকে আর্ট হিস্ট্রিতে মেজর করেছে। একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে কথা বলে সে, হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস। প্রথমে গোগোল ভেবেছিল ম্যাক্সিন ওর থেকে বয়সে বড় হবে, তিরিশ-টিরিশ বয়স হবে বোধহয়। তবে পরে জানা গেল ওরা দু'জনে প্রায় সমসাময়িক। তারা প্রায় একই সময়ে কলম্বিয়াতে পড়েছে, পরস্পরের থেকে তিন ব্লক তফাতে থেকেছে, ব্রডওয়ে বা লাইব্রেরিতে দেখা হয়ে থাকলে তা আশ্চর্য নয়। গোগোলের রুথের কথা মনে পড়ে গেল। ঠিক এইভাবে রুথ ও সে একই কলেজে পড়ে, কাছাকাছি থেকেও ক-ত-দি-ন অচেনা ছিল। ম্যাক্সিন এক আর্টের বই প্রকাশকের দপ্তরে অ্যাসিসট্যান্ট এডিটর হিসেবে কাজ করে। এখন আন্দ্রিয়া মানতেনার উপর একটা বই নিয়ে কাজ করছে সে। মানতেনার ফ্রেস্কোগুলো মানতুয়াতে আছে, এ-কথা বলে গোগোল ম্যাক্সিনকে অবাক করে দিল। তাদের দু'জনের কথার মধ্যে একটা বোকা-বোকা ব্যাপার ভেসে ছিল, যেন দূরত্ব অতিক্রম করার চেষ্টা। গোগোল এখন বুঝতে পারে তাকেই ফ্লার্টিং বলে। এরকম কথা যে-কোনও লোকের

সঙ্গে বলা যায়। কিন্তু ম্যাক্সিন অদ্ভুতভাবে পুরো মনোযোগ গোগোলকে দিচ্ছিল। তার সবজে চোখ দুটো সম্পূর্ণভাবে গোগোলের উপরে নিবদ্ধ। সে এমন দৃষ্টি, যা অনুভব করা যায়। সেই মুহূর্ত কয়েকটা, মনে হয়, গোগোলই ম্যাক্সিনের পৃথিবীর কেন্দ্র।

পরের দিন সকালে ম্যাক্সিনের ফোনেই ঘুম ভাঙল গোগোলের। রবিবার সকাল দশটা। গোগোল তখনও বিছানায় গড়াচ্ছে। আগের দিন সন্ধ্যায় যে স্কচ আর সোডা পেটে পড়েছে, তার প্রভাবে মাথা ভার হয়ে আছে। ফোন বাজতেই সে ভেবেছিল মা ফোন করেছে। তাই একটু রুক্ষভাবেই ফোন তুলে সাড়া দিয়েছিল বটে, তবে ম্যাক্সিনের গলা শুনে তার মনে হল, ম্যাক্সিন অনেক ভোরেই উঠে পড়েছে। হয়তো জলখাবার খাওয়া হয়ে গিয়েছে তার, *টাইম্‌স* পড়াও শেষ। "আমি ম্যাক্সিন, কাল রাতে দেখা হয়েছিল...", ঘুম থেকে তোলার জন্য ক্ষমা চাওয়ার কোনও চেষ্টাই করে না সে। বলে, ফোন নম্বরটা ডায়রেক্টরিতে পেয়েছে সে। গোগোল অবাক হয়। কাল রাতে নিজের নামটা ওকে বলেছিল কি? মনে নেই। ম্যাক্সিন বলে, "বাপ রে, তোমার বাড়িতে তো সাংঘাতিক আওয়াজ।" তারপর, একবারও না থেমে, ইতস্তত না করে গোগোলকে এক শুক্রবার নিজের বাড়িতে রাতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করে বসে। চেলসার বাড়ির ঠিকানাও দিয়ে দেয়। গোগোল ধরেই নিয়েছিল, নেমন্তন্নটা কোনও ডিনার পার্টির। তাই সে জিজ্ঞেস করে নেয়, কিছু আনলে সুবিধে হবে কি না। কিন্তু ম্যাক্সিন পরিষ্কার না করে দেয়, বলে দেয়, নিমন্ত্রিত শুধু গোগোল একাই। তারপর বলে, "আমি আগেই বলে রাখছি, আমি আমার বাবা-মার সঙ্গে থাকি।"

"ও!"

এই অপ্রত্যাশিত খবরটা গোগোলকে চমকে দেয়, অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। সে জিজ্ঞেস করে, সে এলে ম্যাক্সিনের বাবা-মা কিছু মনে করবেন কি না। হয়তো কোনও রেস্তোরাঁয় দেখা করলেই ভাল হয়।

কিন্তু একথা শুনে ম্যাক্সিন হেসে ফেলে। বলে, "ওঁরা আবার কী মনে করতে যাবেন?"গোগোলের নিজেকে বোকা মনে হয়।

সেই শুক্রবার গোগোল অফিস থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ম্যাক্সিনের পাড়ায় পৌঁছে গেল। মদের দোকান খুঁজে ওয়াইনের বোতল কিনল একটা। সেপ্টেম্বর মাসের শীতল বিকেল। ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে। গ্রীষ্মের পাতা

এখনও গাছ থেকে পুরো বিদায় নেয়নি। নাইন্‌থ ও টেন্‌থ এভিনিউয়ের মধ্যেকার একটা শান্ত ব্লকে ঢুকতে হল। বহুদিন কোনও মেয়ের সঙ্গে এভাবে দেখা করেনি গোগোল। কলম্বিয়াতে কয়েকটা তুচ্ছ ঘটনা ছাড়া তার জীবনে একমাত্র স্মরণীয় প্রেম রুথের সঙ্গে। ম্যাক্সিনের সঙ্গে আজ কী ঘটতে চলেছে, সে জানে না বটে, কিন্তু আমন্ত্রণটা এমনভাবে এসেছিল যে সে এড়াতেও পারেনি। অস্বীকার করে লাভ নেই, ম্যাক্সিন সম্পর্কে তার আগ্রহ বাড়ছে। আকর্ষণ বোধ করছে সে। এই মেয়েটির সাহসী পা ফেলা দারুণ ভাল লাগছে তার।

বাড়িটা দেখে গোগোল অবাক হয়ে গেল। গ্রিক প্যাটার্নের বাড়ি। গেট খোলার আগে কয়েক মুহূর্ত গোগোল চুপ করে দাঁড়িয়ে পর্যটকের মতো দেখল বাড়িটা। কলিং বেলের নীচে নাম লেখা: র‍্যাটলিফ। ঘণ্টি বাজানোর পর বেশ কিছুক্ষণ গোগোল দাঁড়িয়ে। ভুল ঠিকানায় এসে পড়েছে কি না বোঝার জন্য সে পকেট থেকে ঠিকানা লেখা কাগজের টুকরোটা বের করে মিলিয়ে দেখছে, এমন সময়ে ম্যাক্সিন এল। এক পায়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে সে গোগোলের গালে চুমু খেল, অন্য পাটা পিছন দিকে আলতো করে তোলা। তার পা খালি। কালো উলের প্যান্ট আর ঘিয়ে রংয়ের পাতলা কার্ডিগান পরে আছে। কার্ডিগানের নীচে সম্ভবত ব্রা ছাড়া কিছু নেই। চুল আগের মতোই অগোছালো করে বাঁধা। ভিতরে ঢুকে বর্ষাতিটা স্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে রাখতে হল, ফোল্ডিং ছাতাটা ছাতা রাখার জায়গায়। হলে ঝোলানো আয়নায় চট করে নিজেকে দেখে নিল গোগোল, টাই আর চুল ঠিক করে নিল।

হল থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে রান্নাঘরে যেতে হয়। গোগোলকে নিয়ে গেল ম্যাক্সিন। রান্নাঘরটা সম্ভবত বাড়িটার পুরো একটা তলা অধিকার করে আছে, এতটাই বড়। একদিকে বিরাট বড় খাবার টেবিল, অন্যদিকে ফ্রেঞ্চ দরজা। সেখান দিয়ে বাইরের বাগানে যাওয়া যায়। রান্নাঘরের দেওয়ালে মোরগ আর নানা রকম মশলাগাছের ছবি। বেশ কয়েকটা তামার রান্নার পাত্রও পেরেক থেকে ঝুলছে। খোলা শেলফে গাদাগাদা রান্নার বই, ফুড এনসাইক্লোপিডিয়া আর খাওয়াদাওয়ার উপর হরেক বই। একটা মাংস কাটার পাথরের সামনে এক মহিলা দাঁড়িয়ে। তিনি কাঁচি দিয়ে গুচ্ছের সবুজ বিনের মাথা কাটছেন।

"আমার মা, লিডিয়া," ম্যাক্সিন পরিচয় করিয়ে দেয়। তারপর টেবিলের

নীচে ঘুমিয়ে থাকা একটা লালচে খয়েরি ককার স্প্যানিয়েলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, "আর এই হল সিলাস।"

লিডিয়া মেয়ের মতোই লম্বা আর ছিপছিপে। তাঁর কালচে সোজা চুল সুন্দর করে কাটা। সেজেছেনও খুব সুন্দর। গলায়-কানে সোনার গয়না, কোমরে অ্যাপ্রন বাঁধা, পায়ের কালো চামড়ার জুতো চকচক করছে। মুখে বলিরেখা দেখা যাচ্ছে বটে, ত্বকেও দাগ পড়েছে, তবু বলতেই হয় লিডিয়া ম্যাক্সিনের চেয়েও বেশি সুন্দরী। চোখ-মুখ আরও কাটাকাটা, চিবুকের হাড় আরও উঁচু, চোখ দুটো অনেক বেশি উজ্জ্বল।

লিডিয়া বললেন, "লাভলি টু মিট ইউ, নিখিল।" তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসি, তিনি গোগোলকে বেশ মন দিয়েই দেখলেন। কিন্তু কাজ থামালেন না একবারের জন্যও। হ্যান্ডশেকও করলেন না।

ম্যাক্সিন গোগোলকে এক গ্লাস ওয়াইন ঢেলে দিল। অবশ্য তার আগে একবারও জিজ্ঞেস করল না, গোগোল অন্য কিছু চায় কি না, বলল, "চলো, তোমাকে বাড়িটা ঘুরে দেখাই।" গোগোল তার পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। ওদের দু'জনের পায়ের চাপে কার্পেটহীন সিঁড়িতে কিচকিচ শব্দ উঠছিল। বাড়িটার নকশা বেশ সহজ। প্রতি তলায় দুটো করে বিশাল ঘর। এক-একটা ঘর তার অ্যাপার্টমেন্টের থেকেও বড় হবে। সে ভদ্রভাবে বাড়িটার স্থাপত্যের এমন সব বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা করতে থাকে, যেগুলো সম্পর্কে সে জানে বা কথা বলতে পারে। দেওয়ালের রং উজ্জ্বল, হিবিস্কাস পিংক, লাইল্যাক, পিস্তাচিও। বহু ফোটোগ্রাফ, ছবি আর স্কেচ টাঙানো। একটি ঘরে এক বালিকার অয়েল পেন্টিং। নিশ্চয়ই ম্যাক্সিন, গোগোল ভাবে, যুবতী, সুন্দরী, হলুদ হাতাকাটা জামা পরা লিডিয়ার কোলে বসে আছে। প্রতি তলায় হলওয়ের দু'ধারের দেওয়ালে ছাদ পর্যন্ত উঠে গিয়েছে বইয়ের তাক। তাতে এত বই, যা পড়তে সারাজীবন লেগে যাবে। উপন্যাস, জীবনী, চিত্রশিল্পীদের বিরাট বিরাট মনোগ্রাম, স্থাপত্যশিল্পের এমন সব বই যেগুলো গোগোলের স্বপ্ন ছিল। এই অগোছালো বাড়িটায় আবার খাঁখাঁ ভাব আছে, গোগোলের সেটা বেশ লাগল। মেঝেতে কার্পেট নেই, কাঠের কাজ উঠে আসছে, হয়তো আয়তনের বিশালত্ব বোঝানোর জন্যই বহু জানালায় পরদা নেই।

সবচেয়ে উপরের তলাটায় ম্যাক্সিন একাই থাকে। শোবার ঘরের দেওয়াল পিচ রঙের, পেছনের দেওয়াল ঘেঁষে স্লে-বিছানা রাখা। বাথরুমটা লম্বাটে,

লাল আর কালো। সিংকের উপরের তাকটা হাজার রকম ক্রিমের শিশিতে ভরা। গলার জন্য ক্রিম, ঘাড়ের জন্য, চোখের জন্য, পায়ের জন্য। রাতের, দিনের, রোদ আটকানোর, ছায়ায় মাখার ক্রিম। শোবার ঘরের পাশে ছাই রঙের বসার ঘর, সেটা ম্যাক্সিন পোশাক রাখার ঘর হিসেবে ব্যবহার করে। মাটিতে, আসবাবপত্রের উপর, ম্যাক্সিনের জুতো, ব্যাগ আর জামাকাপড় ছড়িয়ে আছে, চেয়ারগুলোর হেলান দেওয়ার জায়গার উপর দিয়ে জামা ঝুলছে। অবশ্য এ-সব ছোটখাটো অগোছালোভাব বাড়িটার বিশালত্ব ও সৌন্দর্য কোনওভাবে নষ্ট করে না।

গোগোল বলে, "কী সুন্দর ফ্রিজ় ব্যান্ড জানালা।"

"কী?" ম্যাক্সিন অবাক হয়ে ওর দিকে ঘুরে তাকায়।

"এই ধরনের জানালাকে বলে," গোগোল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, "এ-সময়ের বাড়িতে আকছার দেখা যায়।"

ম্যাক্সিন প্রভাবিত হয়, বলে, "আমি জানতাম না।"

দু'জনে একসঙ্গে হেলানো কাউচের উপর বসে অষ্টাদশ শতকের ফরাসি ওয়ালপেপারের উপর একটা কফি টেবিল বই দেখে। বইটির সম্পাদনায় ম্যাক্সিন সাহায্য করেছে। বইটির দু'দিকের অংশ ওদের দু'জনের হাঁটুর উপর রাখা। ম্যাক্সিন বলে, এই বাড়িতেই সে বড় হয়েছে। কথাপ্রসঙ্গে জানায়, বস্টনে একজনের সঙ্গে কিছুদিন লিভ টুগেদার করার পর মাসছয়েক আগে এখানে ফিরে এসেছে সে। গোগোল জিজ্ঞেস করে, আলাদাভাবে কোথাও উঠে যাওয়ার কথা ম্যাক্সিন ভেবেছে কি? না, ভাবেনি। "শহরে বাড়িভাড়া করে থাকা বড্ড ঝামেলা। তা ছাড়া, এই বাড়িটা আমার পছন্দ। এর চেয়ে কোনও ভাল জায়গার কথা আমি ভাবতেই পারি না।" ম্যাক্সিন যতই আধুনিক হোক না কেন, প্রেমের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এই বাবা-মার বাড়িতে ফিরে এসে থাকার এই ব্যাপারটা বেশ মিষ্টি, পুরনো আমলের মতো, গোগোল ভাবে। সে নিজে অবশ্য এই বয়সে এ-রকম করার কথা ভাবতেই পারে না।

ডিনারের সময়ে ম্যাক্সিনের বাবার সঙ্গে দেখা হল। লম্বা, সুদর্শন, মাথাভরতি পাকা চুল। তাঁর চোখ দুটো ম্যাক্সিনের মতো সবজে-ধূসর। নাকের মাঝামাঝি নেমে এসেছে সরু, লম্বাটে ফ্রেমের চশমা। "কেমন আছ? আমি জেরাল্ড," বলে গোগোলের হাতে কাঁটাচামচে আর ন্যাপকিনের গোছা ধরিয়ে দিলেন তিনি। বললেন, টেবলটা গুছিয়ে ফেলতে। গোগোল কাজে

হাত লাগাল। সে এখন এই পরিবারের এমন সব জিনিসে হাত দিচ্ছে যা খুবই নিজস্ব, অচেনা। রুপোর বাসন টেবিলে সাজানো হলে একটি চেয়ার দেখিয়ে জেরাল্ড বললেন, “তুমি এখানে বোসো, নিখিল।” টেবিলের চারদিকে চারটি চেয়ার। গোগোল বসেছে ম্যাক্সিনের উলটোদিকে। অন্য দু-ধারে একে অন্যের দিকে মুখ করে জেরাল্ড ও লিডিয়া। সেদিন দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি গোগোলের। ম্যাক্সিনের সঙ্গে দেখা করতে যেন দেরি না হয় তা নিশ্চিত করতে গিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ সেরেছে। কিছু খায়নি। এ-বাড়ির ওয়াইনটা গোগোলের চেনা ওয়াইন থেকে ভারী, মোলায়েমও। খালি পেটে ওয়াইন পড়ায় মাথাটা এখন টলটল করছে। মাথার দু-ধারে টিপটিপ করছে গোগোলের, সঙ্গে সঙ্গে সারাটা দিন ও এই সন্ধ্যাটির জন্য হঠাৎই কৃতজ্ঞতা উথলে উঠছে। ম্যাক্সিন দুটো মোমবাতি জ্বালাল। জেরাল্ড ওয়াইনের পাত্র ভরে দিলেন। লিডিয়া বড় সাদা প্লেটে খাবার বেড়ে দিলেন। পাতলা স্টেকের টুকরো ঘন রঙের সসে ভাসছে। সবুজ বিন্‌স এমনভাবে সেদ্ধ করা যাতে নেতিয়ে না যায়। একটা বাটিতে ছোট, লাল রোস্ট করা আলু প্রত্যেকের সামনে দিয়ে ঘুরে গেল। সবশেষে স্যালাড। মন দিয়ে, প্রশংসা করতে করতে খেল সবাই। মাংসটা কেমন নরম, বিন্‌সগুলো কত টাটকা। গোগোলের মা কি কখনও এত কমসংখ্যক পদ দিয়ে কোনও অতিথিকে খেতে দিতে পারতেন? বোধহয় না। মা হয়তো ম্যাক্সিনের প্লেটের দিকে তাকিয়ে থাকত, দু'বার, তিনবার করে আরও নিতে বলত। মায়ের টেবিল হলে লাইন দিয়ে রাখা থাকত বেশ কয়েকটা সার্ভিং বোল, যাতে সকলে ইচ্ছেমতো নিয়ে খেতে পারে। কিন্তু লিডিয়া গোগোলের প্লেটের দিকে তাকালেনই না। আরও আছে, ইচ্ছে করলে আরও নিতে পারে গোগোল, এমন কোনও ইঙ্গিত দিলেন না। সিলাস লিডিয়ার পায়ের কাছে বসে ছিল। লিডিয়া একসময় নিজের প্লেট থেকে মাংসের বড় একটা টুকরো নিয়ে হাতে করে তাকে খাওয়ালেন।

চারজনে দু'বোতল ওয়াইন বেশ তাড়াতাড়িই শেষ করে ফেলল। খোলা হল তৃতীয় বোতল। র‍্যাটলিফরা খাওয়ার টেবিলে প্রবল তর্ক করে, এমন সব বিষয় নিয়ে যাতে গোগোলের বাবা বা মায়ের কোনও উৎসাহই নেই। সিনেমা, জাদুঘর, ভাল রেস্তোরাঁ, রোজকার ব্যবহারের জিনিসপত্রের ডিজ়াইন। তারা নিউ ইয়র্ক নিয়ে তর্ক করে। কোনও বাড়ি, দোকান বা পাড়া নিয়ে কথা বলে যেগুলো তারা হয় ভালবাসে, নয় অপছন্দ করে। গোগোলের মনে হতে থাকে, সে এই শহরটাকে চেনেই না। তারা এই বাড়িটাকে নিয়ে

কথা বলে। এটা জেরাল্ড আর লিডিয়া সত্তর দশকে কিনেছিলেন, তখন এই পাড়ায় কেউ থাকতে চাইত না। জেরাল্ড এই অঞ্চল নিয়ে কথা চালিয়ে যায়, আর ক্লেমেন্ট ক্লার্ক মুর বলে এক ব্যক্তিকে নিয়ে কথা ওঠে। তিনি নাকি রাস্তার ওধারের সেমিনারিতে ধ্রুপদী সাহিত্য পড়াতেন। "তিনিই এখানকার বাস্তুবাড়িগুলোর জোনিং করেছিলেন," জেরাল্ড বলে, "আর লিখেছিলেন 'টোয়াজ় দ্য নাইট বিফোর ক্রিসমাস'।" গোগোল খাবার টেবিলে এমন সব কথাবার্তা কখনও শোনেনি। খাওয়া ব্যাপারটাকে এতক্ষণ ধরে আচার-অনুষ্ঠানের মতো করে তোলা, খাওয়া শেষ হওয়ার পরে খালি ওয়াইনের গ্লাস, বোতল আর পাউরুটির গুঁড়ো ছড়িয়ে থাকা টেবিলে আরামের কথোপকথন, গোগোলের অজানা। সে বুঝতে পারে এটা তার জন্য করা হচ্ছে না, র‍্যাটলিফরা রোজই এভাবে রাতের খাবার খায়। জেরাল্ড উকিল। লিডিয়া টেক্সটাইলসের কিউরেটর। গোগোলের পড়াশোনা আর পারিবারিক ভিত্তি জেনে তাঁরা খুশি হন। সে ইয়েল ও কলম্বিয়ার ছাত্র, আর্কিটেক্ট হিসেবে কেরিয়ার গড়ছে, চেহারায় ভূমধ্যসাগরীয় লাবণ্য। একসময় লিডিয়া মোমবাতির আলোয় গোগোলের দিকে তাকিয়ে বলেন, "তুমি ইতালীয় হলেও অবাক হতাম না।"

জেরাল্ড ফেরার পথে একটা ফরাসি চকোলেটের বার কিনে এনেছিলেন, চারজনে মিলে সেটা খাওয়া হল। কথায়-কথায় ভারতের কথা উঠল। জেরাল্ড সাম্প্রতিক হিন্দু মৌলবাদের সম্বন্ধে গোগোলকে জিজ্ঞেস করছিলেন, অবশ্য ওই বিষয়ে গোগোল প্রায় কিছুই জানে না। লিডিয়া ভারতীয় কার্পেট আর মিনিয়েচার পেন্টিঙের বিষয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করলেন। ম্যাক্সিন বলল, সে একবার বৌদ্ধস্তূপ নিয়ে একটা ক্লাস করেছিল। জেরাল্ডের সহকর্মী এক ভারতীয় হনিমুনে দেশে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে দারুণ একটা ছবি দেখিয়েছিলেন। জলের উপর একটা প্রাসাদ। সেটা কি কলকাতায়?

"উদয়পুরে," গোগোল বলল, "আমি ওখানে যাইনি। কলকাতা তো পূর্বদিকে। থাইল্যান্ডের অনেকটা কাছে।"

লিডিয়া স্যালাড বোলে উঁকি মেরে শেষ লেটুসের পাতাটা আঙুল দিয়ে তুলে খেলেন। এখন তাঁর চোখে-মুখে আরামের স্পষ্ট চিহ্ন। আগের থেকে বেশি আয়েশ। গালে ওয়াইনজনিত লাল আভা। "কলকাতা কেমন? সুন্দর?"

প্রশ্নটা শুনে গোগোল বিস্মিত। লোকে সাধারণত কলকাতার দারিদ্র্য, গরম আর ভিখারিদের কথাই জিজ্ঞেস করে। সে বলল, "কোনও কোনও অংশ সুন্দর। ব্রিটিশ আমলের বহু ভাল স্থাপত্য আছে। কিন্তু এখন সেগুলোর অবস্থা শোচনীয়।"

"ভেনিসের মতো," জেরাল্ড বললেন, "খাল আছে?"

"শুধু বর্ষাকালে। তখন রাস্তায় জল জমে যায়। ভেনিসের সঙ্গে একমাত্র তখনই মিল পাওয়া যায়।"

"আমি কলকাতা যাব," ম্যাক্সিন এমন আকুলভাবে কথাটা বলে যেন সারাজীবন তাকে এই একটি ইচ্ছা পূর্ণ করতে দেওয়া হয়নি। তারপর সে উঠে স্টোভের কাছে গেল, "আমার চা খেতে ইচ্ছে করছে। আর কে খাবে?"

জেরাল্ড আর লিডিয়া চা খাবেন না। তাঁরা শুতে যাওয়ার আগে *আই, ক্লডিয়াস* নামে একটা ভিডিয়ো দেখতে চান। টেবিলের এঁটো বাসন পরিষ্কার না করেই তাঁরা উঠে পড়লেন, জেরাল্ড তুলে নিলেন ওঁদের দুটি গ্লাস আর বাকি ওয়াইনটুকু। লিডিয়া আলতো করে গোগোলকে গালে চুমু খেয়ে বললেন, "গুডনাইট।" দুটি পায়ের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে উঠে মিলিয়ে গেল।

"প্রথমবার ডেটে গিয়েই মেয়েটির বাবা-মায়ের সঙ্গে এর আগে মোলাকাত হয়নি নিশ্চয়ই," ম্যাক্সিন বলল। ওরা দুজনে ভারী সাদা কাপ থেকে লাপসাং সুচং চা খাচ্ছিল।

"আমার ওঁদের খুব ভাল লেগেছে।"

"সেটা একরকমভাবে বলা যায় বই কী!"

তারা কিছুক্ষণ টেবিলে বসে থাকল। বাইরে বৃষ্টির শব্দ বাড়ির খোলা জায়গাগুলো দিয়ে ছুটে আসছে, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। মোমবাতিগুলো গলে গলে ছোট হয়ে এসেছে, মোম গড়িয়ে পড়ছে টেবিলের উপর। সিলাস এসে গোগোলের পায়ে মাথা ঘসে, মুখের দিকে তাকায়, লেজ নাড়ে। গোগোল নীচু হয়ে ভয়ে-ভয়ে ওর মাথায় হাত বোলায়।

ম্যাক্সিন দেখে। বলে, 'তোমার কোনও পোষা কুকুর ছিল না তো?"

"না।"

"কখনও ইচ্ছে হয়নি?"

"ছোটবেলায় তো সবার ইচ্ছে হয়। কিন্তু মা-বাবা ওই দায়িত্ব নিতে চাননি। তা ছাড়া দু'বছর পরপর আমাদের ভারতে যেতে হত।"

বলেই গোগোলের মনে হল এই প্রথম বাবা-মার কথা কথা সে ম্যাক্সিনকে বলল। নিজের অতীতের কথা বলল। ম্যাক্সিন কি তাকে এসব ব্যাপারে আরও জিজ্ঞেস করবে? কিন্তু সে বলল, "সিলাস তোমাকে পছন্দ করেছে। এমনিতে ও কাউকে চট করে পছন্দ করে না।"

গোগোল তাকিয়ে থাকে। ম্যাক্সিন চুলের বাঁধন খোলে। ঘাড়ের দুপাশ দিয়ে এলিয়ে দেয় চুল, একটু রাখে, তারপর হাতের মুঠোয় গুটিয়ে নেয় আনমনে। গোগোলের দিকে তাকায়, হাসে। কার্ডিগানের নীচে ম্যাক্সিনের নগ্ন শরীর বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে আসে গোগোলের।

সে বলে, "আমি যাই।" কিন্তু যখন যাওয়ার আগে টেবিল আর বাসন পরিষ্কার করে যেতে চায় গোগোল, ম্যাক্সিন রাজি হয়। গোগোলও তাতে খুশিই হয়। তারা অনেকক্ষণ ধরে কাজটা করে। ডিশওয়াশারে জল ভরে, এঁটো প্লেট ডোবায়। টেবিল মোছে। মাংস কাটার ব্লকটা পরিষ্কার করে। রান্নার বাসন মেজে তোলে। ঠিক হয়, রবিবার বিকেলে ফিল্ম ফোরামে গিয়ে আন্তোনিয়োনির ছবি দেখবে তারা।

"চলো, তোমাকে সাবওয়ে পর্যন্ত দিয়ে আসি," কাজ শেষ হলে ম্যাক্সিন বলে। সিলাসকে বেল্ট পরানো হয়, ওরও নাকি বাইরে যাওয়ার দরকার। ওরা পার্লারে গিয়ে কোট গায়ে দেয়। উপরের তলায় টিভি চলার মৃদু শব্দ পাওয়া যায়। সিঁড়ির নীচে এসে থমকে দাঁড়ায় গোগোল, "তোমার বাবা-মাকে ধন্যবাদ জানানো হল না।"

"কেন? কীসের ধন্যবাদ?"

"আমাকে নেমন্তন্ন করার। বাড়িতে আসতে দেওয়ার।"

ম্যাক্সিন গোগোলের কনুইয়ের খাঁজে হাত ঢুকিয়ে দেয়। বলে, "পরের বার বোলো।"

প্রথম থেকেই সে ওদের জীবনে অনায়াসে ঢুকে পড়ল। সারাজীবন যেমন অতিথিসৎকার সে দেখে এসেছে, এদেরটা একেবারেই সে-রকম নয়। র‍্যাটলিফরা লোক ভাল, উদারও। কিন্তু তারা কখনও নিজেদের অসুবিধে করে বা নিয়ম ভেঙে অতিথি আপ্যায়ন করে না। তারা যেন মনে করে, তাদের জীবন সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য গোগোলের ক্ষেত্রে সেটাই সত্যি। জেরাল্ড আর লিডিয়ার কাজ আছে, তাঁরা কখনও কোনও

বিষয়ে অতিরিক্ত নাক গলান না। গোগোল আর ম্যাক্সিন যেমন খুশি আসে যায়, সিনেমা দেখে বা বাইরে খায়। গোগোল ম্যাক্সিনের সঙ্গে ম্যাডিসন অ্যাভিনিউতে শপিং করতে যায়। বড় বড় দোকানে ঢুকে ম্যাক্সিন দামি কোলোন কেনে, খরচের কথা মোটেও ভাবে না। ওরা ছোট ছোট অন্ধকার রেস্তোরাঁয় ঢুকে ছোট্ট টেবিলে বসে খায়, কিন্তু সেখানে দামের অঙ্ক বিশাল। প্রায় প্রতিদিনই রাতে ওরা ম্যাক্সিনের বাবা-মায়ের বাড়িতে ফিরে আসে। রোজই অল্প মুখরোচক খাবার ওদের জন্য থাকে, ওয়াইনও থাকে। একসঙ্গে ম্যাক্সিনের থাবার মতো পায়াওয়ালা বাথটবে স্নান করে ওরা, পাশের মেঝেতে গ্লাসে ওয়াইন বা সিঙ্গল মল্ট হুইস্কি রাখা থাকে। রাতে ওরা একসঙ্গে শোয়। যে-ঘরে ম্যাক্সিন ছোটবেলা থেকে বড় হয়ে উঠেছে, সেই ঘরে। নরম, এলানো গদির উপর। সে সারারাত ম্যাক্সিনের উনুনের মতো গরম শরীর জড়িয়ে ধরে থাকে। জেরাল্ড আর লিডিয়ার শোবার ঘরের ঠিক উপরের ঘরটিতে শুয়ে ওরা আশ্লেষে আদর করে। যে-সব রাতে বেশি দেরি করে কাজ করতে হয়, গোগোল সোজা চলে আসে। ম্যাক্সিন ওর জন্য খাবার গরম করে রাখে। খেয়ে দু'জনে সোজা উপরের ঘরে চলে যায়। জেরাল্ড আর লিডিয়া কিছুই মনে করেন না। সকালে ওরা দু'জনে একসঙ্গে রান্নাঘরে নেমে আসে, চুল আলুথালু। কফি চায়, পাউরুটি আর জ্যাম খায়। প্রথম রাতটি ও-বাড়িতে কাটানোর পর সে নীচে আসতে খুব লজ্জা পেয়েছিল। সে স্নান করে নিয়েছিল সকাল-সকাল, আগের রাতের কোঁচকানো শার্ট আর প্যান্টই পরে ফেলেছিল। কিন্তু লিডিয়া আর জেরাল্ড শুধুই হেসেছিলেন। তাঁদের পরনে তখনও বাথরোব। তাঁরা গোগোলকে পাড়ার বেকারির বানরুটি খেতে দিয়েছিলেন, বাড়িয়ে দিয়েছিলেন খবরের কাগজের পাতা।

খুব দ্রুত সে প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। ম্যাক্সিনের প্রেমে, বাড়িটার প্রেমে, জেরাল্ড ও লিডিয়ার জীবনযাত্রার প্রেমে। ম্যাক্সিনের অগোছালো ভাব তার ভাল লাগে, ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা হাজারটা জিনিসের স্তূপ ভাল লাগে। উপরের তলায় তারা দু'জনে একা থাকলে ম্যাক্সিনের দরজা বন্ধ না করে বাথরুমে যাওয়ার স্বভাব ভাল লাগে। পোলেনটা বা রিসোটোর মতো খাবার খায় ওরা, গোগোল তাতেও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। বুইয়াবেস বা ওসো বুকো, পার্চমেন্ট কাগজে সেঁকা মাংস খেতে তার ভাল লাগে। ও-বাড়ির বাসনের ওজনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তার হাত, কোলের ওপর ও-বাড়ির ন্যাপকিন ভাঁজ করে রাখাতেও। সে শেখে, সিফুড দিয়ে রাঁধা পাস্তার উপর

পারমেসান চিজ় কুরিয়ে দিতে নেই, ডিশওয়াশারে কাঠের চামচ দিতে নেই। ওখানে রাত কাটালে বেশি তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে যায় তার, কেন-না নীচে সিলাস ডাকে। সকালে ও বাইরে যেতে চায়। গোগোল শেখে কী করে প্রতি সন্ধ্যায় ওয়াইনের কর্ক খোলার ছোট্ট শব্দটির জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

ম্যাক্সিন নিজের অতীত ঢাকার কোনও চেষ্টা করে না। সে মার্বেল কাগজের অ্যালবাম খুলে পুরনো প্রেমিকদের ছবি দেখায়। সে-সব সম্পর্ক নিয়ে সে খোলাখুলি আলোচনা করে। নিজের জীবন নিয়ে ম্যাক্সিনের কোনও দুঃখ নেই। গোগোল জানতে পারে, ম্যাক্সিন কোনওদিন অন্য কেউ হতে চায়নি। অন্য কোথাও, অন্য কোনওভাবে বড় হতে চায়নি। নিজের জীবন নিয়ে তার কোনও হতাশা ও অপ্রাপ্তির বোধ নেই। গোগোলের মনে হয়, তাদের দু'জনের মধ্যে এই পার্থক্যটিই সবচেয়ে গভীর। ম্যাক্সিনের এই বিরাট বাড়িটায় বড় হয়ে ওঠা বা দামি পাবলিক স্কুল এডুকেশনের চাইতে এই মানসিক স্থৈর্যই তাকে গোগোলের চেয়ে আলাদা করে রাখে। অন্যদিকে, অবাক হয়ে সে দেখে, ম্যাক্সিন কতরকমভাবে ঠিক ওর বাবা-মায়ের মতো। সে বাবা-মায়ের রুচি-পছন্দও অনুকরণ করে। খাওয়ার টেবিলে সে বই, ছবি বা চেনা লোকজনকে নিয়ে ওঁদের সঙ্গে এমনভাবে তর্ক করে, যেমন লোকে বন্ধুদের সঙ্গে করে থাকে। গোগোলের বাবা-মায়ের সঙ্গে গোগোলের যে দূরত্ব, তেমনটি এদের মধ্যে একেবারেই নেই। বাধ্য হয়ে কথা মেনে চলার ব্যাপারই নেই। গোগোলের বাবা-মায়ের মতো ম্যাক্সিনের বাবা-মা ম্যাক্সিনকে মোটেই কিছু করতে জোর করেন না। কিন্তু ম্যাক্সিন কী সুন্দরভাবে তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে তাঁদের পাশেই থাকে।

ম্যাক্সিন গোগোলের জীবন সম্পর্কে কিছু কথা শুনে অবাক হয়: বাবা-মায়ের সব বন্ধুই যে বাঙালি, তাঁদের সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছিল, মা রোজ ভারতীয় পদ রান্না করেন, তিনি শাড়ি আর টিপ পরেন। "সত্যি?" সে জিজ্ঞেস করে, পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না, "তোমাকে দেখে তো মনে হয় না। তুমি একেবারেই অন্য রকম।" গোগোল অপমানিত বোধ করে না, কিন্তু মনে-মনে বোঝে দু'জনের মধ্যে একটা বিভাজন সৃষ্টি হল। তার কাছে, সম্বন্ধ করে বিয়ে করা অসম্ভব, যদিও তার বহু চেনা লোকের ওইভাবে বিয়ে হয়েছে। তবে তাদের সঙ্গে জেরাল্ড আর লিডিয়ার জীবনকে এক করে দেখাও তো সম্ভব নয়: লিডিয়ার জন্মদিনে জেরাল্ডের দেওয়া দামি গয়না, কোনও কারণ ছাড়াই বাড়িতে ফুল নিয়ে আসা, পরস্পরকে খোলাখুলি চুমু

খাওয়া, শহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে যাওয়া বা বাইরে ডিনার করতে যাওয়া। ঠিক গোগোল আর ম্যাক্সিনের মতো। সন্ধেয় সোফার উপরে জেরাল্ড ও লিডিয়াকে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা থাকতে দেখে গোগোল ভাবে, তার নিজের বাবা-মার মধ্যে সে সারাজীবনে একবারও শারীরিক ঘনিষ্ঠতা দেখেনি। ওঁদের মধ্যে যদি প্রেম থেকেও থাকে, তা একেবারেই ব্যক্তিগত, কোনওভাবে প্রকাশ করার যোগ্য নয়। ম্যাক্সিনকে একথা বললে উত্তর আসে, "কী দুঃখের ব্যাপার!" গোগোলের মনখারাপ হয়ে যায় বটে, কিন্তু সে এ-বিষয়ে একমত না হয়ে পারে না। একদিন ম্যাক্সিন জিজ্ঞেস করে, গোগোলের বাবা-মা কি চান, গোগোল ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করুক? প্রশ্নটা কৌতূহল থেকেই করা, কোনও বিশেষ উত্তরের প্রত্যাশা না করেই। গোগোলের কিন্তু হঠাৎই বাবা-মায়ের উপর ভারী রাগ হয়। বাবা-মা কেন অন্য রকম নয়? সে জানে, ম্যাক্সিনের প্রশ্নের উত্তর কী, তাও মিথ্যে করে বলে, "জানি না। হয়তো ওঁরা চান। তবে ওঁরা কী চান না-চান, তাতে কিছু যায় আসে না।"

গোগোলের বাড়িতে ম্যাক্সিন আসে, তবে কম। গোগোলের পাড়ার কাছাকাছি ওদের আসার কোনও কারণ ঘটে না। এমনকী গোগোলের অ্যাপার্টমেন্টের সম্পূর্ণ নির্জনতাও ওদের আকর্ষণ করে না। তবু, কোনও কোনও রাতে, যখন জেরাল্ড আর লিডিয়ার কোনও পার্টি থাকে, বা হয়তো শুধুই ভারসাম্য বজায় রাখতে, ম্যাক্সিন আসে। ছোট্ট ঘরটা ওর গার্ডেনিয়া পারফিউমের গন্ধে ভরে ওঠে। ওর কোট, ওর বিরাট চামড়ার ব্যাগ, ওর ছেড়ে ফেলা জামাকাপড়ে উপচে পড়ে ছোট্ট জায়গাটা। দু'জনের শরীর মিশে যায়, নীচ থেকে গাড়িঘোড়ার শব্দ ভেসে আসে। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ওকে আনতে গোগোলের অস্বস্তি হয়। দেওয়ালে ঝোলানোর মতো কিছু নেই, লাইটটা ফিকে হয়ে এসেছে, নতুন কেনা হয়নি। "নিখিল, এ কী বিশ্রী!" দেখা হওয়ার মাসতিনেকের মধ্যেই ম্যাক্সিন বলেছিল, "আমি তোমাকে এখানে থাকতে দেব না।" অ্যাপার্টমেন্টটা প্রথমবার দেখতে এসে অসীমাও ঠিক এই কথা বলেছিল। সেবার মায়ের সঙ্গে তর্ক করেছিল গোগোল। তার অল্প জিনিস, কমের খরচে একা-একা থাকা কত ভাল, তা বুঝিয়েছিল। কিন্তু ম্যাক্সিনের কথায় তেমন কিছুই বলল না। বরং যখন আলতো গলায় ম্যাক্সিন বলল, "তুমি আমার সঙ্গে থাকবে চলো," তখন ওর শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। ততদিনে বোঝা গিয়েছে, ম্যাক্সিন বানিয়ে কিছু বলে না। সত্যি সত্যি না চাইলে সে কখনও ও-কথা বলত না। কিন্তু ওর বাবা-মা কী

ভাববে? ম্যাক্সিন কাঁধ ঝাঁকায়। “আমার বাবা-মা তোমাকে ভালবাসে,” সে নিশ্চিতভাবে বলে, কোনও আবেগ না দেখিয়ে, ঠিক যেমনভাবে সে অন্য সব কিছু বলে। সুতরাং গোগোল ম্যাক্সিনদের বাড়িতে উঠে যায়। কয়েক ব্যাগ কাপড় নিয়ে যায় শুধু। বাকি জিনিস আমস্টারডাম অ্যাভিনিউয়ের অ্যাপার্টমেন্টে পড়ে থাকে। সেখানকার অ্যানসারিং মেশিনে তার মেসেজগুলো রেকর্ড হয়, নামহীন চিঠির বাক্সে জমা হয় তার নামলেখা চিঠি।

* * *

ছ'মাসের মধ্যে সে র‍্যাটলিফদের বাড়ির একটা চাবি পেয়ে গেল। ম্যাক্সিন রুপোর একটা টিফানি চেনে লাগিয়ে চাবির গোছাটা তাকে উপহার দিল। ততদিনে গোগোল ওকে জেরাল্ড-লিডিয়ার মতো ম্যাক্স বলে ডাকতে শুরু করেছে। সে পাড়ার লন্ড্রি থেকে শার্ট কাচায়। ম্যাক্সিনের বাথরুমে হাজারটা শিশি-বোতলের মধ্যে তার টুথব্রাশ ও রেজ়ার থাকে। সকালে উঠে জেরাল্ডের সঙ্গে দৌড়োতে বেরোয়। হাডসন নদীর পাশ দিয়ে ব্যাটারি পার্ক সিটি পর্যন্ত গিয়ে ওরা ফিরে আসে। সিলাসকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সে নিজেই উদ্যোগী হয়েছে। সিলাস গাছের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এগোয়, গোগোল বেল্টটা ধরে থাকে। সিলাস মলত্যাগ করলে সে প্লাস্টিকের ঠোঙায় নোংরাটা তুলে নেয়। উইকএন্ডে সে বেরোয় না, জেরাল্ডদের বইয়ে তাক থেকে নিয়ে বই পড়ে। বিরাট বিরাট পরদাহীন জানালা দিয়ে সারাদিন রোদ আসে। গোগোলের খুব ভাল লাগে। কয়েকটা বিশেষ চেয়ার বা সোফায় বসতে তার ভাল লাগে, বাড়িতে না থাকলে সে দেওয়ালের ছবিগুলো কল্পনা করতে পারে। তবে মাঝে মাঝে তাকে ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে যেতেই হয়। অ্যানসারিং মেশিনের টেপটা নতুন করে লাগাতে, ভাড়া দিতে আর বিল মেটাতে।

শুক্র-শনিবার সে জেরাল্ড ও লিডিয়ার ডিনার-পার্টির জন্য বাজার করে। রান্নাঘরেও হাত লাগায়। আপেলের খোসা ছাড়ায়, কুচো চিংড়ির শির বের করে, ঝিনুক ছাড়ায়, জেরাল্ডের সঙ্গে মাটির নীচের ঘর থেকে অতিরিক্ত চেয়ার নিয়ে আসে। ওয়াইনের বোতল নিয়ে আসে। লিডিয়ার হালকা চালে অতিথি আপ্যায়ন করার প্রেমে পড়ে গিয়েছে সে। ওদের ডিনার-পার্টিগুলো তার খুব ভাল লাগে। মোটে ডজনখানেক অতিথি মোমবাতির আলোয়

উজ্জ্বল টেবিলের চারদিকে বসে। অতিথিদের মধ্যে সংস্কৃতিজগতের লোকই বেশি থাকে। চিত্রকর, সম্পাদক, শিক্ষাবিদ, গ্যালারির মালিক। তাঁরা কোর্সের পর কোর্স ডিনার খান, ভাল ভাল বিষয়ে সারা সন্ধে ধরে কথা বলেন। গোগোলের বাবা-মায়ের পার্টি থেকে কত আলাদা! সেখানে জনাতিরিশেকের কম লোক কখনও হত না, সঙ্গে বাচ্চারা তো আছেই। সারাদিন ধরে বেনিয়মের হট্টমেলা লেগে থাকত। মাছ আর মাংস একই সঙ্গে খেতে দেওয়া হত। এত লোক, যে সবাই একসঙ্গে খেতে পারত না, বারেবারে খেতে হত। যে-পাত্রে রান্না হয়েছে, সে-পাত্রটাই টেবিলে সাজিয়ে দিত মা। যে যেখানে, যে-ঘরে পারত, বসে পড়ে খেয়ে নিত। অর্ধেক লোকের খাওয়া হয়ে গেলে বাকি অর্ধেক খাওয়া আরম্ভ করত। জেরাল্ড ও লিডিয়ার ডিনার টেবিলে তাঁরাই মূল স্থান অধিকার করে থাকেন। আর গোগোলের বাবা-মা? নিজেদের বাড়িতেই কেটারারের মতো ব্যবহার করত তারা। সবসময়ে খেয়াল রাখা, কে খেল, কতটা খেল। অন্য সবার খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর বাবা-মা খেত। সিংকে তখন প্লেটের গাদা জমে উঠেছে। এক-এক সময়, জেরাল্ডদের টেবিলে যখন হাসির রোল ওঠে, নতুন ওয়াইনের বোতল খোলা হয়, গোগোল ওয়াইন নেবার জন্য যখন নিজের গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরে, তখন তার মনে হয় ম্যাক্সিনের পরিবারের সঙ্গে এভাবে মিশে যাওয়া যেন আসলে তার নিজের পরিবারকেই অস্বীকার করা। অশোক আর অসীমা যে শুধু ম্যাক্সিনকে চেনে না তাই নয়, ম্যাক্সিনের বাড়িতে সে কতটা সময় কাটায় তাও তারা বুঝতে পারে না। সে বোঝে, আর্থিক সম্পন্নতা ছাড়াও আরও অনেক দিক গিয়ে জেরাল্ড ও লিডিয়া এতটাই নিশ্চিন্ত, যেমনটি অশোক-অসীমা কোনওদিনও হতে পারবে না। সে কল্পনাও করতে পারে না তার বাবা-মা জেরাল্ড ও লিডিয়ার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাচ্ছে, লিডিয়ার রান্নার বা জেরাল্ডের আনা ওয়াইনের প্রশংসা করছে। র‍্যাটলিফদের বাড়ির ডিনার-পার্টির কথাবার্তায় গোগোলের বাবা-মা কোনওদিনই স্বচ্ছন্দভাবে অংশ নিতে পারবে না।

জুন মাসে জেরাল্ড-লিডিয়া নিউ হ্যাম্পশায়ারে তাদের লেকের ধারের বাড়িতে ছুটি কাটাতে চলে গেল। প্রতি বছর এমনটাই হয়ে থাকে। জেরাল্ডের বাবা-মা সারা বছর যেখানে থাকেন, সেখানে গিয়ে কিছু সময় কাটায় ওরা।

যাওয়ার আগে কয়েকদিন ধরে হলে ক্যানভাসের ব্যাগ জমা করা হল। নানা জিনিস, বাক্সভরতি ওয়াইনের বোতল, শপিংব্যাগে রকমারি খাবার। গোগোলের মনে পড়ে গেল, কলকাতা যাওয়ার আগে মা এভাবেই জিনিস প্যাক করত। লিভিং রুমে গাদা গাদা সুটকেস জড়ো করে রাখা হত। সেগুলো বারবার গোছানো হত, আবার খুলে ফেলা হত। আসলে যতজন আত্মীয়ের জন্য সম্ভব, ততজনের জন্য উপহার নিত মা-বাবা। যাওয়ার আগে অশোক আর অসীমার সে কী উত্তেজনা! তা সত্ত্বেও ওরা গম্ভীর থাকার চেষ্টা করত। হয়তো এবারে আর তত লোকজন রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে আসবে না, যারা মারা গিয়েছে তাদের আর দেখতে পাওয়া যাবে না। কলকাতায় যাওয়ার আগে বাবার প্রতিবারই টেনশন বেড়ে যেত। কী করে চারজনে অতদূর গিয়ে পৌঁছোবে। গোগোলের মনে হত, দেশে যাওয়ার মধ্যে বাবার কর্তব্যবোধেরও একটা ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু জেরাল্ড আর লিডিয়ার মধ্যে কর্তব্যের বোধ নেই, ওঁরা যান আনন্দ করতে। গোগোল আর ম্যাক্সিন দু'জনেই কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর ওঁরা এক দুপুরে রওনা হলেন, এ-নিয়ে বেশি কথাবার্তা হল না। শুধু ওঁরা চলে যেতেই কয়েকটা জিনিসও ওঁদের সঙ্গে চলে গেল। সিলাস, কয়েকটা রান্নার বই, ফুড প্রসেসর, বই আর সিডি, ফ্যাক্স মেশিন যার মাধ্যমে জেরাল্ড ব্যাবসার লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন, লাল ভলভো স্টেশন ওয়াগানটাও। রান্নাঘরে লিডিয়ার হাতে লেখা একটা চিরকুট পড়ে রইল শুধু: "আমরা গেলাম!"

চেলসার বাড়িটা এবার শুধুই গোগোল আর ম্যাক্সিনের। তারা দু'জনে সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। বিভিন্ন আসবাবপত্রের উপর মিলিত হয়। মিলিত হয় মেঝের উপর, রান্নাঘরের টেবিলের উপরে, এমনকী একবার জেরাল্ড ও লিডিয়ার সাদা চাদর বিছানো খাটেও। শনি-রবিবার তারা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে সারা বাড়িতে ঘোরে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করে। যেখানে ইচ্ছে করে, সেখানেই খায়। লিডিয়ার সেরা, দামি চিনেমাটির বাসনে করে টেক হোম জয়েন্ট থেকে কিনে আনা খাবার খায়। যেখানে পারে, সেখানেই ঘুমোয়, অসময়ে। বিরাট বিরাট জানালা দিয়ে তেরছা হয়ে রোদ এসে পড়ে ওদের নগ্ন শরীরে। গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা কঠিন রান্না বন্ধ করে দিল। সুশি, স্যালাড আর ঠান্ডা স্যামন মাছের পোচ খেয়ে দিন কাটে। লাল ওয়াইন ছেড়ে সাদা ওয়াইন ধরল তারা। অত বড় বাড়িতে দু'জনে থাকা... গোগোলের এবারে সত্যি সত্যি মনে হতে থাকে যে ওরা লিভ টুগেদার করছে। কিন্তু

এতে মোটেই সে সাবালক হয়ে ওঠার অনুভূতি পায় না, বরং স্পর্শ পায় নির্ভরতার। যদিও পুরনো জীবন থেকে সে যেন অজ্ঞাতবাস নিয়েছে, যদিও দায়িত্ব বা চাহিদা, কিছুই সে টের পায় না, তবু এবাড়িতে এখনও জেরাল্ড আর লিডিয়ার মালিকানা প্রশ্নাতীত। সে-সব খোলামেলা দিনের উপর, তাদের জীবনের উপরও জেরাল্ডদেরই মালিকানা টের পায় সে। তাঁদের বই, তাদের গানই তো পড়ছে বা শুনছে। তাঁদের বাড়ির দরজা খুলেই সে ঢোকে। তাঁদের টেলিফোন ধরে তাঁদের জন্য বার্তা লিখে রাখে।

সে জানতে পারল, বাড়িটা সুন্দর হলেও গ্রীষ্মের মাসগুলোয় এখানে কিছু বাস্তব অসুবিধা রয়েছে। সম্ভবত সেজন্যই জেরাল্ডরা গরমের সময়ে এখানে কাটাতে চান না। বাড়িতে এয়ারকন্ডিশনিং নেই। জানালাগুলোতেও রোদ আটকানোর পরদা বা স্ক্রিন নেই। যেহেতু ওঁরা গরমে এখানে থাকেন না, এগুলোর কথা ভাবাই হয়নি। সুতরাং সারাটা দিন এখানে রোদ আসে, গরম হয়ে থাকে বাড়িটা। রাতে জানালা খুলে রাখতে হয়। মশা ঢুকে কামড়ে ফুলিয়ে দেয়। ম্যাক্সিনের এই খাটটার উপর যদি মশারি খাটানো যেত! গোগোলের মনে পড়ে, কলকাতায় কী সুন্দর নীল মশারির তলায় সে আর সোনিয়া ঘুমত। খাটের ছতরিতে মশারির চারটে কোনা বাঁধা থাকত আর নীচটা গোঁজা থাকত মোটা গদির নীচে। এক-এক রাতে মশার উৎপাত তার আর সহ্য হয় না। সে আলো জ্বালিয়ে খাটের উপর দাঁড়িয়ে মশা খোঁজে। হাতে একটা গোটানো পত্রিকা বা চটি নিয়ে নেয়। ম্যাক্সিনের মশায় কোনও অসুবিধে হয় না। ওকে মশা কামড়ায়ও না। ও ঘুমচোখে গোগোলকে শুয়ে পড়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকে। কখনও কখনও মশাগুলোকে দেখতে পাওয়া যায় বটে। ছোট্ট কালো বিন্দুর মতো পিচ রঙের দেওয়ালে বসে থাকে সেগুলো। গোগোলের রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল। তবে এত উপরে যে হাত যায় না।

নিজের বাড়িতে অজুহাত দেখায় গোগোল, খুব কাজের চাপ। সমস্ত গ্রীষ্মকাল কেটে যায়, ম্যাসাচুসেট্‌সে ফেরে না সে। সত্যিই তার ফার্ম মিয়ামিতে নতুন একটা পাঁচতারা হোটেলের প্ল্যান তৈরির কাজে হাত দিয়েছে, অন্য সব ফার্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চলছে। রাত এগারোটা পর্যন্ত সে অফিসে অন্যদের সঙ্গে কাজ করে। একদিন রাতে ফোন বাজল। গোগোল আশা করে, ম্যাক্সিন হবে, তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলছে। কিন্তু না, মা।

"এত রাতে আমাকে ফোন, অফিসে ফোন করেছ কেন?" সে

অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞেস করে, চোখ তখনও কম্পিউটার স্ক্রিনে।

"কারণ তুমি তোমার অ্যাপার্টমেন্টে নেই। তুমি কক্ষনও তোমার অ্যাপার্টমেন্টে থাকো না কেন, গোগোল? মাঝরাতে ফোন করলেও তোমাকে পাই না।"

"আমি ওখানেই থাকি, মা," গোগোল বেমালুম মিথ্যে বলে দেয়, "রাতে ঘুম না হলে আমার চলে না। তাই ফোন বন্ধ করে রাখি।"

"আমি বুঝতে পারি না সবসময় ফোন বন্ধ করে রাখলে ফোন রাখার মানেটা কী?" মা বলে।

"কেন ফোন করেছ বলো।"

মা পরের শনিবারে ওকে বাড়ি যেতে বলে। ওর জন্মদিনের আগের শনিবার।

"আমি পারব না," গোগোল বলে দেয়। বলে, কাজের ডেডলাইন ওইদিনই। কিন্তু তা সত্যি নয়। আসলে ওদিনই সে ম্যাক্সিনের সঙ্গে নিউ হ্যাম্পশায়ারে যাবে। দু'সপ্তাহের জন্য। কিন্তু মা জোর করে। বাবা নাকি তার পরদিনই ওহায়ো চলে যাচ্ছেন। একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবে না গোগোল? এয়ারপোর্টে যাবে না?

গোগোল শুনেছিল, বাবা ক্লিভল্যান্ডের বাইরে কোনও একটা ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ে ন' মাস পড়াতে যাচ্ছে। কোনও একটা গ্র্যান্ট পেয়েছে বাবা আর বাবার সহকর্মী। রিসার্চের গ্র্যান্ট। বাবা ওকে ক্যাম্পাস বুলেটিনে প্রকাশিত খবরের কাটিংসহ ফোটো পাঠিয়েছিল বটে। প্রথমে ভেবেছিল, মাও সঙ্গে যাবে। বাড়িটা বন্ধ থাকবে বা ছাত্রছাত্রীদের ভাড়া দেওয়া হবে। কিন্তু মা শেষ পর্যন্ত রাজি হয়নি। সকলকে অবাক করে দিয়ে বলেছিল, একা-একা ম্যাসাচুসেট্‌সেই থাকবে। ওহায়োতে ন'মাস মা-র কিচ্ছু করার থাকবে না। বাবা গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকবে সারাদিন, মা কী করবে?

"আমাকে গিয়ে বাবাকে প্লেনে তুলে দিয়ে আসতে হবে?" গোগোল জিজ্ঞেস করল। যদিও সে জানে, বাবা-মা'র কাছে কোথাও যাওয়াটা বিশাল ব্যাপার, তা যত ছোট যাত্রাই হোক না কেন। তুলে দিয়ে আসতে হয়, গিয়ে নিয়ে আসতে হয়। সে বলল, "বাবা আর আমি তো এখন আলাদা রাজ্যে থাকি। আমি বস্টন থেকে যত দূরে, ওহায়ো থেকেও তত দূরে।"

"ও কী কথা গোগোল?" মা বলল, "তুমি চলে এসো। সেই মে মাস থেকে বাড়ি আসোনি একবারও।"

"আমি একটা চাকরি করি, মা। আমি ব্যস্ত। তা ছাড়া, সোনিয়াও তো আসছে না।"

"সোনিয়া ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকে। তুমি তো অনেক কাছে আছ, গোগোল।"

"শোনো মা, আমি ওই উইকএন্ডে যেতে পারব না," গোগোল বলল। আস্তে-আস্তে সত্যিকথাটা তার ভিতর থেকে চুঁইয়ে বেরোয়। সে জানে, মাকে এড়াতে হলে সেটাই একমাত্র পথ। "আমি ছুটিতে বেরোচ্ছি। সব ঠিকঠাক।"

"শেষ মুহূর্ত ছাড়া এ-সব কথা আমাদের বলো না কেন তুমি? কোথায় যাচ্ছ? কেমন ছুটি?"

"নিউ হ্যাম্পশায়ারে দু'সপ্তাহ কাটাব।"

'ও!" মা-র গলা নিশ্চিন্ত শোনায়, "হঠাৎ নিউ হ্যাম্পশায়ারে কেন? এখানের সঙ্গে ওখানকার পার্থক্য কী শুনি?"

"আমি একটি মেয়ের সঙ্গে যাচ্ছি। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠছে। ওর বাবা-মা'র ওখানে বাড়ি আছে।"

মা কিছু বলল না। চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। কিন্তু গোগোল বোঝে মা কী ভাবছে। ভাবছে, অন্যের বাবা-মায়ের সঙ্গে ছুটি কাটাতে যেতে পারে গোগোল, নিজের বাবা-মায়ের কাছে আসতে পারে না!

"এই জায়গাটা ঠিক কোথায়?"

"ঠিক জানি না। পাহাড়ের উপরে কোথাও।"

"ওর নাম কী?"

"ম্যাক্স।"

"সে তো ছেলেদের নাম!"

গোগোল মাথা নেড়ে বলে, "না, মা। ম্যাক্সিন।"

তাই, নিউ হ্যাম্পশায়ারে যাওয়ার পথে গোগোল আর ম্যাক্সিন পেম্বারটন রোডে দুপুরের খাবার খেতে গিয়ে পৌঁছোল। শেষ অবধি এটুকু করতে গোগোল রাজি হয়েছে। ম্যাক্সিনের অবশ্য আপত্তি নেই। যাওয়ার রাস্তাতেই যখন পড়ছে। তা ছাড়া গোগোলের বাবা-মা'কে সে দেখতে চায়। ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে তারা এসেছে। গাড়ির পিছনে নানা জিনিস ভরতি। জেরাল্ড আর

লিডিয়া পোস্টকার্ডে চিঠি লিখে অনেক জিনিস আনতে বলেছিলেন: ওয়াইন, আমদানি করা বিশেষ ধরনের পাস্তা, অলিভ অয়েলের বিরাট এক টিন, পারমেসান আর এসিয়াগো চিজ়। সে জিজ্ঞেস করেছিল, এত জিনিসপত্রের দরকার কী? ম্যাক্সিন বলল, যেখানে তারা যাচ্ছে, সে নাকি এক তেপান্তরের মাঠ। ওখানকার দোকান থেকে সওদা করে বাঁচতে হলে শুধু পোটাটো চিপ্‌স, ওয়ান্ডার ব্রেড আর পেপসি খেয়ে তাকতে হবে। ম্যাসাচুসেট্‌সে যাওয়ার পথে গোগোল ম্যাক্সিনকে কিছু কথা বুঝিয়ে বলল, এমন সব কথা যা ম্যাক্সিনের আগে থেকে জানা জরুরি। বলল, গোগোলের বাবা-মায়ের সামনে চুমু খাওয়া বা পরস্পরকে ছোঁয়া চলবে না, আর খাবারের সঙ্গে কোনও মদ থাকবে না।

ম্যাক্সিন অবাক হয়ে বলল, "গাড়ির ট্রাংকে তো যথেষ্ট ওয়াইনের বোতল রয়েছে।"

"তাতে কিছু হবে না। আমাদের বাড়িতে কর্কস্ক্রু বলে কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নেই।"

পুরো ব্যাপারটা ম্যাক্সিন অবশ্য এক দুপুরের চ্যালেঞ্জ হিসেবে মেনে নেয়। অদ্ভুত বারণগুলো তাকে আগ্রহী করে তোলে। সে ভাবে, এমনটি আর কখনও করতে হবে না। ম্যাক্সিন গোগোলকে তার বাবা-মায়ের স্বভাবের সঙ্গে কোনওভাবে মেলাতে পারে না। সে বিশ্বাস করতে পারে না, এই প্রথম গোগোল কোনও মেয়েবন্ধুকে নিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে। গোগোলের অবশ্য এ নিয়ে কোনও উৎসাহ নেই। কাজটা মিটে গেলে সে বাঁচে। বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে সে বোঝে, পুরো জায়গাটাই ম্যাক্সিনের কাছে অচেনা। শপিং প্লাজ়া, বিরাট মোটা ইটের দেওয়ালওয়ালা পাবলিক স্কুল (যেখান থেকে সে আর সোনিয়া দু'জনেই পাস করেছে), একে অন্যের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলো, বাড়ির চারদিকে ঘাসওয়ালা সিকি একর বাগান, নোটিশ লাগানো: চিলড্রেন অ্যাট প্লে। সে জানে, তার বাবা-মায়ের কাছে এত গর্বের, এত প্রিয় এই যে বাড়ি, এই যে জীবন, তা ম্যাক্সিনের কাছে কোনও অর্থই নিয়ে আসে না। আর এ-সব সত্ত্বেও সে গোগোলকে ভালবাসে।

স্বয়ংক্রিয় সিকিউরিটি সিস্টেম লাগানোর কোম্পানির একটা ভ্যান বাড়ির ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে, তাই গোগোল রাস্তাতেই গাড়ি পার্ক করল। তারপর ম্যাক্সিনকে নিয়ে পাথরবসানো রাস্তা ধরে ঢুকে কলিং বেল বাজাল, কারণ

তার বাবা-মা সবসময় বাড়ির দরজা বন্ধ করে রাখে। দরজা খুলল মা। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল মা ঘাবড়ে গিয়েছে। ভাল শাড়ি পরে আছে, লিপস্টিক আর পারফিউম লাগিয়েছে। গোগোল আর ম্যাক্সিনের পরনে খাকি, টি-শার্ট, আর নরম মোকাসিন জুতো। তার পাশে মা-র সাজগোজ বেশিই ঠেকছিল।

"হাই মা," গোগোল ঝুঁকে পড়ে চট করে মা-র গালে চুমু খেল, "এই যে ম্যাক্সিন। ম্যাক্সিন, আমার মা, অসীমা।"

ম্যাক্সিনও অসীমার গালে ঠোঁট ছোঁয়াল, "ইট্‌স সো নাইস টু মিট ইউ, অসীমা। এগুলো তোমার জন্য।" ম্যাক্সিন অসীমার হাতে সেলোফেন কাগজে মোড়া একটা ঝুড়ি তুলে দিল, তাতে নানা ধরনের জেলি ও চাটনির শিশি সাজানো। গোগোল জানে, মা কোনওদিন ওইসব শিশি খুলবে না, তবু ম্যাক্সিনকে কিনতে বারণ করেনি। সে বাড়িতে ঢুকল, কিন্তু আগেকার অভ্যাসমতো জুতো খুলে বাইরের ঘরে রাখা হাওয়াই চটি পরল না। জুতো পরেই ঘরে ঢুকে গেল। মায়ের পিছনে দু'জন লিভিং রুম দিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। মা উনুনের দিকে চলে গেল, তাতে শিঙাড়া ভাজা হচ্ছে। বাতাসে ধোঁয়া ভাসছে।

ছান্তা দিয়ে কড়াই থেকে একটা শিঙাড়া তুলে কাগজের ন্যাপকিন দিয়ে ঢাকা প্লেটে সেটা রাখতে রাখতে গোগোলের মা ম্যাক্সিনকে বলল, "গোগোলের বাবা উপরে আছেন। আসলে, অ্যালার্ম লাগানোর লোকটা এসেছে তো। সরি, দুপুরের খাবার এক্ষুনি তৈরি হয়ে যাবে।" একটি থেমে বলল, "আসলে আমি ভেবেছিলাম তোমরা আরও আধঘণ্টাটাক বাদে পৌঁছোবে।"

"হঠাৎ অ্যালার্ম লাগানোর কী দরকার পড়ল?" গোগোল জিজ্ঞেস করল।

"তোমার বাবার ইচ্ছে। এখন থেকে আমি একা থাকব তো। কিছুদিনের মধ্যে পাড়ায় নাকি দুটো চুরি হয়েছে, তাও দুপুরের দিকে," তারপর ম্যাক্সিনের দিকে ফিরে অসীমা বলল, "এ-রকম ভাল জায়গাতেও আজকাল চুরি-ডাকাতি হচ্ছে।"

মা দু'জনের দিকে ফেনাওয়ালা গোলাপি লস্যি বাড়িয়ে দিল। মিষ্টি, ঘন, গোলাপজল মেশানো লস্যি। ওরা বসল বাইরের ঘরে, যেখানে বাইরের লোক না থাকলে ওরা কখনও বসে না। ম্যাক্সিন সোনিয়া আর গোগোলের ছোটবেলার ছবি দেখল, পারিবারিক ছবি দেখল। অসীমার শাড়ির জমিন দেখে প্রশংসা করল ম্যাক্সিন, বলল লিডিয়া মেট্রোপলিটান মিউজ়িয়াম অব আর্টে কাপড়ের কিউরেটর।

"তুমি ওখানে গিয়েছ, মা। সেই যে ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউতে বিরাট মিউজিয়ামটা। অনেকগুলো সিঁড়ি। ওখানে নিয়ে গিয়ে তোমাকে মিশরের মন্দির দেখিয়েছিলাম, মনে পড়ে?" গোগোল বলল।

"হ্যাঁ, মনে আছে। আমার বাবাও শিল্পী ছিলেন," অসীমা দেওয়ালে ঝোলানো গোগোলের দাদুর আঁকা একটা জলরং দেখালেন।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপর গোগোলের বাবা ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে ক্লিপবোর্ড হাতে ইউনিফর্ম পরা এক ভদ্রলোক। গোগোল দেখল, বাবা মোটেই মায়ের মতো সাজগোজ করেনি। বাবার পরনে খয়েরি রঙের পাতলা সুতির প্যান্ট, অল্প কোঁচকানো ছোট হাতা শার্ট তার উপর ঝুলিয়ে পরা। পায়ে হাওয়াই চটি। পাকা চুলগুলো আরও পাতলা হয়ে এসেছে, ভুঁড়িটা আরও বেড়েছে। ইউনিফর্ম পরা লোকটি বলল, "এই নিন রসিদের কপি। কোনও অসুবিধে হলে ৮৮৮-এ ফোন করবেন।" বাবার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে সে বেরিয়ে গেল।

গোগোল বলল, "হাই বাবা, এ হল ম্যাক্সিন।"

বাবা শপথ নেবার মতো করে একটা হাত তুলে বলল , "হ্যালো," কিন্তু ওদের সঙ্গে বসল না। ম্যাক্সিনকে জিজ্ঞেস করল, "বাইরে ওটা তোমার গাড়ি?"

ম্যাক্সিন বলল, "ভাড়াগাড়ি।"

"ওটা ড্রাইভওয়েতে নিয়ে এসে রাখো না।"

"থাক না, যেখানে আছে ঠিক আছে," গোগোল বলল।

কিন্তু বাবা শুনল না, "সাবধান হলে ক্ষতি কী? পাড়ার বাচ্চাগুলো কোনও খেয়াল রাখে না। একবার আমার গাড়ির জানালা ভেঙে একটা বেসবল ঢুকে গিয়েছিল। তোমরা চাইলে আমি গাড়িটা ঠিকমতো পার্ক করে দিতে পারি।"

বাবা-মায়ের সারাক্ষণ এই বিপদের ভয়। বিরক্ত গোগোল বলল, "আমিই করে দিচ্ছি।" বাড়িতে এসে সে দেখল, খাবার তৈরি, তবে সেদিনের আবহাওয়ার পক্ষে খাবার একটু ভারীই। শিঙাড়া ছাড়াও বিরিয়ানি আছে, চিকেন কাটলেট আছে, বাগানের টোম্যাটো দিয়ে করা চাটনি আছে। গোগোল জানে এইসব রাঁধতে মায়ের দু'দিন লেগেছে। একটু খারাপই লাগে তার। জলের গ্লাস ভরে রাখা হয়েছে, কাগজের ন্যাপকিন ভাঁজ করে রাখা, প্লেট-কাঁটাচামচ সব ডাইনিং টেবিলে যত্ন করে সাজানো। ডাইনিং টেবিলে

বিশেষ সময় ছাড়া তারা খায় না। চেয়ারগুলোর পিঠ উঁচু, সোনালি ভেলভেটের গদি লাগানো।

"খেতে শুরু করো," মা ডাইনিং রুম আর রান্নাঘরের মধ্যে যাতায়াত করেই চলেছে। মা-বাবা ম্যাক্সিনকে নিয়ে একটু অস্বস্তিতে রয়েছে। জিজ্ঞেস করল, ও কোথায় কলেজে গিয়েছে, ওর বাবা-মা কী করেন। কিন্তু ম্যাক্সিন সেই অস্বস্তি বা জড়তাকে কোনও পাত্তাই দিল না। সে পুরো মন দিয়ে অসীমা আর অশোকের কথা শুনছে, জড়তা কাটিয়ে দিচ্ছে, কথা বলছে। গোগোলের মনে পড়ল, প্রথমবার আলাপ হওয়ার দিন সে এভাবেই গোগোলের জড়তাও কাটিয়েছিল। সে বাবাকে ক্লিভল্যান্ডের রিসার্চ প্রজেক্ট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, মাকে জিজ্ঞেস করল স্থানীয় লাইব্রেরিতে পার্টটাইম কাজ কেমন চলছে। গোগোলের মন অবশ্য কথাবার্তায় নেই। সে জানে, ওদের বাড়িতে খাবার পরস্পরকে এগিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ নেই, বা ওরা খাওয়ার সময় মুখ বন্ধ করে রাখতে জানে না। সে লক্ষ করল খেতে খেতে ম্যাক্সিন চুলে আঙুল দিয়ে বিলি কাটলে বাবা-মা চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। অবশ্য ম্যাক্সিন পেটভরেই খেল। মাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, কোন রান্নাটা কীভাবে হয়েছে, বলল যে এগুলোই তার খাওয়া সেরা ভারতীয় রান্না। এমনকী মা যখন রাস্তার জন্য কিছু শিঙাড়া আর কাটলেট প্যাক করে দেবে বলল, ম্যাক্সিন তাতে আগ্রহের সঙ্গে রাজি হয়ে গেল।

মা বলছিল, একা-একা বাড়িতে থাকতে একটু ভয় করবে। ম্যাক্সিন বলল, তারও ভয় করত। বলল, একবার সে একা থাকার সময় তার বাবা-মার বাড়িতে চুরি হয়েছিল। ম্যাক্সিন বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকে জেনে মা বলল, "সত্যি? আমার ধারণা ছিল আমেরিকাতে কেউ বড় হয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকে না।" ম্যাক্সিন ম্যানহাটনে জন্মেছে, বড় হয়েছে শুনে বাবা মাথা নেড়ে বলল, "নিউ ইয়র্ক বড্ড বড়। গাদাগাদা গাড়ি, বিরাট লম্বা লম্বা বাড়ি।" গোগোলের গ্র্যাজুয়েশনের সময়ে কলম্বিয়ায় গিয়ে কী হাল হয়েছিল, বাবা তা-ও ফলাও করে বলল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে গাড়ির বুটের তালা ভেঙে সুটকেস চুরি হয়ে গিয়েছিল। কনভোকেশনে জ্যাকেট বা টাই না পরেই যেতে হয়েছিল।

"তোমরা সত্যিই রাতে খেয়ে যাবে না?" খাওয়ার শেষ দিকে মা প্রশ্ন করল।

কিন্তু বাবা ওদের রওনা হয়ে যেতে বলল, "অন্ধকার হয়ে গেলে গাড়ি চালানো উচিত নয়।"

খাওয়ার পর মা চা করল। আর গোগোলের জন্মদিন উপলক্ষে পায়েস খেতে দেওয়া হল ওদের। বাবা-মা দু'জনের নাম সই করা হলমার্কের কার্ড পেল গোগোল। সঙ্গে একশো ডলারের চেক আর ফিলেন থেকে কেনা নেভি ব্লু সুতির সোয়েটার।

"যেখানে যাচ্ছে, সেখানে ওই সোয়েটারটা ওর কাজে লাগবে," ম্যাক্সিন খুশি হয়ে বলল, "রাতের দিকে ওখানে বেশ ঠান্ডা পড়ে।"

যাওয়ার আগে ড্রাইভওয়েতে ম্যাক্সিন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল, বাবা-মা তাতে যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়ল বোঝাই যায়। মা ম্যাক্সিনকে আবার আসতে বলল। একটা কাগজে বাবার ওহায়োর ফোন নম্বর লিখে গোগোলকে দেওয়া হল। গোগোল বাবাকে বলল, "ক্লিভল্যান্ডে ভালভাবে যেয়ো, সাবধানে থেকো। প্রজেক্টের জন্য গুড লাক।"

বাবা গোগোলের কাঁধে চাপড় মেরে ইংরেজিতে বলল, "ওকে। আই উইল মিস ইউ।" তারপর বাংলায়, "মা-র দিকে খেয়াল রেখো। মাঝে মাঝে ফোন কোরো।"

"আচ্ছা। থ্যাংকসগিভিংয়ে দেখা হবে তা হলে।"

"ঠিক আছে। দেখা হবে। সাবধানে গাড়ি চালিয়ো, গোগোল।"

প্রথমে সে খেয়াল করেনি। কিন্তু গাড়িতে বসে সিটবেল্ট বাঁধতে বাঁধতেই ম্যাক্সিন জিজ্ঞেস করল, "তোমার বাবা তোমাকে কী বলে ডাকলেন?"

সে মাথা নাড়ল, "কিছু না। ও তোমাকে পরে বলব।"

গাড়ি স্টার্ট করে ড্রাইভওয়ে থেকে ব্যাক করে বেরোতে লাগল সে, বাবা-মায়ের থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। যদিও অশোক-অসীমা দাঁড়িয়ে রইল, হাত নাড়তে লাগল, যতক্ষণ পর্যন্ত ওদের দেখা যায়। মা বাংলায় চেঁচিয়ে বলল, "পৌঁছে ফোন কোরো।" কিন্তু সে না শোনার ভান করে হাত নেড়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ম্যাক্সিনের দুনিয়ায় ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। গাড়ি উত্তরদিকে চলেছে, স্টেটের বর্ডার ধরে। প্রথমদিকে কোনও তফাত নজরে পড়ে না। একইরকম আকাশ, দিগন্ত পর্যন্ত বিছানো চওড়া হাইওয়ে, বিরাট সব মদের

দোকান আর ফাস্ট ফুডের কাউন্টার। ম্যাক্সিন রাস্তা চেনে, তাই ম্যাপ দেখার দরকার হচ্ছিল না। এর আগে সে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে নিউ হ্যাম্পশায়ারে বারকয়েক এসেছে, ঝরা পাতা দেখতে। রাস্তার ধারে কোথাও গাড়ি থামিয়ে প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করতে, ছবি তুলতে। কিন্তু এতটা উত্তরে আগে কোনওদিন আসেনি। রাস্তার দু'পাশে খামারবাড়ি চোখে পড়ছে এবার, গোরু চরছে মাঠে, সাদা কাঠের চার্চ আর মরচেধরা টিনের ছাতওয়ালা গুদোম দেখা যাচ্ছে। এ-সব জায়গার নাম জেনে সে কিছুই বুঝবে না। হাইওয়ে ছেড়ে ওরা শিগগিরি দু'লেনের ফিতের মতো সরু রাস্তায় উঠে এল। সামনে দুধসাদা রঙের ঢেউখেলানো পাহাড়ের সারি। চুড়োগুলোয় সাদা সাদা মেঘ আটকে রয়েছে, যেন গাছের থেকে ওঠা ধোঁয়া। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকল। পর্যটকদের জন্য মোটেল, খাবার দোকান বা ক্যাম্পগ্রাউন্ডেরও দেখা মিলছিল না আর। শুধু পাতলা জঙ্গল আর খামারবাড়ি দেখা যাচ্ছে, পথের দু'পাশ নীল ও বেগুনি ফুলে ঢাকা। সে জানে না কতদূর তারা এসেছে বা তারা কোথায়। ম্যাক্সিন বলল, ওরা নাকি কানাডা থেকে দূরে নয়। চাইলে তারা গাড়ি চালিয়ে সেদিনই মন্ট্রিয়েলে চলে যেতে পারে।

তারা এবার একটা কাঁচা রাস্তায় ঢুকে পড়েছে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ, দু'দিকে হেমলক আর বার্চ গাছ। যেখান থেকে ওরা ঘুরল, সেখানে কোনও চিহ্ন নেই। ডাকবাক্স, সাইনবোর্ড, কিচ্ছু না। প্রথমে তো কোনও বাড়ি দেখাই যাচ্ছিল না। শুধু মাটির উপর বিছিয়ে থাকা হলদেটে রঙের ফার্নই চোখে পড়ছিল। গাড়ির চাকার তলা থেকে ছোট্ট ছোট্ট পাথর ছিটকে পড়ছিল দু'ধারে, বনেটের উপর গাছের ডালের ছায়ায় ফুটে উঠছিল নানা নকশা। শেষে জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছোল তারা। সামনে ছোট্ট একটা বাড়ি, খয়েরি ছাত, চারপাশে নিচু পাথরের দেওয়াল। জেরাল্ড ও লিডিয়ার ভলভোটা ড্রাইভওয়ের অভাবে ঘাসের উপরই দাঁড় করানো আছে। গাড়ি থেকে নেমে ম্যাক্সিন গোগোলকে হাত ধরে নিয়ে গেল বাড়ির পিছন দিকটায়। অতক্ষণ গাড়িতে বসে থাকতে থাকতে তখন গোগোলের হাতে-পায়ে ব্যথা করছে। সূর্য ডুবতে চলেছে বটে, কিন্তু রোদের তাপ তখনও ফুরোয়নি। বাতাস ভারী হয়ে আছে। পিছনের দিকে যেতে যেতে গোগোল দেখল উঠোন কিছুক্ষণ পরে শেষ হয়ে এল। তারপর হ্রদটা চোখে পড়ল তার। আকাশের চেয়ে হাজারগুণ বেশি ঝকঝকে নীল জল। পাইন গাছে ঘেরা। পিছনে পাহাড়। সে যা ভেবেছিল,

হ্রদটা তার চেয়ে অনেক বড়, সাঁতার কেটে পার হওয়া মুশকিল।

ম্যাক্সিন হাত নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে বলল, “আমরা এসে গিয়েছি।” জেরাল্ড আর লিডিয়া জলের ধারে ঘাসের উপর ডেক চেয়ারে বসে আছেন, খালি পায়ে। সামনে পানীয়ের গেলাস। ওরা সেদিকে দিকে এগিয়ে গেল। সিলাস লনের উপর দিয়ে ডাকতে-ডাকতে দৌড়ে এল। জেরাল্ড আর লিডিয়া দু'জনেই রোগা হয়েছেন, গায়ের রং পুড়ে গেছে। লিডিয়ার পরনে সাদা ট্যাক টপ আর ডেনিম র‍্যাপ স্কার্ট। জেরাল্ড পরে আছেন নীল শর্টস, একটা আদ্যিকালের সবুজ পোলো শার্ট। লিডিয়ার হাত দুটো প্রায় গোগোলের মতোই কালো। তাঁদের পায়ের কাছে খোলা বই পড়ে আছে। মাথার উপর একটা নীল ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে, ওরা আসতেই পালিয়ে গেল। ম্যাক্সিনের গলা শুনে ওঁরা মাথা ঘোরালেন, রোদ থেকে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করলেন। “ওয়েলকাম টু প্যারাডাইস”, জেরাল্ড বললেন।

নিউ ইয়র্কে ওরা যেভাবে থেকে অভ্যস্ত, এখানে ব্যবস্থা তার ঠিক উলটো। বাড়িটা অন্ধকারমতো, একটু পুরনো জিনিসের গন্ধে ভরা। আসবাবপত্র পুরনো আমলের, একটা অন্যটার সঙ্গে ম্যাচ করে না। বাথরুমে জলের পাইপগুলো দেখা যায়, ইলেকট্রিক তার দরজার উপর দিয়ে ঝোলে, কড়িকাঠ থেকে পেরেক বেরিয়ে থাকে। দেওয়ালে ছবি বলতে এই অঞ্চলের বেশ কিছু প্রজাপতি ফ্রেমে করে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। আর আছে পাতলা সাদা কাগজে ছাপা একটা ম্যাপ আর বিভিন্ন সময়ে হ্রদের ধারে তোলা পরিবারের ছবি। জানালায় সরু টিনের রডে চেককাটা সুতির পরদা। এখানে সে আর ম্যাক্সিন প্রধান বাড়িতে না থেকে একটু দূরে একটা ঠান্ডা কেবিনে থাকে। সেখানে হিটিং-এর কোনও ব্যবস্থা নেই। আসলে কেবিনটা ছোট্ট ম্যাক্সিনের খেলার জন্য তৈরি হয়েছিল। সেখানে একটা চেস্ট অফ ড্রয়ারস আছে, দু'টো সরু খাটের সঙ্গে একটা নিচু টেবিল, কাগজের শেডওয়ালা একটা নাইটল্যাম্প আর কম্বল রাখার বাক্স। বিছানাদু'টো অতি পুরনো ইলেকট্রিক কম্বল দিয়ে ঢাকা। কোনায় একটা মেশিন আছে যার কাজ বাদুড়দের কাছে আসতে না দেওয়া। কেবিনের দেওয়ালগুলো এবড়োখেবড়ো কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। দেওয়াল আর মেঝের মধ্যে একটু ফাঁক আছে, তার মধ্যে দিয়ে বাইরের ঘাস দেখা যায়। অনেক জায়গায় মরা পোকামাকড় পড়ে আছে, দেওয়ালের গায়ে চ্যাপটানো বা বেসিনের জলে ভাসছে। সুটকেস থেকে জিনিসপত্র বের

করতে করতে ম্যাক্সিন বলল, “ব্যাপারটা ক্যাম্পে থাকার মতো, না!” গোগোল অবশ্য কোনওদিন ক্যাম্পে থাকেনি। তার বাবা-মায়ের বাড়ি থেকে জায়গাটা মোটে তিন ঘণ্টার রাস্তা, কিন্তু এ তার একেবারে অচেনা। এমন অদ্ভুত ছুটি সে এর আগে কাটায়নি।

দিনের বেলায় সকলে একসঙ্গে হ্রদের ধারে বসে থাকে, হ্রদের ঝিকমিকে নীল শোভা দেখে। লেকটার অন্যদিকে আরও কুটির রয়েছে, কয়েকটা ওলটানো ক্যানু দেখা যায়। কোথাও-কোথাও জলের উপর জেটি তৈরি করা আছে, ডাঙার কাছে ব্যাঙাচির পাল ঘোরাফেরা করে। ম্যাক্সিনের পরিবারের মতো গোগোলও ফোল্ডিং চেয়ারে বসে থাকে, মাথায় সুতির টুপি পড়ে, মাঝে মাঝে গায়ে সানব্লক লোশন লাগায়। বই পড়ে বটে, কিন্তু এক পাতা পড়তে না পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ে। বেশি গরম লাগলে হেঁটে জলে নেমে যায় আর সাঁতার কাটে। কখনও কখনও ম্যাক্সিনের দাদু ও ঠাকুরমা হ্যাংক ও এডিথ সেখানে আসেন, তাঁরা ওই হ্রদের ধারেই কাছের অন্য একটা বাড়িতে থাকেন। হ্যাংক ক্ল্যাসিকাল আর্কিয়োলজির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, তাঁর সঙ্গে সবসময় গ্রিক কবিতার কোনও বই থাকে। তাঁর লম্বা লম্বা রোদে পোড়া আঙুলগুলো বইয়ের পাতার উপর কুঁকড়ে থাকে। বসে থাকতে-থাকতে তিনি মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়ান, বেশ কষ্ট করে জুতো-মোজা খোলেন, পায়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত জলে নেমে কোমরে হাত দিয়ে চারদিকের দৃশ্য দেখেন। তাঁর চিবুক গর্বিতভাবে বাতাসে উঁচু হয়ে থাকে। এডিথ ছোটখাটো, রোগা। বাচ্চা মেয়ের মতো শরীর, পাকা চুল বব করা, মুখে অজস্র বলিরেখা। তাঁরা একসঙ্গে বিশ্বের নানা জায়গায় গিয়েছেন, ইতালি, গ্রিস, মিশর, ইরান। “অবশ্য ভারতে কখনও গিয়ে ওঠা হয়নি,” এডিথ বলেন, “ও-দেশ দেখার আমাদের খুব ইচ্ছে ছিল।”

সারাদিন সে আর ম্যাক্সিন সাঁতারের পোশাক পরে খালি পায়ে কুটিরের কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায়। জেরাল্ডের সঙ্গে লেকের চারদিকের কাঁচা পাহাড়ি রাস্তা বরাবর দৌড়োতেও যায় গোগোল। সে রাস্তায় এতই কম গাড়িঘোড়া বা লোকজন যে, ওরা দু’জনে সবসময়ই পথের মাঝখান দিয়ে দৌড়োতে পারে। সেই রাস্তার মাঝামাঝি একটা ছোট প্রাইভেট কবরখানা, সেখানে র‍্যাটলিফ পরিবারের মানুষজনকে সমাহিত করা হয়। জেরাল্ড আর গোগোল ঠিক ওইখানে দম নিতে থামে। এখানেই কোনও একদিন ম্যাক্সিনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হবে। জেরাল্ড নিজের সবজিবাগানে সময় কাটাতে পছন্দ

করেন। লেটুস পাতা চাষ করতে করতে আর মাটি ঘাঁটতে-ঘাঁটতে তাঁর নখগুলো কালো হয়ে গিয়েছে। একদিন গোগোল আর ম্যাক্সিন সাঁতার কেটে ঠাকুরদার বাড়ি লাঞ্চ করতে গেল। ডিম ও স্যালাডের স্যান্ডউইচ আর ক্যানের টোম্যাটো সুপ। যে-রাতে গরম বেশি থাকে, ওরা দু'জন টর্চ নিয়ে লেকের দিকে হাঁটতে যায়। রাত-পোশাক তুলে জলে গোড়ালি ডোবায়। তারপর অন্ধকার জলে চাঁদের আলোয় সাঁতার কাটে। অন্ধকারের জলজ গাছপালা হাতে-পায়ে জড়িয়ে যায়। নগ্ন দেহে জলের স্পর্শে গোগোল উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পাড়ে ফিরে এসে ওরা মিলিত হয়, ওদের নিজেদের শরীরের জলে ভেজা ঘাসের উপর মিলিত হয়। গোগোল ম্যাক্সিনের শরীর পেরিয়ে আকাশের দিকে তাকায়, হাজার তারাভরা আকাশের দিকে। এত তারা একবারে সে কখনও দেখেনি।

কিছুই করার নেই এখানে। তা সত্ত্বেও দিন কাটানোর একটা নির্দিষ্ট নকশা আঁকা হয়ে গিয়েছে। খুব কম নিয়ে বাঁচতে হয় এখানে, বেশি কিছু পাওয়ার ইচ্ছেই হয় না। সকালে পাখির ডাকে ভোর-ভোর ঘুম ভেঙে যায়। আকাশে তখন পাতলা গোলাপি মেঘ। সাতটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট। কুটিরের পরদা ঢাকা বারান্দায় ওরা সব খাবার খায়। মোটা রুটির উপর বাড়িতে বানানো মাখন বা জ্যাম-জেলি। বাইরের পৃথিবীর খবর ওরা পায় জেনারেল স্টোর থেকে কিনে আনা একটা পাতলা খবরের কাগজ থেকে। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে গেলে সকলে স্নান সেরে ডিনারের জন্য জামাকাপড় পড়ে তৈরি হয়। ড্রিংক আর নিউ ইয়র্ক থেকে গোগোলদের কিনে আনা চিজ় নিয়ে লনে বসে থাকে তারা। সূর্য তখন পাহাড়ের পিছনে অস্ত যায়, দশতলা বাড়ির সমান উঁচু পাইন গাছের ফাঁকে-ফোঁকরে বাদুড় উড়তে থাকে। কাপড় শুকোনোর তারে লম্বা লাইন করে সকলের সাঁতারের পোশাক মেলা থাকে। ডিনারও খুবই সাধারণ। সেদ্ধ করা ভুট্টার দানা, ঠান্ডা মুরগির মাংস, পাস্তা, নুনমাখানো তাজা টোম্যাটোর টুকরো। লিডিয়া হাতে তোলা বেরি দিয়ে মিষ্টি তৈরি করেন। কোনও-কোনও দিন তিনি একা-একাই কাছের কোনও শহরে প্রাচীন জিনিসপত্র খুঁজতে চলে যান। সন্ধেবেলায় দেখার জন্য কোনও টিভি নেই। শুধু একটা পুরনো স্টিরিয়ো, তাতে সিম্ফনি বা জাজ় বাজে । রাত নটার মধ্যে ওরা শুয়ে পড়ে। ফোনটা জেরাল্ডদের ঘরে, কিন্তু সেটা কখনই বাজে না।

দুনিয়ার থেকে এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে, বন্ধনহীনভাবে থাকা ক্রমশ পছন্দ হতে থাকে গোগোলের। এই নিস্তব্ধতা, এই রোদে উত্তপ্ত বনানীর সঙ্গে সে

একাত্মতা অনুভব করে। এখানে শব্দ বলতে হ্রদের জলে এক-আধবার মোটরবোট চলার আওয়াজ, বা দরজা-জানালা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ। এক বিকেলে সে বাড়িটার একটা স্কেচ করে জেরাল্ড আর লিডিয়াকে উপহার দেয়। অনেক বছর পরে এই একটা ড্রয়িং সে করল, যেটা চাকরির জন্য নয়। স্কেচটা পাথরের ফায়ারপ্লেসের উপরের তাকটিতে আরও অনেক বই আর ফোটোগ্রাফের মধ্যে সাজিয়ে রাখা হল। এর মধ্যে কোনওদিন বাঁধানো হবে। শুধু বাড়িগুলোই নয়, চারপাশের গাছগাছালি আর ঘাসের ডগাগুলোও র‍্যাটলিফ পরিবারের। কোনও বাড়িতেই অবশ্য তালা দেওয়া হয় না। মুখ্য বাড়িটা, ওদের ঘুমোনোর ছোট্ট কেবিনটা, সবই চব্বিশ ঘণ্টা খোলা। যে খুশি ঢুকতে পারে। গোগোল তার বাড়িতে সদ্য বসানো অ্যালার্ম সিস্টেমের কথা ভেবে অবাক হয়। তার বাবা-মা কেন জাগতিক সম্পত্তি বিষয়ে এমন নিরাসক্ত নয়? এ-তল্লাটের সবকিছুতেই যেন র‍্যাটলিফদের একচ্ছত্র অধিকার। দিঘির জলে ভাসমান চাঁদ, তারা বা সূর্যের ছায়াগুলোও যেন ওদের। এই জায়গাটা ওদের পরিবারের পক্ষে শুভ। তাই এ-জায়গাটা পরিবারে কোনও সদস্যের মতোই হয়ে গিয়েছে। প্রতি বছর এই একটি জায়গায় ফিরে আসার ধারণাটি গোগোলের খুব পছন্দ। কিন্তু সে ভাবতেই পারে না, এ-রকম একটা কুঠিতে তার পরিবারের সবাই ছুটি কাটাচ্ছে, বৃষ্টির দিনে একসঙ্গে ইনডোর গেম খেলছে, রাতে উল্কাপাত দেখছে, সব আত্মীয়স্বজন নিয়ে বালিবিছানো দিঘির পাড়ে বসে আছে। তার বাবা-মার এই ভিড় থেকে দূরে থাকার বাসনা কখনও ছিল না। এ-রকম একটা নিরিবিলি জায়গায় ওদের নিশ্চয়ই একা লাগত, ওরা বলবে, "আসলে আমরা তো ভারতীয়।" জেরাল্ড, লিডিয়া, ম্যাক্সিন ও সে প্রায় রোজই ট্রেকিঙে যায়। পাথুরে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে উপরে উঠে দ্যাখে উপত্যকায় পড়ন্ত রোদ ছড়িয়ে যাচ্ছে। এমনটি গোগোলের বাবা-মা কখনও করবে না। তারা সারাদিন ধরে ব্লুবেরি ফুটিয়ে জেলি তৈরি করতেও পারবে না, আর বাগান থেকে তাজা সবজি তুলে নিয়ে রান্না করতেও পারবে না। আর মা? সাঁতারের পোশাক পরে সাঁতার কাটতে বললে মা ভিরমি খাবে। নিজের পরিবারের সঙ্গে কাটানো কোনও ছুটি নিয়েই তার সুখস্মৃতি নেই। ওগুলো ছুটি কাটানোই নয়। হয় কলকাতায় যাওয়া, বা এমন কোনও অচেনা জায়গায় যাওয়া যেখানে আর কোনওদিন যাওয়া হবে না। নয়তো চেনা কোনও বাঙালি পরিবারের বাড়িতে হাজির হওয়া, তারপর তাদের সঙ্গে শিকাগো বা টরন্টো বা অন্য কোথাও

ভাড়াগাড়িতে করে বেড়াতে যাওয়া। বাবারা সব সামনের সিটে ঠাসাঠাসি করে বসে থাকত, ম্যাপ দেখে-দেখে পালা করে গাড়ি চালাত। পেছনের সিটে বাচ্চারা বসত। তাদের কোলে ডেকচিভরতি আলুর দম আর ফয়েলে মোড়া আগের দিনের ভাজা লুচি, যা কোনও পার্কে বসে খাওয়া যাবে। মোটেলে থাকা হত, সিঙ্গল রুমে পুরো একটা পরিবার ঢুকে যেত। ওরা সাঁতার কাটত এমন সব পুলে যেগুলো রাস্তা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

* * *

একদিন তারা ক্যানু চড়ে হ্রদের অন্য পারে গেল। ম্যাক্সিন শিখিয়ে দিল, কীভাবে নৌকোটা চালাতে হয়। এর আগে অনেক আনন্দময় গ্রীষ্ম সে এখানেই কাটিয়েছে, সেই কথা বলছিল। বলছিল, এই জায়গাটাই দুনিয়ায় ওর সবচেয়ে প্রিয়। গোগোল তা বোঝে। এই জলে ম্যাক্সিন প্রথমবার সাঁতার কাটা শিখেছে, এই প্রকৃতির মধ্যে সে বেড়ে উঠেছে। এ-জায়গাটা ম্যাক্সিনের অস্তিত্বে মিশে আছে, চেলসার বাড়িটার থেকেও এই লেক-হাউস ম্যাক্সিনের বেশি কাছের। শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্যই নয়, ম্যাক্সিন স্বীকার করেছে, এখানকার বোটহাউসেই কাছের কটেজে বেড়াতে আসা একটি ছেলের কাছে সে কুমারীত্ব হারিয়েছিল। তখন তার বয়স চোদ্দো। গোগোল নিজের চোদ্দো বছরের কথা ভাবে। তখনকার জীবনের সঙ্গে তার এখনকার জীবনের কোনও মিল ছিল না, তখনও তার একটাই নাম ছিল। গোগোল। তার মনে পড়ে, বাবা-মায়ের বাড়ি থেকে চলে আসার সময় রাস্তায় সে ম্যাক্সিনকে তার দুটো নামের কথাটা খুলে বলেছিল। শুনে ম্যাক্সিনের মন্তব্য, "এ তো আমার শোনা সবচেয়ে মিষ্টি ঘটনা।" তারপর থেকে সে ওই নামের ব্যাপারে কিচ্ছুটি জিজ্ঞেস করেনি। গোগোলের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি তার মন থেকে খসে পড়ে গিয়েছিল, আরও অনেক কিছুর মতো। গোগোল জানে, অন্য সব পালটে গেলেও এই জায়গাটা ম্যাক্সিনের জন্য চিরকাল এভাবেই থাকবে। এখানে ম্যাক্সিনকে সে সব রূপে ভাবতে পারে। অতীতে কেমন ছিল, এখন কেমন, ভবিষ্যতে বয়স্কা ম্যাক্সিনের ছবিও সে কল্পনা করতে পারে: পাকা চুল, মুখটা তখনও সুন্দর, লম্বাটে শরীর বয়সের ভারে একটু চওড়া, ছড়ানো, মাথায় ফ্লপি টুপি পরে চেয়ারে বসে আছে। সে দেখতে পায় শোকাহত ম্যাক্সিনকে, বাবা-মাকে সমাধিস্থ করতে এসেছে। দেখতে পায়, নিজের সন্তানদের লেকের জলে সাঁতার শেখাচ্ছে ম্যাক্সিন, ডাইভ দিতে শেখাচ্ছে।

এখানেই গোগোলের সাতাশতম জন্মদিন পালিত হল। এই প্রথমবার জন্মদিনে বাবা-মায়ের সঙ্গে কলকাতায় বা পেম্বারটন রোডে থাকল না সে। আসল দিনের আগে থেকেই লিডিয়া আর ম্যাক্সিন রান্নার বই নিয়ে বিশেষ খাওয়াদাওয়ার আয়োজনে মেতে রইল। ঠিক হল, ওরা ইটালীয় পোলাও পায়েয়া রাঁধবে, জিনিসপত্র কেনার জন্য মেন শহরে যাওয়া হল। বাড়িতে কেকও তৈরি হল। ডাইনিং টেবিলটা লনে টেনে এনে তার সঙ্গে আরও কিছু তাস খেলার টেবিল লাগিয়ে সকলের বসার জায়গা করা হল। হ্যাংক আর এডিথ তো বটেই, হ্রদের চারপাশে থাকে এমন আরও বেশকিছু বন্ধুবান্ধবকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। মেয়েরা খড়ের টুপি আর সুতির জামা পরে এল। সামনের লনটা গাড়িতে ভরে গেল। বাচ্চারা সেখানে খেলা করতে লাগল। সবাই একই বিষয়ে কথা বলছিল। গ্রীষ্ম শেষ হয়ে আসছে, তাপমাত্রা ক্রমশ নামছে, জলও ঠান্ডা হচ্ছে। মোটরবোটের যাতায়াত বেড়ে যাওয়া নিয়ে অনেক নালিশ হল, জেনারেল স্টোর্সের মালিকের বউকে নিয়ে পরচর্চাও হল খানিক। তিনি নাকি অন্য এক পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে ডিভোর্সের মামলা করেছেন। এক সময় জেরাল্ড গোগোলের সঙ্গে এক দম্পতির আলাপ করিয়ে দিলেন, "এই ছেলেটি আর্কিটেক্ট। একে ম্যাক্স সঙ্গে নিয়ে এসেছে।" সেই দম্পতি নিজেদের কটেজটিকে বাড়াতে চান। গোগোল তাঁদের সঙ্গে প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করল, কথা দিল যাওয়ার আগে একদিন গিয়ে জায়গাটা দেখে আসবে। মাঝবয়সি এক ভদ্রমহিলা ওকে জিজ্ঞেস করলেন, ও কত বছর বয়সে ভারত থেকে আমেরিকায় এসেছে।

"আমি বস্টনে জন্মেছি," গোগোল বলল।

ভদ্রমহিলার নাম পামেলা। জানা গেল, তিনিও বস্টনের মেয়ে। কিন্তু বাবা-মা যেখানে থাকত, সেই রাস্তার নাম বললে তিনি চিনতে পারলেন না। বরং বললেন, "আমার একটি মেয়েবন্ধু একবার ভারতে বেড়াতে গিয়েছিল।"

"তাই নাকি? কোথায়?" গোগোল বলল।

"তা জানি না। শুধু মনে আছে, সে কাঠির মতো রোগা হয়ে ওখান থেকে ফিরেছিল। আমার যে কী হিংসে হয়েছিল," পামেলা হাসলেন, "কিন্তু তোমার নিশ্চয়ই তেমন কোনও অসুবিধে হয় না?"

"তার মানে?"

"তোমার নিশ্চয়ই অসুখ করে না?"

গোগোল একটু বিরক্ত হল, "না, আসলে তা নয়।" সে ম্যাক্সিনের দিকে

তাকাল, কিন্তু সে একজনের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত। সে বলল, "ভারতে গেলে আমাদেরও অসুখ করে। যাওয়ার আগে ইনজেকশন নিতে হয়। আমার বাবা-মা বড় একটা সুটকেস ভরতি ওষুধ নিয়ে ওখানে যেতেন।"

"কিন্তু তোমরা তো জন্মসূত্রে ভারতীয়। আমার মনে হয়, ওখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে তোমাদের মানিয়ে নিতে পারা উচিত," পামেলা ভুরু কুঁচকে বললেন।

লিডিয়া হঠাৎ টেবিলের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে গোগোলকে বাঁচিয়ে দিল, "পামেলা, নিক আমেরিকান। ও এখানে জন্মেছে।" বলেই তিনি গোগোলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাই না?" গোগোল বুঝতে পারল, এতদিন পরেও লিডিয়ার জানা নেই, ঠিক তথ্যটা কী।

কেক কাটা হলে শ্যাম্পেনও ঢালা হল। জেরাল্ড নিজের গ্লাসটি তুলে বললেন, "টু নিখিল।" এক সন্ধ্যার চেনা কিছু লোক গাইল হ্যাপি বার্থ ডে। এরা সকলেই হয়তো কাল ওকে ভুলে যাবে। সেই দিন, সুরাসক্ত কিছু মানুষের কথাবার্তা আর বাচ্চাদের খালিপায়ে ফড়িং ধরার চেঁচামেচির মধ্যে হঠাৎ তার মনে পড়ল, বাবা এক সপ্তাহ হল ক্লিভল্যান্ডে চলে গিয়েছে। নতুন অ্যাপার্টমেন্টে আছে, একা। মনে পড়ল, মা পেম্বারটন রোডে একা-একা দিন কাটাচ্ছে। সে জানে, তার উচিত ওদের ফোন করা, জেনে নেওয়া, বাবা কি পৌঁছেছে? মা কি ভাল আছে? কিন্তু এখানে, ম্যাক্সিনদের মধ্যে, এ-সব চিন্তার কোনও দাম নেই। সেই রাতে, ম্যাক্সিনের পাশে বিছানায় শুয়ে সে শুনতে পেল, বড় কটেজে বারবার ফোন বাজছে। সে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। ভাবল, এ নিশ্চয়ই তার বাবা-মার কাণ্ড। তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে ফোন করেছে। জেরাল্ড আর লিডিয়ার ঘুম ভেঙে যেতে পারে ভেবে তার লজ্জা করতে লাগল। সে দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু হিমে ঢাকা ঘাসে পা পড়তেই বুঝল, চারদিক নিস্তব্ধ। ফোন বাজা নিশ্চয়ই স্বপ্ন। সে ঘরে ফিরে এল। ঘুমন্ত ম্যাক্সিনের দেহের উষ্ণতায় ফিরে তার সরু কোমরে হাত রাখল, নিজের হাঁটু প্রেমিকার হাঁটুর ঠিক পিছনে ঠেকিয়ে রাখল। জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা মোটে তারা এখন, ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। দূরের পাইন গাছ আর কেবিনগুলোর সিল্যুয়েট বোঝা যাচ্ছে। তখন মনে পড়ল তার, বাবা-মা তাকে ফোন করতে পারবেই না। সে কোনও নম্বর দিয়ে আসেনি। আর জেরাল্ডদের ফোন নম্বরটা কোনও ডাইরেক্টরিতে নেই। এখানে, ম্যাক্সিনের পাশে, এই ছোট্ট আরণ্যক দুনিয়ায় সে মুক্তপুরুষ, স্বাধীন।

সাত

অসীমা পেম্বারটন রোডের রান্নাঘরে বসে আছে। ক্রিসমাস-কার্ড লিখছে। পাশে রাখা এককাপ চা, কিন্তু অসীমা তাতে চুমুক দিচ্ছে না। চা ঠান্ডা হচ্ছে। সামনে তিনটে ঠিকানা লেখা বই খোলা আর কিছু ক্যালিগ্রাফি করার কলম। সে গোগোলের ঘরের ড্রয়ারে সেগুলো খুঁজে পেয়েছে। এ ছাড়া টেবিলে আছে পাঁজা করা কার্ড আর ভিজে স্পঞ্জ, খাম আটকানোর জন্য। সবচেয়ে পুরনো ঠিকানার বইটা কেনা হয়েছিল আটাশ বছর আগে, হার্ভার্ড স্কোয়্যারের একটা দোকান থেকে। বইটার মলাট কালো আর পাতাগুলো নীল। সেটার বাঁধাই খুলে গিয়েছে, রাবার ব্যান্ড দিয়ে পাতাগুলো আটকানো। বাকি দুটো আকারে বড়, দেখতেও সুন্দর। এ-বি-সি লেখা ট্যাবগুলো এখনও অটুট। একটার সবুজ প্যাডওয়ালা মলাট, পাতাগুলোয় সোনালি গিল্টি করা। অবশ্য অসীমার সবচেয়ে পছন্দের বইটা জন্মদিনে গোগোলের দেওয়া। সেটার পাতায়-পাতায় মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টে প্রদর্শিত পেন্টিঙের ছবি। প্রতিটা বইয়েরই শেষ পাতায় এলোমেলো কিছু ফোন নম্বর লেখা আছে, যেগুলো এখন আর কারও নয়। আটশোটি নম্বর বিভিন্ন এয়ারলাইন অফিসের। এইসব এয়ারলাইনের প্লেনে করে ওরা কলকাতায় যাতায়াত করেছে। অসীমা নিজের বলপয়েন্ট কলমটা তুলে ইতস্তত করছিল।

আসলে তিনটে বই থেকে ঠিকানা নিয়ে কাজ করা কঠিন ঠেকছে তার। কিন্তু অসীমা কোনও নামঠিকানা কেটে দেওয়ার পক্ষপাতী নয়। বা সব নাম এক জায়গায় করে একটা বইতে লিখে ফেলতেও সে চায় না। এই তিনটি বইয়ের প্রতিটায় লেখা প্রতিটা নামই তার কাছে গর্বের। এতে বোঝা যায় সে আর অশোক এই ক'বছরে কত বাঙালিকে চিনেছে। এদের সকলের সঙ্গে এই বিদেশে সে অন্ন ভাগ করে নেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। অসীমার মনে পড়ে, প্রথম ঠিকানা-বইটা কেনার দিন। আমেরিকা আসার পরপরই কেনা হয়েছিল। সেই হয়তো প্রথমবার সে অশোকের সঙ্গে তাদের ছোট্ট

অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়েছে। ব্যাগে রাখা পাঁচ ডলারের নোটটা তার কাছে সম্পদ বলে মনে হচ্ছিল। তার মনে আছে, সে সবচেয়ে ছোট আর সস্তা বইটাই কিনেছিল। কাউন্টারে সেটা রেখে বলেছিল, "আই ওয়ান্ট টু বাই দিস ওয়ান প্লিজ়।" যদি এরা তার ইংরেজি বুঝতে না পারে, তার বুক দুরদুর করছিল। কিন্তু দোকানি তার দিকে তাকায়ওনি, শুধু দামটা বলে দিয়েছিল। বাড়ি ফিরে এসে সে বইটার খালি পাতায় প্রথমেই আমহার্স্ট স্ট্রিটে তার বাপের বাড়ির ঠিকানাটা লিখে ফেলেছিল, তারপর আলিপুরে তার শ্বশুরবাড়ির। এর পর সে সেন্ট্রাল স্কোয়্যারে তার নিজের অ্যাপার্টমেন্টেরও লিখেছিল, যাতে সে না ভুলে যায়। সে এম আই টি-তে অশোকের এক্সটেনশন নম্বরটিও লিখেছিল। সেই প্রথমবার সে অশোকের নাম আর পদবি নিজের হাতে লিখেছিল। তখন তার পৃথিবী ছিল অতটুকুই।

এবার অবশ্য সে নিজেহাতে ক্রিসমাস-কার্ড বানিয়েছে। লাইব্রেরির ক্রাফট বিভাগের কিছু বইতে আইডিয়া পেয়ে গিয়েছিল। সাধারণত জানুয়ারি মাসে সে অর্ধেক ছাড়ে এক বাক্স কার্ড কিনে রাখে। আর প্রায় একবছর পর, বড়দিনের সময়, সে ভুলে যায় কোথায় সেই বাক্সটা রেখেছে। অবশ্য সে সাবধানে দেখেশুনে এমন কার্ড কেনে যাতে 'হ্যাপি হলিডেজ়' বা 'সিজ়নস গ্রিটিংস' লেখা আছে। দেখে নেয়, জিশুর জন্মের দৃশ্য বা দেবদূতের ছবি যেন কার্ডে না থাকে। বরং বরফঢাকা খেত, স্লেজগাড়ি বা জমাট পুকুরে স্কেটিং করার দৃশ্য— যেগুলো সে ধর্মনিরপেক্ষ ছবি বলে মনে করে— সে পছন্দ করে। এবারের কার্ডগুলোয় সে নিজে ছবি এঁকেছে। একটা হাতি, লাল আর সবুজ চকচকে কাগজ দিয়ে সাজানো। এই হাতিটা ঠিক সেই হাতিটার মতো, যেটা তার বাবা সাতাশ বছর আগে গোগোলের জন্য এরোগ্রামের কোনায় এঁকে পাঠিয়েছিলেন। আলমারির সবচেয়ে উপরের তাকে সে এখনও নিজের বাবা-মার চিঠিগুলো জমিয়ে রেখেছে। সেগুলো একটা বড় সাদা হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে আছে। সাতের দশকে সেই ব্যাগ ব্যবহার করত অসীমা, তারপর সেটার স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে যায়। বছরে একবার সে চিঠিগুলো খাটের উপর ছড়িয়ে ফেলে। নতুন করে পড়ে আর প্রাণ খুলে কাঁদে। প্রত্যেক সপ্তাহে কয়েকটি মহাদেশের উপর দিয়ে ভেসে আসা বাবা-মায়ের স্নেহ আর চিন্তাভাবনাকে নতুন করে অনুভব করে, এমন সব খবর নতুন করে পড়ে যেগুলোর সঙ্গে তার আর কোনও সম্পর্ক নেই, তখনও ছিল না কিন্তু সেগুলো কেমব্রিজের সেই প্রথম দিনগুলোতে তাকে টিকে থাকতে সাহায্য করেছিল। বাবার মতো করে হাতি

আঁকতে পেরে সে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছে। বড় হয়ে সে কিছুই আঁকেনি। ছোটবেলায় শেখা বিদ্যে এখনও মনে আছে দেখে সে নিজেই নিজেকে বাহবা দেয়। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পেন ধরে আঁকার যে ক্ষমতা গোগোল তার বাবার কাছে থেকে পেয়েছে, তার সঙ্গে এতদিন কোনও যোগাযোগই ছিল না অসীমার। সারাদিন ওই ছবিটাই মন দিয়ে এঁকেছে অসীমা। বড় করে, ছোট করে, উজ্জ্বল রং দিয়ে, নানা ধরনের কাগজের উপর। তারপর সেটা ইউনিভার্সিটির কপি-সেন্টারে নিয়ে গেছে। একটা পুরো বিকেল সে গাড়ি চালিয়ে বিভিন্ন স্টেশনারি দোকানে-দোকানে ঘুরেছে, কার্ডটা আঁটিবে এমন লাল খামের খোঁজে।

আসলে এখন একা থাকছে বলে এ-সব কাজ করার সময় পাচ্ছে অসীমা। এখন যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাউকে রেঁধে খাওয়াতে হয় না, কারও সঙ্গে কথা বলতে হয় না, কারও মনের মতো কাজ করতে হয় না। আটচল্লিশ বছর বয়সে সে এই একাকিত্বের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। তার স্বামী-ছেলে-মেয়ে সবাই এমন একাকিত্ব চেনে আর তাতে অভ্যস্ত। “একা থাকা এমন কিছু ব্যাপার নয়,” অসীমার ছেলে আর মেয়ে মাকে বলে, “প্রত্যেককেই জীবনের কোনও-না-কোনও সময়ে একা থাকতে হয়। সেটাই করা উচিত।” কিন্তু অসীমার মনে হয়, এই নতুন বিদ্যা আয়ত্ত করার পক্ষে তার বয়স একটু বেশিই। সন্ধেবেলা অন্ধকার, ফাঁকা একটা বাড়িতে ঢুকতে তার খুব খারাপ লাগে। বিছানার একদিকে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সকালে অন্যদিকে শোয়া অবস্থায় ঘুম ভাঙলে তার মন খারাপ হয়। প্রথম-প্রথম সে পাগলের মতো কাজ করত সারাদিন। আলমারি সাফ করত, ফ্রিজের তাকগুলো ধুয়েমুছে পরিষ্কার করত, রান্নাঘরের তাকগুলো রগড়ে রগড়ে ধুত, ময়লা ফেলার ঝুড়িগুলো পরিষ্কার করত। বাড়িতে সদ্য লাগানো সিকিউরিটি সিস্টেম থাকা সত্ত্বেও একটু শব্দ কানে গেলেই তার রাতে ঘুম চটে যেত। জানালা বন্ধ আছে কি না, প্রতি রাতে তা বারবার দেখত অসীমা। এক রাতে দরজার বাইরে খটখট আওয়াজ পেয়ে সে ভয়ে ওহায়োতে অশোককে ফোন পর্যন্ত করে ফেলেছিল। তারপর কর্ডলেস ফোনটা কানে চেপে ধরে সে দরজার পিপহোলে চোখ রেখে দেখে, বাইরের স্ক্রিন দরজাটা সে বাঁধতে ভুলে গিয়েছে। হাওয়ায় সেটা বড় দরজায় ঘা খাচ্ছে।

এখন সে মাসে একবার জামাকাপড় কাচে। অসীমা আর ধুলো ঝাড়ে না, এমনকী ধুলো আজকাল চোখেই পড়ে না তার। সে টিভির সামনে সোফায়

বসে খায়। খাওয়া মানে টোস্ট, মাখন আর ডাল। একবাটি ডালে এক সপ্তাহ চলে যায়। ইচ্ছে করলে কখনও একটা অমলেট ভেজে নেয়। কখনও কখনও গোগোল বা সোনিয়ার মতোই খায় অসীমা। ফ্রিজের সামনে দাঁড়িয়ে সোজা খেতে থাকে, গরম-টরম করার বা প্লেটে তোলার ঝামেলা করে না। অসীমার মাথার চুল পাকতে শুরু করেছে, পাতলা হয়ে যাচ্ছে। তবে সে এখনও মাঝে সিঁথি করে খোঁপা বাঁধে, বিনুনি করে না। সম্প্রতি সে বাইফোকাল চশমা নিয়েছে। চশমাটা শাড়ির আঁচলের ভাঁজের উপর চেনে লাগানো অবস্থায় দোলে। সপ্তাহে তিনটে দুপুর আর দু'টো শনিবার পাবলিক লাইব্রেরিতে কাজ করে অসীমা, ঠিক যেমন হাইস্কুলে পড়ার সময় সোনিয়া করত। আমেরিকায় বিয়ে হয়ে আসার পর থেকে এটাই অসীমার প্রথম চাকরি। সে তার অল্প টাকার মাইনের চেকগুলো অশোকের নামে লিখে দেয়, সে ওগুলো নিজের অ্যাকাউন্টে জমা করে। আসলে সে চাকরিটা করে সময় কাটানোর জন্য। বহুদিন ধরেই অসীমা নিয়মিতভাবে লাইব্রেরিতে যায়। আগে যেত বাচ্চাদের নিয়ে স্টোরি-আওয়ারে, গল্প শোনাতে। নিজেও যেত বই বা ম্যাগাজিন দেখতে, বোনার জন্য নকশা খুঁজতে। একদিন প্রধান লাইব্রেরিয়ান মিসেস বাক্সটন জিজ্ঞেস করলেন, সে পার্টটাইম কাজ করতে আগ্রহী কি না। প্রথমদিকে হাইস্কুলের ছাত্রীদের মতোই কাজ করতে হত তাকে। লোকের ফেরত দেওয়া বই ঠিক জায়গায় রাখা, বইগুলো সঠিক অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে আছে কি না তা দেখা, এবং পালকের ঝাড়ন দিয়ে বই পরিষ্কার করা। পুরনো বই মেরামত করত সে, ছেঁড়া বইয়ে মলাট লাগাত, মাসে একবার কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিশেষ বই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করত, যেমন বাগান করা, রাষ্ট্রপতিদের জীবনী, কবিতা বা আফ্রিকান-আমেরিকান ইতিহাস। এখন সে প্রধান ডেস্কেও কাজ করে। নিয়মিত যাঁরা আসেন, তাঁদের নাম করে স্বাগত জানায়, আন্তর্গ্রন্থাগার বই দেওয়া-নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ফর্ম পূরণ করে। লাইব্রেরিতে অন্য যে মহিলারা কাজ করেন, তাঁদের সঙ্গে অসীমার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে গিয়েছে। এঁদের কেউ-কেউ অসীমার মতো একা থাকেন, তাঁদের ছেলে-মেয়ে বা স্বামী কাছে নেই। কারও বা ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। এই মহিলারাই অসীমার প্রথম আমেরিকান বন্ধু। স্টাফরুমে চা খেতে খেতে সকলে একসঙ্গে গল্পগুজব করেন। নিয়মিত পাঠকদের নিয়ে পরচর্চা হয় বা মাঝবয়সে ডেটিং করার বিপদ নিয়ে আলোচনা। এক-আধবার লাইব্রেরির বন্ধুদের অসীমা বাড়িতে

লাঞ্চও খাইয়েছে। উইকএন্ডে তাদের সঙ্গে শপিংয়েও যায়।

প্রতি তিন সপ্তাহ পরপর শুক্রবার তার স্বামী বাড়ি আসে। অশোক ট্যাক্সি করে আসে, কারণ অসীমা যদিও নিজেদের ছোট্ট শহরে গাড়ি চালিয়ে বেড়ায়, হাইওয়ে ধরে লোগান পর্যন্ত গাড়ি চালাতে তার বেশ আপত্তি। স্বামী বাড়িতে থাকলে সে আগের মতোই বাজারহাট করে, রান্না করে। বন্ধুদের বাড়িতে নেমন্তন্ন থাকলে দু'জনে হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে সেখানে যায়, পিছনের সিট ফাঁকা থাকে। মন খারাপ করে অসীমার। যদিও তারা দু'জনেই জানে যে, ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে গিয়েছে, তারা আর কখনও গাড়ির পিছনের সিটে বসবে না। যে দু' তিনদিন অশোক থাকে, সে সুটকেস থেকে জামাকাপড় বের করে না, দাড়িকামানোর জিনিসও সিংকের পাশে একটা ব্যাগেই রাখে। যে-সব কাজ অসীমা এখনও করতে জানে না, সেগুলো অশোক করে। বিল দেয়, লনে ঝরে পড়া শুকনো পাতা পরিষ্কার করে, গাড়িতে সেলফ সার্ভিস স্টেশন থেকে গ্যাস ভরে। অবশ্য কতটুকু সময়ই বা সে থাকে? দেখতে দেখতে রবিবার এসে যায়, অসীমা আবার একা। অন্য সময় দু'জনে অবশ্য রোজ রাত আটটায় ফোনে কথা বলে। কখনও কখনও সে-সময়ে অসীমা শুয়ে পড়ে। কী করবে, রাতের খাবার খেয়ে নিলে করার কিছু থাকে না। শুয়ে শুয়ে আদ্যিকালের একটা সাদা-কালো টিভি দেখে। এই টিভিটা ওদের কাছে বহু বছর ধরে আছে, অসীমার খাটের পাশে থাকে, ছবির রং এখন ক্রমশ কালোই হয়ে যাচ্ছে, কিছুই বোঝা যায় না। টেলিভিশনে দেখার কিছু না পেলে সে লাইব্রেরি থেকে আনা বই দেখে, সেই বইগুলো বিছানায় অশোকের জায়গাটি অধিকার করে থাকে।

এখন তিনটে বাজে, রোদের তাপ ফুরিয়ে আসছে। এই দিনগুলো শুরু হতে-না-হতেই শেষ হয়ে যায়। অসীমার কত আশা ছিল, আজ অনেক কাজ করবে, কিন্তু এখন রাত হতে চলল। কাজ করার ইচ্ছেটাই চলে গিয়েছে। এ-সব দিনে অসীমার পাঁচটা বাজলেই খেয়ে নিতে ইচ্ছে করে। এখানকার এই একটা জিনিস অসীমা ঘেন্না করে। এই ঠান্ডা, ছোট্ট শীতের দিনগুলো, দুপুর ফুরোতে-না-ফুরোতেই অন্ধকার নেমে আসে। এ-সব দিন নিয়ে তার মনে কোনও প্রত্যাশা থাকে না, শুধু ভাবে, কখন দিনটা শেষ হবে। আর কিছুক্ষণ পরেই অসীমা খাবার গরম করবে, নাইটি পরবে, বিছানার ইলেকট্রিক কম্বল গরম করার সুইচ অন করে দেবে। এক চুমুক চা খেল সে, এখন সেটা কনকনে ঠান্ডা। সে উঠে পড়ে আবার এক কাপ চা করতে গেল। উইন্ডো বক্সে

পেটুনিয়াগুলো শুকিয়ে ঝামা হয়ে আছে। শেষবার যখন গোগোল আর সোনিয়া একসঙ্গে এ-বাড়িতে এসেছিল, সেই সময়ে লাগানো। কতবার অসীমা ভেবেছে, শুকনো গাছগুলো তুলে ফেলে দেবে, হয়নি। যেই সে ভাবে, যাক, অশোক করবে, ফোন বেজে ওঠে। ফোন তুলে ওপাশে অশোকের গলা পেয়েই তাই অসীমা প্রথমেই এই কথাটা বলে। তারপরেই পিছনে লোকজনের গলার আওয়াজ পায় সে। "তুমি কি টিভি দেখছ?" অসীমা জিজ্ঞেস করে।

অশোকের গলা ভেসে আসে, "আমি হাসপাতালে।"

"কী হয়েছে?" অসীমা কেটলিটা নামিয়ে নেয়। তার বুক দুরদুর করে ওঠে। ভাবে, কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে।

"সকাল থেকে আমার পেটটা গোলমাল করছে।"

অশোক বলে, গত রাতে কিছু বাঙালি ছাত্র তাকে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিল। তারা এখনও রান্না করতে ভাল জানে না। সেখানেই সন্দেহজনক চিকেন বিরিয়ানি খেয়েই হয়তো এমন হয়েছে।

অসীমা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, কঠিন কিছু নয় তা হলে, বলে, "আলকা-সেলজ়ার খাও।"

"খেয়েছি। ভাল হয়নি। আজ ডাক্তারদের অফিস সব বন্ধ বলে হাসপাতালের এমারজেন্সিতে এসেছি।"

"তুমি বেশি কাজ করছ। এখন আর ছাত্র নেই, এত কাজ তোমার পক্ষে বেশি হচ্ছে। আলসার হয়নি তো?"

"আশা করি না।"

"কে তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে এল?"

"কেউ না। আরে, তেমন কিছু হয়নি। আমি নিজেই এসেছি।"

তবু অসীমার খুব খারাপ লাগে। একা-একা ড্রাইভ করে হাসপাতালে এসেছে মানুষটা। হঠাৎ অশোকের জন্য মন খারাপ করে তার। বহু বছর আগেকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। সবে আমেরিকায় এসেছে তখন। হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুপুরে বাড়ি ফিরে আসত অশোক। ওরা যদিও ততদিনে স্যান্ডউইচে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তবু অশোকের ইচ্ছে করত খাঁটি বাঙালিদের মতো দুপুরে পেট পুরে খেতে। তাড়াতাড়ি ভাত রান্না করত অসীমা, আগের দিনের তরকারি গরম করত। ওরা একসঙ্গে টেবিলে বসে পেটভরে ভাত খেত, ঘুমচোখে গল্প করত আর হাতের এঁটো শুকিয়ে হলদে হয়ে যেত।

এখন সে অশোককে জিজ্ঞেস করল, "ডাক্তার কী বলছে?"

"আমি এখন লাইনে অপেক্ষা করছি। বেশ ভিড়। একটা কাজ করবে?"

"কী?"

"ডা. স্যান্ডলারকে একটা ফোন করো। এমনিতেই আমার চেক-আপ দরকার। সামনের শনিবার উনি ফাঁকা থাকলে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রাখো।"

"ঠিক আছে।"

"চিন্তা কোরো না। এখন আমার অনেকটা ভাল লাগছে। বাড়ি ফিরে তোমাকে ফোন করব।"

"বেশ।"

অসীমা ফোন রেখে চা তৈরি করে টেবিলে নিয়ে এল। সে একটা লাল খামের উপর "ডা. স্যান্ডলারকে ফোন করো" লিখে নুন-মরিচদানিতে হেলান দিয়ে রেখে দিল। তারপর চায়ের চুমুক দিয়ে নাক কোঁচকাল। কাপটা ভাল করে ধোয়া হয়নি, মুখের কাছটায় বাসন মাজার সাবান লেগে আছে। ভাল করে না ধোয়ার জন্য নিজের উপরেই রাগ হল তার। ভাবল, গোগোল আর সোনিয়াকে ফোন করে কি বলা উচিত যে, বাবা হাসপাতালে? তারপরই মনে হল, একে ঠিক হাসপাতালে যাওয়া বলে না। রবিবার না হয়ে অন্য কোনও দিন হলে অশোক চেম্বারেই ডাক্তার দেখাতে পারত। কথাও তো সাধারণভাবেই বলল, একটু ক্লান্ত স্বরে, তবে অসুস্থ ঠেকল না তো!

তাই সে নিজের কাজে মন দিল। কার্ডের নীচটায় সে পরিবারের সকলের নাম লিখছে। প্রথমে স্বামীর নাম, যা স্বামীর সামনে সে কোনওদিন মুখেও আনেনি। তারপর নিজের নাম, শেষে ছেলে আর মেয়ের নাম। বয়স অনুযায়ী, একের পর এক। সে নিখিল লিখতে রাজি নয়, যদিও জানে ছেলে সেটাই পছন্দ করবে। বাবা-মা কখনও সন্তানকে ভালনাম ধরে ডাকে না। পরিবারের মধ্যে ভালনামের কোনও স্থান নেই। সে ঠিক করে, পরিবারের সকলকেও এবার কার্ড পাঠাবে। অশোকের অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানায়, নিউ ইয়র্কে গোগোলকে। ম্যাক্সিনের নামও কি থাকা উচিত? যদিও একবারের আলাপে ম্যাক্সিনের সঙ্গে সে ভালই ব্যবহার করেছে, ম্যাক্সিনকে সে মোটেই ছেলের বউ হিসেবে দেখতে চায় না। ম্যাক্সিন যখন তাকে অসীমা আর গোগোলের বাবাকে অশোক বলে ডাকল, তখন খুব অবাক লেগেছিল তার।

অথচ আজ একবছর হতে চলল গোগোল আর ম্যাক্সিনের সম্পর্ক হয়েছে। অসীমা এখন জানে যে, গোগোল ম্যাক্সিনের সঙ্গে রাত কাটায়। ম্যাক্সিনের বাপ-মায়ের সামনেই, এক ছাতের নীচে। তবে এ-কথাটা অসীমা কখনও বাঙালি বন্ধুদের সামনে স্বীকার করবে না। ম্যাক্সিনের বাড়ির ফোন নম্বরও তার কাছে আছে। একবার সে ফোনও করেছিল। ওপাশ থেকে যিনি ফোন ধরেছিলেন, তিনিই নিশ্চয়ই ম্যাক্সিনের মা। অসীমা কোনও কথা বলেনি। ফোন নামিয়ে রেখেছিল। অসীমা জানে, এই সম্পর্কটা মেনে নিতেই হবে। সোনিয়া বারবার অসীমাকে বুঝিয়ে বলেছে, লাইব্রেরির বন্ধুরাও বলেছে। সে এবার সানফ্রান্সিসকোয় সোনিয়া আর তার দুই রুমমেটের জন্য একটা কার্ড লিখল। বড়দিনের ছুটির জন্য এখন তার ব্যাকুলতা বাড়ছে। ওই সময় তারা চারজন আবার একত্র হবে। এ-বছর থ্যাংকসগিভিং উপলক্ষে গোগোল বা সোনিয়া কেউ বাড়ি আসেনি বলে অসীমার এমনিতেই মন খারাপ। সোনিয়া এখন একটা পরিবেশবিজ্ঞানের এজেন্সিতে কাজ করে, এলস্যাট পরীক্ষার জন্যও তৈরি হচ্ছে। সে বলে পাঠিয়েছিল, বাড়িতে ফেরার জন্য সে অতটা যাত্রা করতে পারবে না। গোগোলের ছুটির পরদিনই ফার্মে একটা জরুরি কাজ ছিল, তাই আসেনি। সে ম্যাক্সিনের পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটিয়েছে। আমেরিকায় আসার পর থেকে নিজের বাবা-মায়ের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে যাওয়াটা অসীমাকে এতই কষ্ট দিয়েছে যে, সে কিছুতেই বুঝতে পারে না তার ছেলে বা মেয়ের এত স্বাধীনতা প্রয়োজন কেন। কেন তাদের দরকার হয় মায়ের থেকে দূরে থাকার। তবু সে এ নিয়ে কোনও তর্ক করে না। অসীমাও বুঝতে শুরু করেছে। এই নিয়ে লাইব্রেরির বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে তারাও বলে, এমনটা হবেই। ছেলে-মেয়েরা সবসময় ছুটিতে বাড়ি ফিরবে, এমন আশা করা উচিত নয়। তাই সে আর অশোক থ্যাংকসগিভিং একসঙ্গে কাটিয়েছে, তবে এই প্রথম টার্কি কেনা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ছেলে-মেয়েদের কার্ডের তলায় অসীমা লেখে, "লাভ, মা।"। আর অশোকের কার্ডটার তলায় শুধু লেখে, "অসীমা।"

ঠিকানা লেখার বইয়ের দুটো পাতায় শুধু মেয়েরই বিভিন্ন ঠিকানায় ভরা। তারপর ছেলের ঠিকানা। অসীমার মনে হয়, সে দু'টো ভবঘুরের জন্ম দিয়েছে। এ-সব পুরনো, ভুলে যাওয়া ঠিকানা আর ফোন নম্বর আগলে সে বসে আছে যার অধিকাংশই একসময় তার মুখস্থ ছিল। নিউ হ্যাভেনে প্রথমবার ডর্ম রুমে থেকেছিল গোগোল। তারপর বহু ছোট্ট, গরম, অন্ধকার

অ্যাপার্টমেন্টে থেকেছে। আর এখন? ম্যানহাটনে গোগোলের অ্যাপার্টমেন্টে রেডিয়ারটা কত পুরনো, দাগধরা, ফাটা দেওয়াল। সোনিয়ার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা আলাদা নয়। আঠারো বছর বয়সের পর থেকেই দাদার মতো তারও প্রতিবছর ঠিকানা পালটায়। সঙ্গে সঙ্গে রুমমেটও পালটায়, আর তাদের নাম অসীমাকে মনে রাখতে হয়। অশোক এখন ক্লিভল্যান্ডের অ্যাপার্টমেন্টে। অসীমা একবার গিয়ে সেটা গুছিয়ে দিয়ে এসেছে। কেমব্রিজে যে ধরনের সস্তা বাসনপত্র তারা ব্যবহার করত, তেমন বাসন কিনে রেখে এসেছে। আজকাল অবশ্য ভারী নামকরা কোম্পানির বাসন তার জন্য উপহার আনে তার ছেলে বা মেয়ে। অশোকের জন্য এক বস্তা চাল, বিছানার চাদর, তোয়ালে আর পাতলা পরদা কিনতে হয়েছে। নিজের জীবনে অসীমা মোট পাঁচটি বাড়িতে থেকেছে। কলকাতায় তার বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়িতে এক মাস, কেমব্রিজের ভাড়াবাড়িটা, ক্যাম্পাসের কোয়ার্টার আর এই নিজের বাড়িতে। পাঁচ আঙুল, পাঁচটি বাড়ি। হাতের মুঠোয় একটা পুরো জীবন।

লিখতে লিখতে অসীমা জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। বেগনে রঙের বিকেলের আকাশে পাশাপাশি দুটো গোলাপি দাগ। সে দেওয়ালে লাগানো ফোনটার দিকে বাজার আশায় তাকায়। ভাবে, বড়দিনে স্বামীকে একটা সেলফোন কিনে দেবে। ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসা নিস্তব্ধ বাড়িটায় অসীমা একা-একা কাজ করতে থাকে, হাতব্যথা করলেও থামে না, উঠে টেবিলের উপরে ঝোলানো আলোটা জ্বালানোর কথাও মনে পড়ে না তার, লন বা বাড়ির অন্য কোনও আলো জ্বালানোর কথাও ভাবে না সে, যতক্ষণ না টেলিফোনটা বেজে ওঠে। অর্ধেকটা রিং হতেই ফোন তুলে নেয় অসীমা। ওপাশে বেচারি এক টেলিমার্কেটিয়ার, শনি-রবিবারেও কাজ করছে। সে জিজ্ঞেস করে, এখানে কি মিসেস উমম—

"গাঙ্গুলি," অসীমা খচাত করে ফোন নামিয়ে রাখে।

সন্ধ্যার সময় আকাশটা নীল হয়ে ওঠে। বাগানের গাছ আর চারপাশের বাড়িগুলো ঝুপসি অন্ধকারে পরিণত হয়। পাঁচটা বেজে যায়, কিন্তু অসীমার স্বামী ফোন করে না। অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করে কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। প্রতি দশ মিনিট অন্তর ফোন করতে থাকে অসীমা। কিন্তু অ্যানসারিং মেশিনে রেকর্ড করে আসা নিজের গলাটাই শুনতে পায় বারবার। প্রতিবারই কলার টোনটা শোনে, কিন্তু কোনও বার্তা রাখে না সে। ভাবে, বাড়ি আসার পথে কোথায় কোথায় থামতে পারে অশোক— ওষুধের দোকানে? খাবার

কিনতে সুপার মার্কেটে? ছ'টার সময় সে আর সারাদিনের মতো খামের মুখ বন্ধ করা আর স্ট্যাম্প লাগানোর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। ক্লিভল্যান্ডের অপারেটরকে ফোন করে অশোকের দেওয়া হাসপাতালের নম্বরটা ধরে ফেলে অসীমা। হাসপাতালকে বলে, এমারজেন্সি রুমে লাইনটা দিতে। তারপর হাসপাতালের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে অসীমার ফোনটা ঘুরে বেড়ায়। প্রত্যেককেই সে বলে, "উনি একটা পরীক্ষার জন্য ওখানে গিয়েছেন।" কেউ তাকে ধরে থাকতে বলে। কিন্তু অশোককে পাওয়া যায় না। পদবিটাকে বারবার বানান করে বলতে হয়, "জি লাইক গ্রিন, এন লাইক ন্যাপকিন।" লাইনটা ধরে থাকতে থাকতে অসীমা ভাবে ফোন রেখে দেবে কি না। হয়তো অশোক অন্য কোথাও থেকে বাড়িতে ফোন করার চেষ্টা করছে। লাইনটা কেটে যায়। আবার ফোন করে অসীমা, আবার বলে, "গাঙ্গুলি," আবার ফোন ধরে অপেক্ষা করতে হয়। তারপর একটি অল্পবয়সি মেয়ের গলা পাওয়া যায়, হয়তো সোনিয়ার বয়সিই হবে। "হ্যাঁ, আপনাকে অপেক্ষা করে থাকতে হল বলে দুঃখিত। কার সঙ্গে কথা বলছি আমি?"

"অসীমা গাঙ্গুলি। অশোক গাঙ্গুলির স্ত্রী। আপনি কে?"

"দুঃখিত ম্যাডাম। আমি একজন ইনটার্ন, আপনার স্বামীকে আমিই প্রথম পরীক্ষা করেছিলাম।"

"আমি প্রায় আধঘণ্টা ফোন ধরে আছি। আমার স্বামী আছেন না চলে গিয়েছেন?"

"সরি ম্যাডাম," মেয়েটি আবার বলে, "আমরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করেছি।"

তারপর অল্পবয়সি মেয়েটি অসীমাকে জানায়, তার স্বামী অশোক গাঙ্গুলি আর নেই।

আর নেই? এই দু'টো কথা ছোট ছোট কত জিনিস সম্পর্কে অসীমা ব্যবহার করেছে। শব্দ দু'টো কয়েক সেকেন্ড অসীমার কাছে কোনও অর্থই নিয়ে আসে না।

"না, না, কিছু একটা ভুল হচ্ছে," অসীমা শান্ত হয়ে বলে। সে মাথা নাড়ে, একটু হেসেও ফেলে। "আমার স্বামীর কোনও বড় অসুখ হয়নি। একটু পেটব্যথা হয়েছিল শুধু।"

"আমি দুঃখিত, মিসেস... গাঙ্গুলি, তাই না?"

অসীমা শোনে তার স্বামীর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক,

অনেক চেষ্টা করেও বাঁচানো যায়নি। স্বামীর কোনও অঙ্গ কি অসীমা দান করতে চায়? ক্লিভল্যান্ডে এমন কেউ কি আছে যে অশোককে আইডেন্টিফাই করতে পারে, দেহটা নিয়ে যেতে পারে? মেয়েটির কথার মধ্যেই অসীমা থপ করে ফোনটা রেখে দেয়, কোনও উত্তর দেয় না। ফোনটা একমিনিট ধরে চেপে রাখে, যতক্ষণ না পুরো ঘটনাটা তার কাছে স্পষ্ট হয়। টেবিলের খালি চায়ের কাপটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সে, তারপর উনুনে বসানো কেটলিটার দিকে, ঘণ্টাকয়েক আগে স্বামীর গলার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাওয়ার জন্য যেটা সে নিভিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ কাঁপুনি ধরে অসীমার। খালি বাড়িটার তাপমাত্রা হঠাৎই কয়েক ডিগ্রি কমে যায় যেন। অসীমা শাড়ির আঁচলটা জোর করে গায়ে জড়িয়ে নেয়। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে রোজকার মতো বাড়িটার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যায়। সব ঘরের আলো জ্বালায়, বাগান আর গ্যারেজের ফ্লাডলাইট দু'টো জ্বালিয়ে দেয়, যেন সে আর অশোক অতিথিদের জন্য অপেক্ষা করছে। রান্নাঘরের টেবিলে ফিরে এসে সে কার্ডের স্তূপ দেখতে পায়। যে লাল খামগুলো সে এত আহ্লাদ করে কিনেছিল সেগুলো তৈরি হয়ে পড়ে আছে, পোস্ট করার অপেক্ষায়। প্রতিটা কার্ডেই তার স্বামীর নাম লেখা। অসীমা ঠিকানার বই খোলে, হঠাৎই ছেলের নম্বরটা তার ভুল হয়ে যায়। অথচ ঘুমের মধ্যেও ছেলে-মেয়ের নম্বর ডায়াল করতে পারে সে। অফিসে বা অ্যাপার্টমেন্টে কোনও সাড়া না পেয়ে ম্যাক্সিনের বাড়ির নম্বরটায় চেষ্টা করল অসীমা। জি অক্ষরের নীচে গোগোলের অন্য নম্বরের সঙ্গে এটাও লেখা রয়েছে।

সোনিয়া সানফ্রান্সিসকো থেকে মায়ের কাছে উড়ে এল। গোগোল লাগার্ডিয়া এয়ারপোর্ট থেকে একাই চলে গেল ক্লিভল্যান্ড। পরদিন সকালে সে প্রথম উড়ান ধরল। প্লেন থেকে জানালা দিয়ে নীচে তাকালে মিডওয়েস্টের বরফঢাকা জমি আর রাংতার মতো চকচকে প্যাঁচানো নদীগুলো দেখতে পাওয়া যায়। প্লেনটা খালিই বলা চলে, বিজ়নেস সুট পরা কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ ল্যাপটপে কাজ করছে বা খবরের কাগজ পড়ছে। এত সকালে এভাবে যাতায়াত করা তাদের অভ্যেস আছে বোঝাই যায়। সে নিজে অন্তর্দেশীয় উড়ানের সঙ্গে পরিচিত নয়। একটা ছোট ব্যাগ নিয়ে সরু জায়গায় যাতায়াত করা তার অভ্যেস নয়। ম্যাক্সিন অবশ্য সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, গোগোলই বারণ করেছে। সে চায় না এমন কেউ তার সঙ্গে যাক,

যে বাবাকে ভাল করে চেনে না, যার সঙ্গে বাবার একবারই দেখা হয়েছিল। ম্যাক্সিন অবশ্য নাইন্‌থ অ্যাভিনিউ পর্যন্ত সঙ্গে হেঁটে এসেছিল। না আঁচড়ানো চুল, ঘুম লেগে থাকা মুখ নিয়ে শোবার পোশাকের উপর কোট পরে সে হেঁটে এসেছিল। গোগোল একটা এ টি এম থেকে টাকা তুলল। তারপর ট্যাক্সি ডাকল। সমস্ত দুনিয়া তখন ঘুমিয়ে। এমনকী, জেরাল্ড আর লিডিয়াও।

আগের রাতে ম্যাক্সিনের এক লেখক-বন্ধুর বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে গিয়েছিল তারা। তারপর কিছু বন্ধুর সঙ্গে ডিনারে। রাত দশটা নাগাদ ম্যাক্সিনের বাড়িতে ফিরে এসেছিল। জেরাল্ড আর লিডিয়া তখন সোফার উপর কম্বলের তলায় বসে হাতে ওয়াইনের গেলাস নিয়ে একটা ফরাসি সিনেমা দেখছিলেন। ওরা খুব ক্লান্ত হয়ে তাঁদের গুডনাইট বলে উপরে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ জেরাল্ড বললেন, "নিক, তোমার মা ফোন করেছিলেন।" ঘরের আলো নেভানো, কিন্তু টিভির স্ক্রিন থেকে আসা চাপা আলোয় গোগোল দেখল, লিডিয়া জেরাল্ডের কাঁধে মাথা রেখে বসে আছেন, তাঁদের দু'জনেরই পা কফিটেবিলে তোলা। লিডিয়া বললেন, "দু'বার।" গোগোল অস্বস্তিতে পড়ে গেল। গোগোলের মা কোনও বার্তা রাখেননি। এখন মা একা থাকে বলে গোগোলকে একটু বেশিই ফোন করে। ছেলে বা মেয়ের গলা না শুনলে একদিনও থাকতে পারেন না। কিন্তু ম্যাক্সিনের বাড়িতে মা তো কোনওদিন ফোন করেনি। সাধারণত অফিসে ফোন করে বা গোগোলের অ্যাপার্টমেন্টে ম্যাসেজ রাখে। গোগোল ভাবল, যাই হোক না কেন, কাল সকালে দেখা যাবে। সে বলল, "ধন্যবাদ জেরাল্ড।" তারপর ম্যাক্সিনের কোমর জড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঠিক তখনই ফোনটা বেজেছিল আবার। জেরাল্ড বললেন, "হ্যালো," তারপর গোগোলকে বললেন, "এবার তোমার বোন ফোন করেছে।"

ক্লিভল্যান্ড এয়ারপোর্ট থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত একটা ট্যাক্সি নিল গোগোল। নিউ ইয়র্কের থেকে ওহায়োতে অনেক বেশি ঠান্ডা। মাটিতে চাপ চাপ বরফ পড়ে রয়েছে। হাসপাতালটা পাহাড়ের ঢালে, বাড়িগুলো মাখনরঙের। দেওয়ালগুলো পাথরের। যে-এমারজেন্সিতে গতদিন গোগোলের বাবা ঢুকেছিলেন, আজ সে-ঘরেই গিয়ে ঢুকল গোগোল। নাম জানানোর পর তাকে সাততলায় যেতে বলা হল। তারপর একটা ঘন নীল দেওয়ালওয়ালা ঘরে অপেক্ষা করানো হল। ঘরটা পুরো খালি। গোগোল দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। ঘড়িটা আর ঘরটার অন্য সব আসবাব ইউজিন আর্থার বলে কারও দান করা। ঘরে কোনও পত্রিকা নেই,

কোনও টেলিভিশন নেই। শুধু দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একইরকম কতকগুলো চেয়ার আর শেষ মাথায় জল খাওয়ার জায়গা। কাচের দরজা দিয়ে একটা সাদা হল দেখা যাচ্ছে, সেখানে কয়েকটা খালি হাসপাতালের বিছানা। লোকজন নেই কোথাও, ডাক্তার বা নার্স ঘোরাঘুরি করছে না। গোগোল লিফ্‌টের দিকে তাকাল। মনে হয়, বাবা এখনই ওই লিফ্‌ট থেকে হেঁটে বেরিয়ে আসবে, মাথা হেলিয়ে গোগোলকে বুঝিয়ে দেবে যাওয়ার সময় হয়েছে। শেষ পর্যন্ত লিফ্‌টের দরজা খোলে। গোগোল দেখল, সেখানে একটা ঠেলাগাড়ি ভরতি ব্রেকফাস্টের ট্রে আর দুধের পাত্র। হঠাৎই খিদে পেল তার। ভাবল, প্লেনে দেওয়া রুটিটা নিয়ে নিলে পারত। কাল সন্ধ্যায় শেষবার খেয়েছে সে, চায়নাটাউনের আলো ঝলমলে একটা রেস্তোরাঁয়। আধঘণ্টা ফুটপাথে অপেক্ষা করার পর টেবিল পাওয়া গিয়েছিল, ম্যাক্সিনের পছন্দের চিনে খাবার খেয়েছিল ওরা। বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে পেটে পড়া ওয়াইন তখন নেশা ধরাতে শুরু করেছে, ওরা অলসভাবে বিয়ার আর জ্যাসমিন টি নিয়ে বসেছিল। সে-সময় বাবা আর বেঁচে ছিল না।

দরজা খুলে কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা একজন মাঝবয়সি, সৌম্যদর্শন লোক ঘরে ঢুকলেন। পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের সাদা কোট, হাতে ক্লিপবোর্ড। তিনি হেসে গোগোলকে বললেন, "হ্যালো।"

"আপনি কি আমার বাবার ডাক্তার... ছিলেন?"

"না, আমি মি. ড্যাভেনপোর্ট। আপনাকে নীচে নিয়ে যেতে এসেছি।"

মি. ড্যাভেনপোর্ট গোগোলকে ডাক্তার ও রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট একটি লিফটে করে হাসপাতালের মাটির নীচের অংশে নিয়ে গেলেন। মর্গে সাদা চাদর সরিয়ে বাবার মুখ দেখানো হল গোগোলকে। মুখটা হলদেটে, সামান্য ফোলা। ঠোঁট দুটো ফ্যাকাশে। বাবাকে রাগী দেখাচ্ছে, যা বাবার চরিত্রের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। চাদরটা তলায় বাবার শরীরে কোনও পোশাক নেই। হঠাৎই গোগোলের লজ্জা হল, সে চোখ সরিয়ে নিল। ফিরে তাকিয়ে তার মনে হল, কিছু একটা ভুল হচ্ছে। বাবার কাঁধে টোকা মারলেই বাবা উঠে বসবে। চেনাই যাচ্ছে না বাবাকে। চেনার মধ্যে শুধু বাবার গোঁফজোড়া, গালের রোম আর চব্বিশ ঘণ্টার বেশি আগে কাটা চিবুকের দাড়ি।

"ওঁর চশমাজোড়া কোথায়?" মি. ড্যাভেনপোর্টকে জিজ্ঞেস করল সে।

প্রথমে তিনি উত্তর দিলেন না। তারপর বললেন, "মি. গাঙ্গুলি, আপনি কি দেহটি চিনতে পারছেন? ইনিই কি আপনার বাবা?"

"হ্যাঁ, ইনিই আমার বাবা," গোগোলের কানে নিজের গলাই অচেনা ঠেকে। কয়েক মিনিট পর সে বুঝতে পারল, মি. ড্যাভেনপোর্ট সরে গিয়েছেন, তাকে বসার জন্য একটা চেয়ার দেওয়া হয়েছে। গোগোল চেয়ারে বসল। বাবার কপালে কি হাত রাখা উচিত, যেভাবে বাবা ছোটবেলায় জ্বর দেখত? কিন্তু গোগোলের খুব ভয় করল। সে হাত নাড়াতে পারল না। শেষে, তর্জনী দিয়ে সে বাবার গোঁফ স্পর্শ করল, একটা ভুরু, চুলের রেখা ছুঁয়ে দেখল। বাবার শরীরের এই অংশগুলো সে চেনে। গোগোলের মনে হল এগুলো এখনও চুপিচুপি বেঁচে রয়েছে।

মি. ড্যাভেনপোর্ট এসে জিজ্ঞেস করলেন, সে তৈরি কি না। তারপর চাদরটা দিয়ে বাবাকে আবার ঢেকে দেওয়া হল। গোগোলকে ঘর থেকে বের করে নেওয়া হল। একজন রেসিডেন্ট ডাক্তার এসে বুঝিয়ে বললেন, ঠিক কীভাবে আর কখন হার্টঅ্যাটাক হয়েছিল, কেন ডাক্তাররা কিছু করতে পারেননি। বাবা যে জামাকাপড় পরে এসেছিলেন, সেগুলো গোগোলকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। নীল প্যান্ট, খয়েরি স্ট্রাইপ দেওয়া সাদা শার্ট, গতবছর বড়দিনে গোগোল ও সোনিয়ার দেওয়া একটা সোয়েটার। খয়েরি মোজা আর জুতো। চশমা, কোট আর স্কার্ফ। একটা বড় কাগজের শপিং ব্যাগে সবগুলো ভরা। কোটের পকেটে একটা বই রয়েছে, গ্রাহাম গ্রিনের *দ্য কমেডিয়ানস*, পাতাগুলো হলুদ, লেখাগুলো ছোট ছোট। বইটা খুলে গোগোল দেখল, সেটা সেকেন্ড হ্যান্ড। ভিতরে রয় গডউইনের নাম লেখা রয়েছে। একটা আলাদা খামে বাবার মানিব্যাগ আর গাড়ির চাবি গোগোলকে ধরিয়ে দেওয়া হল। সে হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিল, কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার দরকার নেই। জানা গেল, অস্থিভস্ম কয়েকদিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে। সে ব্যক্তিগতভাবে তা সংগ্রহ করতে পারে, না হলে ডেথ-সার্টিফিকেটসহ পেম্বারটন রোডের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। চলে আসার আগে গোগোল এমারজেন্সি রুমে যেতে চাইল। ঠিক সেই জায়গাটা দেখতে চাইল, যেখানে বাবা শেষবারের মতো জীবিত ছিল। চার্ট দেখে বেড নাম্বারটা জানা গেল। সেই বেডে এখন এক যুবক শুয়ে, তার হাতে প্লাস্টার। ওই প্লাস্টারটা ছাড়া সে দিব্যি স্বাভাবিক, হাসিঠাট্টা করছে। গোগোল বেডের চারপাশে টাঙানো পরদার দিকে তাকাল। সবুজ আর ছাই রঙের ফুলছাপ পরদা, উপরদিকে সাদা নেট, স্টিলের হুক দিয়ে রডের সঙ্গে ঝোলানো। এই পরদাগুলোই মৃত্যুর সময় তার বাবাকে ঘিরে ছিল।

বাবার লিজ় নেওয়া গাড়িটা কেমন দেখতে মা বলে দিয়েছিল। সেটা তখনও ভিজ়িটার্স কার পার্কে দাঁড়ানো। এঞ্জিন চালু করা মাত্র গাড়ির রেডিয়ো থেকে খবর পড়ার শব্দ গোগোলকে অবাক করে দিল। বাবা গাড়ি থেকে নামার সময় রেডিয়ো অফ করার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকত। অবশ্য এই গাড়িটায় বাবার কোনও চিহ্ন নেই। কোনও কাগজের টুকরো, খালি কাপ, রসিদ বা খুচরো কিচ্ছু নেই। গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন আর কোম্পানির হ্যান্ডবুক। সেই বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে গোগোল ওয়াইপার আর হেডলাইট ঠিক আছে কি না, পরীক্ষা করে দেখল। রেডিয়ো বন্ধ করে দিল। তারপর একা নীরবতার মধ্যে গাড়ি চালিয়ে দিল এই শীতার্ত, গুমোট দুপুরে, অসুন্দর শ্রীহীন শহরটার মধ্যে দিয়ে যেখানে এ-জীবনে আর ফিরতে হবে না। হাসপাতালের নার্সের কাছ থেকে বাবার অ্যাপার্টমেন্টের রাস্তা বুঝে নিয়েছিল। গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবল, তার বাবা কি এই রাস্তাতেই হাসপাতালে এসেছিল? কোনও রেস্তোরাঁর পাশ দিয়ে গেলে থামতে ইচ্ছে করছিল তার, কিন্তু হঠাৎই এসে পড়ল বসতবাড়িতে ভরা একটা পাড়ায়। বিশাল সব ভিক্টোরিয়ান ইমারতে, বাগানে আর বাঁধানো রাস্তায় বরফ জমে আছে।

ব্যারন্‌স কোর্ট নামে একটা কমপ্লেক্সে বাবার অ্যাপার্টমেন্ট। গেটের কাছে বিরাট বিরাট চিঠির বাক্স, তাতে একমাসের চিঠি অনায়াসে ধরে যাবে। প্রথম বাড়িটার গায়ে লেখা রেন্টাল অফিস। সেখানে বসা একটি লোক গোগোলকে দেখে মাথা নাড়ল। সে কি গোগোলকে বাবা বলে ভুল করেছে? যে-কারণেই হোক, এটা ভেবে খুব স্বস্তি হল গোগোলের। এখানে সব বাড়িগুলোই একরকম। তিনতলা, টিউডর আমলের বাড়ির মতো দেখতে, রাস্তার দু'ধারে পরপর খাড়া হয়ে আছে। নাম আর নম্বর ছাড়া একটাকে অন্যটার থেকে আলাদা করা যায় না। এই অনন্ত সাদৃশ্য গোগোলকে বিরক্ত করে তুলল, হাসপাতালেও তার এত খারাপ লাগেনি। এমনকী, বাবার মুখ দেখেও এত অস্বস্তি হয়নি তার। বাবা এ-রকম একটা জায়গায় গত তিনমাস ধরে একা ছিল? গোগোলের চোখ ফেটে জল এল। তবে সে জানে এ-সব জিনিসে তার বাবা কখনও বিরক্ত হয়নি, খেয়ালই করেনি হয়তো। বাবা যে-বাড়িতে থাকত, তার সামনে গাড়ি থামাল। গাড়িতে বসে বসে দেখল, এক বয়স্ক দম্পতি টেনিস র‍্যাকেট নিয়ে বেরোচ্ছে। বাবা বলেছিল বটে, এখানকার বাসিন্দারা অধিকাংশই অবসরপ্রাপ্ত বা ডিভোর্সি। কমপ্লেক্সের মধ্যেই হাঁটার

জন্য আলাদা পথ রয়েছে, ব্যায়াম করার জায়গা রয়েছে, একটা ছোট পুকুরের চারদিকে বসার বেঞ্চি আর উইলো গাছের সারিও রয়েছে।

বাবার অ্যাপার্টমেন্ট তিনতলায়। গোগোল দরজা খুলল। জুতো খুলে প্লাস্টিকের পাপোশের উপর রাখল। ভিতরে দামি কার্পেট পাতা। কোনায় বাবার স্নিকার আর হাওয়াই চটি রাখা আছে। প্রথমেই একটা বড় লিভিং রুম। তার একপাশে রান্নাঘর অন্য পাশে একটা স্লাইডিং কাচের দরজা। দেওয়ালে কিছুই ঝুলছে না। রান্নাঘরটা অর্ধেক দেওয়াল দিয়ে দু'ভাগ করা। যেমনটা মায়ের বহুকাল ইচ্ছে ছিল, যাতে রান্না করতে করতে দেওয়ালের ওপাশের লোকজনের সঙ্গে কথা বলা যায়। ফ্রিজের উপর মা গোগোল আর সোনিয়ার ছবি ম্যাগনেট দিয়ে আঁটা। তিনজনে ফতেপুর সিক্রিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গরম পাথরের মেঝে থেকে পা বাঁচাতে কাপড় দিয়ে পায়ের পাতা বাঁধা। তখন সে হাইস্কুলে পড়ে, রোগা আর গম্ভীর। সোনিয়া একেবারেই বালিকা। মা সালোয়ার কামিজ পরে আছে, যা কলকাতার আত্মীয়স্বজনের সামনে পরতে মায়ের লজ্জা করত। গোগোল কাবার্ড খুলতে লাগল। বেশিরভাগই ফাঁকা। সে চারটে প্লেট, দু'টো মগ আর চারটে গ্লাস খুঁজে পেল। একটা ড্রয়ারে ছুরি আর দু'টো কাঁচি রয়েছে, নকশা দেখে বোঝা যাচ্ছে বাড়ি থেকে আনা। অন্য একটা আলমারিতে টি-ব্যাগ, বিস্কুট, অনেকটা চিনি আর দুধের টিন। কয়েকটা ছোট কড়াইশুঁটির প্যাকেট, প্লাস্টিকের ব্যাগে চাল। রান্নাঘরের কাউন্টারের উপর একটা রাইস কুকার রাখা আছে। উনুনের পাশে কতকগুলো মশলার শিশি, মায়ের হাতে লেবেল করা। সিঙ্কের তলায় একটা স্পঞ্জ, বাসনমাজার পাউডার, ময়লা ফেলার ব্যাগ।

সে পুরো অ্যাপার্টমেন্টটা ঘুরে দেখল। লিভিং রুমের পিছনে একটা ছোট বেডরুম, সেখানে বিছানা ছাড়া আর কিছু নেই। তার পাশে জানালাহীন বাথরুম। বেসিনের পাশে এক জার পন্ড্স কোল্ডক্রিম রাখা। বাবা আফটার শেভের বদলে সারাজীবন এটাই ব্যবহার করেছে। গোগোল কাজে লেগে গেল। সব জিনিস কাগজের ব্যাগে ভরল: মশলা, কোল্ড ক্রিম, বিছানায় রাখা টাইম ম্যাগাজিনটা। মা ফোনে বলেছিল "কিছু ফেরত এনো না। আমাদের দেশে তা করে না।" রান্নাঘরে এসে একটু থামতেই হল। এত খাবার জিনিস ফেলে দেবে? বাবা হলে বাড়তি চাল আর টি-ব্যাগ সুটকেসে ভরে নিত। নষ্ট করা বাবা পছন্দ করত না। চা করার সময় কেটলিতে বেশি জল নিলেও বাবা মাকে বকাবকি করত।

প্রথমবার বেসমেন্টে গিয়ে গোগোল দেখল, একটা টেবিলে অন্য ভাড়াটেরা জিনিস রেখে গেছে। যার খুশি নিয়ে যেতে পারে। বই, ভিডিয়ো টেপ, কাচের ঢাকনিওয়ালা সাদা ক্যাসারোল। শিগগিরই বাবার জিনিসগুলো সেখানে জায়গা পেয়ে গেল। ছোট ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, রাইস কুকার, ক্যাসেট প্লেয়ার, টেলিভিশন, রডে লাগানো পরদা। হাসপাতাল থেকে আনা জিনিসগুলোর মধ্যে মানিব্যাগটা সে রেখে দিল। তাতে চল্লিশ ডলার, তিনটে ক্রেডিট কার্ড, কতকগুলো রসিদ, তার ও সোনিয়ার শৈশবের ছবি। ফ্রিজে লাগানো ছবিটাও রেখে দিল।

এত সময় লাগবে গোগোল ভাবেনি। তিনটে প্রায় ফাঁকা ঘর খালি করেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এইক'টা জিনিসেই বেশক'টা ব্যাগ ভরে গিয়েছে, অনেকবার নীচে-উপরে করতে হয়েছে। কাজ যখন শেষ হল, অন্ধকার হয়ে এসেছে। সব পাট চুকিয়ে ফেলার আগে কয়েকজনকে ফোন করতে হবে। ভাড়ার অফিস, বিশ্ববিদ্যালয়। যেখানেই ফোন করল গোগোল, একই কথা শুনল, "আমরা খুব দুঃখিত। এই তো শুক্রবারই দেখা হল। কী দুঃখের খবর!" রেন্টাল অফিস থেকে বলল, আসবাবপত্র সরিয়ে নিতে কাউকে পাঠাবে। শেষে গোগোল ভাড়ার গাড়িটা ফেরত দিতে গেল, শহর থেকে ফিরল বাসে করে। লবিতে পিজ়া কোম্পানির একটা মেনু চোখে পড়তে পিজ়া চেয়ে ফোন করে দিল। তারপর বাড়িতে ফোন করল। ঘণ্টাখানেক ধরে এনগেজ্‌ড পাওয়ার পর শেষ অবধি জানা গেল মা আর সোনিয়া দু'জনেই ঘুমিয়ে আছে। একজন পারিবারিক বন্ধু ফোন ধরে বললেন। ওপাশ থেকে জোরে জোরে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সেই মুহূর্তে গোগোল বুঝতে পারল তার চারপাশে কী ভীষণ নিস্তব্ধতা। ভাবল, নীচে গিয়ে টেলিভিশন বা টেপটা নিয়ে আসবে কি না। তবে ও-সব না করে ম্যাক্সিনকে ফোন করল সে। সারাদিনের ঘটনা জানাল। এই তো সকালেই ম্যাক্সিন তার সঙ্গেই ছিল, ম্যাক্সিনের বিছানাতেই ভোরে ঘুম ভেঙেছে তার। ম্যাক্সিন বলল, "আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারতাম। কাল সকালেও পৌঁছোতে পারি।"

"আমার কাজ হয়ে গেছে। আর কিছু করার নেই। কাল প্রথম ফ্লাইটে ফিরব।"

"ওই অ্যাপার্টমেন্টেই তুমি রাত কাটাবে, তাই না, নিক?"

"কাটাতেই হবে। আজ রাতে কোনও প্লেন নেই। আমি এখানে কাউকে চিনিও না।"

"ওখানে থেকো না। বেরিয়ে এসো। কোনও হোটেলে ওঠো।"

গোগোল বলল, "আচ্ছা।"

তিনমাস আগে বাবার সঙ্গে শেষ দেখা। বাবার ছবিটা চোখে ভেসে ওঠে। সে আর ম্যাক্সিন গাড়ি নিয়ে পেম্বারটন রোডের ড্রাইভওয়ে থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আর পিছনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে বাবা। শেষবার বাবার সঙ্গে কী কথা হয়েছিল? কবে কথা হয়েছিল? দু'সপ্তাহ আগে? চার সপ্তাহ? বাবা তো মা-র মতো ঘনঘন ফোন করে না।

"তুমি আমার সঙ্গে ছিলে," গোগোল ম্যাক্সিনকে বলল।

"কখন?"

"শেষবার যখন বাবার সঙ্গে দেখা হয়? তুমি ছিলে।"

"আমি জানি। দুঃখিত, নিক। কথা দাও, তুমি হোটেলে উঠবে।"

"কথা দিলাম।"

ফোন রেখে গোগোল টেলিফোন ডাইরেক্টরি খুলল। কোথায় থাকা যায়? সে ম্যাক্সিনের কথা শুনে চলতে অভ্যস্ত। সে একটা হোটেলের নম্বর ডায়াল করল। অচেনা গলায় শোনা গেল, "মে আই হেল্প ইউ?" রাতে ঘর পাওয়া যাবে কি না জিজ্ঞেস করেও লাইন কেটে দিল গোগোল। অচেনা কোথাও নৈর্ব্যক্তিক ঘরে সে থাকতে চায় না। সে বাবার ঘরেই কাউচের উপর শুয়ে রইল। জামাকাপড় ছাড়ল না। জ্যাকেটটা গায়ে দিয়ে শুয়ে রইল। ও-ঘরের ঠান্ডা গদির থেকে এই ভাল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুম আর জাগরণের মধ্যে অন্ধকারে শুয়ে রইল। গতকাল সকালেও বাবা এখানেই ছিল। যখন শরীর খারাপ হল, তখন কী করছিল বাবা? চা বানাচ্ছিল? গোগোল কল্পনা করল, বাবা নিচু হয়ে শেষবারের মতো জুতোর ফিতে বাঁধছে। কোট আর স্কার্ফ পরে হাসপাতালের দিকে রওনা হচ্ছে। হয়তো গাড়ি সিগনালে থামিয়ে আবহাওয়ার খবর শুনেছিল, তখন বাবা ভাবেওনি আর বাঁচবে না। অনেক পরে জানালা দিয়ে ভোরের নীলচে আলো ঘরে ঢুকল। অদ্ভুত লাগছিল গোগোলের, যেন একটু মনোযোগ দিলেই বাবা এসে এ-সব কিছু থামিয়ে দেবে। চোখের সামনে আকাশ সাদা হল, অটুট নীরবতার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে বাস্তব জীবনের চাপা শব্দ এসে ঢুকল। সেই মুহূর্তে গোগোল গভীর ঘুমে ডুবে গেল।

পাথরের মতো ঘুমিয়ে গোগোল যখন উঠল, তখন দশটা বাজে। মাথার ডানদিকে তীব্র ব্যথা। স্লাইডিং কাচের দরজা খুলে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল।

ক্লান্তিতে চোখ জ্বালা করছে। সামনেই পুকুরটা। বাবা বলেছিল, রাতের খাওয়ার আগে কুড়িবার ওই পুকুরটাকে চক্কর কাটে বাবা। তাতে নাকি মোট দু'মাইল হাঁটা হয়। এখন সেখানে কয়েকজন কুকুর নিয়ে হাঁটছে, কেউ ব্যায়াম করছে, কানে মোটা মাফলার বেঁধে হাত ঘোরাচ্ছে। গোগোল কোট পরে বাইরে গেল, পুকুরটার পাড়ে হাঁটার চেষ্টা করল। প্রথম-প্রথম মুখের উপর ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা ভালই লাগছিল। কিন্তু পরে শীত বাড়তে লাগল। কাঁপুনি ধরল, শরীরে যেন ঠান্ডা ছুরি চলছে। গোগোল ঘরে ফিরে এল, স্নান করে আগের দিনের পরা জামাকাপড়ই আবার পরল। ট্যাক্সি ডাকল একটা। তারপর বেসমেন্টে গিয়ে গা মোছার তোয়ালেটা আর বোতাম টেপা ফোনটা রেখে এল। এয়ারপোর্ট থেকে বস্টনের প্লেন ধরল সে। সোনিয়া আর মা সেখানকার এয়ারপোর্টে ওকে নিতে আসবে। তা না হলেই গোগোল খুশি হত। ওদের সঙ্গে দেখা হওয়ার মুহূর্তটা যদি পিছিয়ে দেওয়া যেত! মা'র সঙ্গে দেখা করতে ভয় করছে। এত ভয়, মর্গে বাবার মৃতদেহ দেখতেও করেনি। এখন সে বুঝতে পারছে, এই দূর আমেরিকায় বসে হঠাৎ একদিন নিজেদের বাবা-মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেতে তার বাবা-মায়ের কেমন লেগেছিল। খবর পাওয়ার বেশ কয়েকদিন বা কয়েকমাস পরে দেশে পৌঁছোতে কীরকম অপরাধবোধ তাদের মধ্যে কাজ করেছিল।

ক্লিভল্যান্ড যাওয়ার পথে মনে হয়েছিল সময় অনন্ত। এবার সে কিছুই দেখল না, কিছুই ভাবল না। খুব তাড়াতাড়ি রাস্তা ফুরিয়ে এল। বস্টনে প্লেন নামাটা বুকের মাঝে অনুভব করল গোগোল। নামার ঠিক আগে বাথরুমে গিয়ে ছোট্ট বেসিনটায় বমি করল সে। মুখ ধুয়ে আয়না দেখল। একদিনের না-কাটা দাড়িটা ছাড়া নিজের কোনও পরিবর্তন দেখতে পেল না। মনে পড়ল, বহুদিন আগে, যেদিন ঠাকুরদা মারা গিয়েছিলেন, বাবা ক্ষুর দিয়ে দাড়ি-চুল-গোঁফ চেঁচে ফেলছিল, আর মা হঠাৎ দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। মাথায় কেটে গিয়েছিল বাবার, টুপি পরে অফিসে যেত তখন। মা বলেছিল, "ছেড়ে দাও, ব্যথা লাগবে।" বাবা বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, পুরো মাথা কামিয়ে তারপরে বেরিয়েছিল। গোগোল পরে জেনেছে, এটা বাঙালিদের নিয়ম। বাবা বা মা-র মৃত্যুর পর ছেলের মাথা কামাতে হয়। কিন্তু সে-সময় গোগোল কিছুই বোঝেনি। বাবার ন্যাড়া মাথা দেখে হেসেছিল। সোনিয়া তখন শিশু, সে বাবাকে দেখে কেঁদে উঠেছিল।

প্রথম সপ্তাহে তারা তিনজনে একা হল না। সারাক্ষণ বাড়িতে লোক। দশজন, কুড়িজন। ড্রয়িং রুমে চুপ করে বসে থাকছে, মাথা নিচু, হাতে চায়ের কাপ। যেন বাবার অনুপস্থিতি এরা সবাই মিলে পূর্ণ করবে। মা সিঁথি থেকে সিঁদুর তুলে ফেলেছে। হাত থেকে লোহা খুলে ফেলেছে কোল্ড ক্রিম দিয়ে, অন্য সব চুড়িও খুলেছে। সহানুভূতির কার্ড আর ফুলে বাড়ি ভরে যাচ্ছে। পাঠাচ্ছে তার বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীরা, মায়ের লাইব্রেরির বন্ধুরা, প্রতিবেশীরা যারা নিজের বাগান থেকে হাত নাড়া ছাড়া আর কোনও যোগাযোগই রাখেনি। মিশিগান, টেক্সাস, ওয়েস্ট কোস্ট আর ডিসি থেকে চেনা লোকজন ফোন করেই চলেছে। মায়ের ঠিকানার বই থেকে সশরীরে বেরিয়ে আসছে লোকজন, সেই ঠিকানার বই যাতে নাম শুধুই বাড়ে। যার থেকে নাম কখনও কেটে বাদ দেওয়া হয় না। তারা সবাই বাবার মারা যাওয়ার খবর পেয়ে মর্মাহত। সবকিছু ছেড়েছুড়ে এই প্রবাসে বাবা এসেছিল ভালভাবে থাকতে, মরতে নয়। ফোন বাজতেই থাকে। একই কথা শুনতে শুনতে কান ব্যথা করতে থাকে ওদের, একই কথা বুঝিয়ে বলতে বলতে মুখে ফেনা উঠে যায়। না, উনি অসুস্থ ছিলেন না, ওরা বারবার বলে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা একেবারেই আকস্মিক। শহরের কাগজে ছোট অবিচুয়ারিও বেরোয়, ওদের চারজনের নাম করে। তাতে বলা হয়, গোগোল আর সোনিয়া স্থানীয় স্কুলে পড়াশোনা করেছে। মাঝরাতে ওরা ভারতে আত্মীয়স্বজনকে ফোন করে। এই প্রথমবার আমেরিকা থেকে খারাপ খবর ভারতে পৌঁছোয়।

বাবা মারা যাওয়ার পর দশদিন মা, সোনিয়া আর গোগোল নিজে হবিষ্যি করে। মাছমাংস খায় না। সেদ্ধ করা ভাত, ডাল আর তরকারি খেয়ে থাকে। গোগোলের মনে আছে, ছোটবেলায় ঠাকুরদা-ঠাকুমা মারা যাওয়ার সময়ও গোগোলকে এমনটাই করতে হয়েছিল। একবার সেই অশৌচের সময় স্কুলে ভুল করে হ্যামবার্গার খেয়ে ফেলায় মা বকেছিল তাকে। মনে আছে, এ-সব নিয়ম মানতে বাধ্য করায় খুব রেগে গিয়েছিল সে। জীবনে এক-আধবার যাঁদের দেখেছে, তাঁদের জন্য এমন অদ্ভুত নিয়ম পালন করতে হবে কেন যা তার চেনা কেউ করে না? মনে আছে, বাবা দাড়ি না কামিয়ে চুপ করে বসে থাকত, কারও দিকে তাকাত না, কথা বলত না। টেলিভিশন চলত না তখন, ওরা চুপ করে খেত। এখন সন্ধে সাড়ে ছ'টার সময় চুপ করে রান্নাঘরের টেবিলে বসে থাকতে থাকতে, বাবার খালি চেয়ারটার দিকে নজর চলে যায়। বাইরে যেন তখনই মাঝরাত। এখন গোগোলের মনে হয়, একমাত্র এই

নিরামিষ খাওয়াই যেন জীবনে তাৎপর্য নিয়ে আসছে। নিরামিষ বলে খাওয়া বন্ধ করার কোনও ইচ্ছে হয় না। বরং, এই দশটি রাতে ওরা তিনজনই অদ্ভুতভাবে ক্ষুধার্ত থাকে। বিস্বাদ খাবারের জন্য অপেক্ষা করে। অশৌচের দিনগুলোয় এই রাতের খাওয়ার পালাই যেন একটি কাঠামো রচনা করে। মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম করা, তিনটে প্লেট নামিয়ে টেবিলে রাখা, তিন গেলাস জল গরম করা। বাকি সবকিছু— ফোন বাজার নিরন্তর শব্দ, বাড়িভরতি ফুল, সহানুভূতি জানাতে আসা অতিথির দল, কথা না বলে বসার ঘরে চুপ করে বসে থাকা— নিরর্থক মনে হয়। পরস্পরের সঙ্গে কথা না বলেও ওরা বুঝতে পারে, এই খাবার সময়টা ওদের নিজস্ব, একে-অপরের সঙ্গে কাটানোর মতো সময়। দিনের শুধু এই সময়টাতেই ওরা 'পরিবার' হয়ে ওঠে। বাড়িতে অন্য কেউ থাকলেও এই রাতের খাবারটা কেবল ওরা তিনজনেই খায়। আর এই সময়টাতেই যেন বাবাকে টের পাওয়া যায়, প্লেটে নিত্যদিনের কিছু খাবারের অনুপস্থিতি যেন বাবাকে সেই টেবিলে এনে দেয়।

এগারো দিনের দিন অশৌচ ভাঙবার উপলক্ষে কিছু বন্ধুকে নেমন্তন্ন করা হল। লিভিং রুমের একটা কোনায় কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হল। গোগোল বাবার ছবির সামনে বসল। এক পুরোহিত সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। আগের সারাটাদিন ওরা অ্যালবাম ঘেঁটে বাবার একটা ছবি বের করেছিল, বাঁধানোর জন্য। কিন্তু বাবার একার কোনও ছবি পাওয়া আর যায় না। বাবা তো চিরকালই ক্যামেরার পিছনে থেকেছে। শেষ পর্যন্ত বাবা আর মায়ের একটা বহু পুরনো ছবি থেকে বাবার ছবিটা কেটে বের করে নেওয়া হল। বাবা-মা দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের ধারে, বাবার পরনে জ্যাকেট আর স্কার্ফ। সোনিয়া সেটা এনলার্জ করাতে নিয়ে গেল। অশৌচ ভাঙার দিন নানা রকম খাবারদাবারের ব্যবস্থা করা হল। দারুণ শীতের দিনে চায়নাটাউন থেকে মাছমাংস কিনে এনে বাবার পছন্দমতো আলু আর ধনেপাতা দিয়ে রান্না করা হল। চোখ বন্ধ করলে এ যেন খুব চেনা আর একটা পার্টির দিন, বাড়িময় রান্নার গন্ধ। এমন পার্টির দিন আগে বহুবার কাটিয়েছে ওরা। অসীমা বলতে লাগল, চাল বাড়ন্ত। গোগোল আর সোনিয়া অতিথিদের কোট নিয়ে উপরের তলায় গেস্ট বেডরুমে রাখতে লাগল। বাবা-মায়ের তিরিশ বছর ধরে সংগ্রহ করা বন্ধুর দল উপস্থিত। পেম্বারটন রোড জুড়ে ছ'টা স্টেটের গাড়ি দাঁড়িয়ে।

ম্যাক্সিন নিউ ইয়র্ক থেকে ড্রাইভ করে এসে পৌঁছোল, সঙ্গে গোগোলের কিছু জামাকাপড়, চিঠি আর ল্যাপটপ। অফিস থেকে তাকে এক মাসের ছুটি

দেওয়া হয়েছে। ম্যাক্সিনকে দেখে গোগোলের বিশেষ আনন্দ হল না। সোনিয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে গিয়ে কেমন বেমানান লাগল সবকিছু। এবারে কিন্তু গোগোলের একবারও মনে হল না, বাড়িটা দেখে বা দরজার পাশে স্তূপ হয়ে থাকা অতিথিদের জুতো দেখে কী ভাববে ম্যাক্সিন। সে বুঝতে পারছিল, এক বাড়ি বাঙালি লোকজনের মধ্যে ম্যাক্সিন মিশতে পারছে না, অস্বস্তিতে আছে। তবু তার ইচ্ছে হল না, ম্যাক্সিনকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, লোকে বাংলায় কী বলছে তা তর্জমা করে বুঝিয়ে দেয়, ওর পাশেপাশে থাকে। সে শুনল মাকে ম্যাক্সিন বলছে,"আয়াম সো সরি," কিন্তু গোগোল জানে বাবার মৃত্যুতে ম্যাক্সিনের কিছুই এসে যায় না। অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার পর গোগোলকে দোতলায় একটু একলা পেয়েই ম্যাক্সিন বলে, "তোমরা দু'জনে তো তোমার মা'র সঙ্গে সারাজীবন থাকতে পারবে না। তুমি তো তা জানো।" তারপর গোগোলের গালে আঙুল ছোঁয়ায়। গোগোল স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে ওর হাতটি নিয়ে ওরই কোলের উপর নামিয়ে রাখল।

"আমি তোমাকে মিস করি, নিখিল।"

গোগোল মাথা নাড়ে।

"একত্রিশে ডিসেম্বর রাতে?"

"একত্রিশে ডিসেম্বর রাতে কী?"

"তুমি একটু চেষ্টা করলে নিউ হ্যাম্পশায়ারে গিয়ে পৌঁছোতে পারো।" দু'জনে আগে এ নিয়ে কথা বলেছিল। বাবার মৃত্যুর আগে। ঠিক ছিল, ম্যাক্সিন ওকে পেম্বারটন রোড থেকে তুলে নেবে, দু'জনে মিলে নিউ হ্যাম্পশায়ারে যাবে। লেক হাউজে থাকবে। ম্যাক্সিন গোগোলকে স্কি করা শেখাবে।

"না।"

"তোমার ভাল লাগবে," ম্যাক্সিন ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল, ঘরের চারদিকে চোখ ঘোরাল, "এ-সব থেকে দূরে যেতে ভাল লাগবে।"

"আমি দূরে যেতে চাই না।"

পরের সপ্তাহগুলোয় প্রতিবেশীদের বেড়াঝোপ আর জানালা রঙিন আলোর মালায় সেজে উঠল, সব বাড়িতেই ক্রিসমাস-কার্ডের বোঝা এসে পৌঁছোল। উৎসবের দিনগুলোয় ওরা তিনজনে এমন সব কাজ ভাগ করে

নিল যা এতদিন বাবা একাই করে এসেছে। সকালে মা বেরিয়ে মেলবক্সে যায়, কাগজ নিয়ে আসে। সোনিয়া গাড়ি নিয়ে শহরে গিয়ে মুদির দোকান সেরে আসে। গোগোল বিলের টাকা মেটাতে যায়, বরফ পড়লে ড্রাইভওয়ে পরিষ্কার করে। প্রতিবারের মতো এবার বড়দিনের কার্ডগুলো সাজিয়ে রাখা হল না। অসীমা খাম উলটে দেখে, কে পাঠিয়েছে, তারপর না খুলেই ফেলে দেয়।

এ-সব ছোট ছোট কাজও কত বড় মনে হয়। মা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোন করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে, বিলে, মর্টগেজের কাগজে নাম পরিবর্তন করার ব্যবস্থা করে। তবে এখন বছরের পর বছর ধরে বাবার নামে যে-সব জাংক মেল আসবে, তার স্রোত মা রুখতে পারবে না। লম্বা, ধূসর বিকেলে গোগোল দৌড়োতে যায়। মাঝে মাঝে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যায়, বাবার ডিপার্টমেন্টের পিছনে গাড়ি পার্ক করে। তারপর ছবির মতো সাজানো ক্যাম্পাসের রাস্তাগুলো দিয়ে দৌড়োয়, যে রাস্তাগুলোয় বাবার গত পঁচিশ বছরের জীবন সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর ধীরে ধীরে তারা উইকএন্ডে কাছাকাছি বন্ধুদের বাড়ি যেতে শুরু করল। যাওয়ার সময় গোগোল গাড়ি চালায়, ফেরার পথে সোনিয়া। অসীমা পিছনের সিটে বসে থাকে। বন্ধুদের বাড়িতে অসীমা অশোকের হার্টঅ্যাটাকের কথা খুলে বলে। "উনি তো পেটব্যথার জন্য হাসপাতালে গিয়েছিলেন," এভাবেই কথা শুরু হয় প্রতিবার। অসীমা সেই দুপুরের খুঁটিনাটি বর্ণনা দেয়, আকাশে কেমন গোলাপি রেখা ছিল, টেবিলে কার্ডের স্তূপ, চায়ের কাপ, এই সব। গোগোল আর সহ্য করতে পারে না। বন্ধুরা বলে, অসীমার কলকাতায় যাওয়া উচিত। ভাই আর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করলে ভাল লাগবে। কিন্তু অসীমার কলকাতায় যাওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই। যে-দেশে তার স্বামী জীবন কাটাচ্ছিল, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে তার মৃত্যু হয়েছে, সে-দেশ থেকে দূরে যেতে চায় না সে। "এখন বুঝি, কেন উনি ক্লিভল্যান্ড গিয়েছিলেন। আমাকে একলা থাকা শেখাচ্ছিলেন," অসীমা বলে। মৃত্যুর পর আরও বেশি করে স্বামীর নাম নিতে তার বাধে।

জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে গোগোল ট্রেনে করে নিউ ইয়র্কে ফিরে গেল। এ বছর নতুন বছরের উৎসবে যোগ দেওয়া হয়নি, এই বছরটা বাবা

দেখতে পেল না। সোনিয়া মায়ের সঙ্গে থেকে গেল। সে ভাবছে বস্টনে বা কেমব্রিজে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করার কথা, যাতে মায়ের কাছাকাছি থাকা যায়। গোগোলকে ট্রেনে তুলে দিতে ওরা স্টেশনে এসেছিল। হিমেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে গোগোলের ছোট হয়ে আসা পরিবার তাকে বিদায় জানাল। ট্রেনের জানালার রঙিন কাচের মধ্য দিয়ে গোগোল মা আর বোনকে দেখতে পেল। মনে পড়ল, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় প্রত্যেকবার মা-বাবা-বোন তাকে তুলে দিতে আসত। তারপর এভাবে ট্রেনে করে চলে যাওয়া অভ্যেস হয়ে গেল, কিন্তু বাবা প্রত্যেকবার স্টেশনে আসত। একইভাবে হাত নাড়ত। গোগোল কাচের উপর আঙুল ঠুকে মা আর সোনিয়াকে বোঝাতে চাইল, সে কোথায়। কিন্তু ওরা বোঝার আগেই ট্রেন স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল।

ট্রেন চলছে তো চলছেই। ভিতরে সবাই দুলছে। প্লেনের প্রপেলারের মতো শব্দ করছে ট্রেনটা। নিচু স্বরে হুইসেল বাজছে। গোগোল বাঁদিকের জানালায় বসেছে। শীতের রোদ সোজা তার মুখে। জানালার উপর একটা কাগজ লাগানো। বিপদে পড়লে তিন ধাপে জানালাটা কীভাবে খোলা যাবে, তা লেখা আছে। বাইরে খোড়ো রঙের জমিতে বরফের আস্তরণ। গাছগুলো বর্শার মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, আগের বছরের কয়েকটা তামাটে পাতা তখনও ঝুলছে। লাইনের পাশে বাড়িগুলোর পিছনদিক দেখা যাচ্ছে, আর বরফঢাকা বাগান। ঘন শীতের মেঘ দিগন্তের ঠিক উপরে ঝুলে আছে। হয়তো সন্ধেবেলায় আরও বরফ পড়বে। গোগোল শুনতে পেল, কামরার কোথাও একটি মেয়ে তার প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলছে, অল্প হাসছেও। জিজ্ঞেস করছে, শহরে পৌঁছে কোথায় ডিনার করবে তারা। বলছে, "আয়্যাম সো বোরড।" গোগোলও তো ডিনারের সময় নিউ ইয়র্কে পৌঁছোবে। ম্যাক্সিন স্টেশনে থাকবে বলেছে। অবশ্য এর আগে ম্যাক্সিন কখনও তাকে ট্রেনে তুলে দিতে বা নিতে আসেনি।

ট্রেনের বাইরের দৃশ্য দ্রুত বদলায়। ছোটখাটো বাড়িঘরের উপর ছায়া ঘন হয়ে আসে। লাইনগুলো যেন অন্তহীন মইয়ের মতো সামনে বিছিয়ে রয়েছে। ওয়েস্টার্লি আর মিস্টিকের মধ্যে লাইনগুলো জমির উতরাইয়ের উপর কৌণিকভাবে বিছানো। মনে হয় গোটা ট্রেনটাই গড়িয়ে পড়বে। যাত্রীরা অবশ্য এ নিয়ে কোনও কথা বলে না। নিউ হ্যাভেনে ডিজেল ইঞ্জিন থেকে ইলেকট্রিক ইঞ্জিন হওয়ার সময় ধাক্কা লাগলে যাত্রীরা অনেক কথা বলেছিল। গোগোলের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তখন। ট্রেনটা বাঁদিকে কাত হয়ে

দক্ষিণমুখো চলেছে নিউ ইয়র্কের দিকে। গোগোলের হঠাৎই বাবার সেই রেলগাড়ি দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ল। যে দুর্ঘটনায় বাবা মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিল, যে দুর্ঘটনা তাকে এই নাম দিয়েছে।

ট্রেনটা আবার সোজা হয়ে গেল। পিঠের নীচের দিকে চলার ছন্দ টের পাচ্ছে সে। কয়েক মাইল ধরে সমুদ্রের পাশ দিয়ে যেতে হবে এবার। হাত বাড়ালেই যেন জল ছোঁয়া যাবে। একটা পাথরের সেতু দেখা গেল, ঘরের মাপের ছোট ছোট দ্বীপ, সমুদ্রের ধারে সাদা রঙের মনোহর বাড়ি। কিছু বাড়ি আবার বাক্সের মতো ছোট। কাঠের পোস্টে বক বা অন্য জলের পাখি। তীরের দিকে ভিড় করে রাখা ছোট নৌকো। বাবার এই দৃশ্য পছন্দ হত নিশ্চয়ই। কতবার বাবা ওদের সবাইকে নিয়ে রবিবার বিকেলে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছে! এক-একসময় এত ঠান্ডা লাগত যে, ওরা গাড়ি থেকে বেরোতেই পারত না। জানালা দিয়ে জল দেখত। সামনের সিটে বসে বাবা আর মা ফ্লাস্ক থেকে চা খেত। গাড়ি গরম রাখার জন্য ইঞ্জিন চালিয়ে রাখা হত। একবার কেপ কডে যাওয়া হয়েছিল। ঘোরানো বিচ ধরে বাবা গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিল, যতদূর যাওয়া যায়। তারপর বাবা আর সে হাঁটতে হাঁটতে মাটির শেষ বিন্দুতে চলে গিয়েছিল, যেখানে ছাইরঙের বড় বড় পাথর মাথা তুলে আছে। মা কয়েকটা পাথর পেরিয়ে আর হাঁটতে পারেনি। ছোট্ট সোনিয়াকে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলছিল, "দূরে যেয়ো না। এমন জায়গায় থাকো যাতে আমি দেখতে পাই।" গোগোলের পা-ব্যথা করছিল। বাবা হাত বাড়িয়ে সাহায্য করেছিল ওকে। একটা পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বাবা। সেই সময়, যখন ওরা ভাবছে এক পাথর থেকে অন্য পাথরে কীভাবে যাবে, সমুদ্রের জল উঠে এসে ঘিরে ফেলেছিল দু'জনকে। তখন সবে শীতের শুরু। পাথরের মধ্যে জমা জলে হাঁস সাঁতার কাটছে। ঢেউ এসে ভেঙে যাচ্ছিল, দু'দিকে জলের স্রোত যাচ্ছিল। "শুনছ? ও খুব ছোট। ওকে নিয়ে অত দূরে যাওয়া ঠিক না," মা চেঁচিয়ে বলছিল। মা-র কথা শুনে গোগোল দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু বাবা বলেছিল, "তুমি কি খুব ছোট? আমার তা মনে হয় না।"

ব্রেকওয়াটারের শেষে ডানদিকে হলুদ শরবন। তারপর বালির ঢিপি। তারও পিছনে মহাসাগর। সে ভেবেছিল, বাবা ফিরে আসবে। কিন্তু ওরা থামল না। বালির উপর দিয়ে এগোতে থাকল। বাবা হাঁটতে হাঁটতে জলের ধার দিয়ে লাইট হাউসের দিকে যাচ্ছিল। পাশে মরচে ধরা নৌকোর কঙ্কাল, বিরাট বড় বড় মাছের কাঁটা আর মাথা, একটা মরা হাঁস যার সাদা বুকে সদ্য

গুলিলাগা রক্তের দাগ। ওরা ছোট সাদা-কালো ছোপ ধরা নুড়ি কুড়িয়েছিল, পকেটে ভরে রেখেছিল। পকেটটা ভারী হয়ে নীচের দিকে নেমে আসছে। বালির উপর বাবার পায়ের ছাপ মনে পড়ল গোগোলের। পায়ে খুঁত থাকার জন্য ডানপায়ের বুড়ো আঙুলটা বাইরে বেরিয়ে থাকত, বাঁদিকেরটা সোজা। সেদিনকার ছায়াগুলো একটু বেশি লম্বা হয়ে পড়ছিল। পিঠের উপর বিকেলের রোদ, বাবার আর গোগোলের ছায়া পরস্পরের দিকে হেলে পড়েছে। একটা ফাটা কাঠের বয়া, ছাতার মতো দেখতে, সেটা দেখার জন্য ওরা একটু দাঁড়াল। তাতে খয়েরি রঙের শ্যাওলা লেগে আছে। শেষ পর্যন্ত লাইটহাউসের কাছে পৌঁছোনো গিয়েছিল। ক্লান্ত গোগোল দেখল, তিনদিকে জল। বন্দরের ভিতর সবুজ, বাইরেটা নীল। গরম লাগছিল, কোট খুলে ফেলতে হল। তারপর বাবা প্রকৃতির ডাকে আড়ালে গেল। হঠাৎ বাবার চিৎকার শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিল গোগোল। তারা ক্যামেরাটা মা-র কাছে রেখে এসেছে। বাবা বলল, "এতদূর এলাম, ছবি তুলব না?" পকেট থেকে নুড়িপাথর বের করে জলে ছুড়ে ফেলছিল। শেষ পর্যন্ত বলল, "তা হলে এই দৃশ্যটা মনে রেখে দিতে হবে।" বন্দরের উলটোদিকে সাদা আর ছাইরঙের ছোট শহর। ওরা ফিরে চলল। প্রথমে চেষ্টা করছিল নতুন পায়ের ছাপ না ফেলতে। আসার সময় যেখানে পা ফেলেছিল, সেখানেই আবার পা ফেলতে হবে। তখন জোরে হাওয়া দিচ্ছে। ওদের থেমে থেমে হাঁটতে হচ্ছিল।

দুই কানের উপর দু'হাত চেপে গোগোলের দিকে ফিরে বাবা জিজ্ঞেস করেছিল, "এই দিনটা তোমার মনে থাকবে তো?"

"কতদিন মনে রাখতে হবে?"

হাওয়ার শব্দের উপর দিয়ে বাবার হাসির শব্দ শুনতে পেয়েছিল গোগোল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে বাবা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, "সারা জীবন মনে রাখার চেষ্টা কোরো।" পাথরের উপর দিয়ে মা আর সোনিয়ার কাছে ফিরতে ফিরতে বাবা বলেছিল, "মনে রেখো, তুমি আর আমি এই রাস্তায় হেঁটে গিয়েছিলাম, যতদূর যাওয়া যায়। এতদূর গিয়েছিলাম, যেখান থেকে আর এগোনোর উপায় নেই।"

আট

বাবা মারা যাওয়ার পর একবছর হয়ে গিয়েছে। গোগোল এখনও নিউ ইয়র্কে থাকে, আমস্টারডাম এভিনিউয়ের সেই অ্যাপার্টমেন্টে। একই অফিসে চাকরি করে। জীবনে বাবার অনুপস্থিতি ছাড়া একটিই পরিবর্তন ঘটেছে। ম্যাক্সিনের না থাকা। প্রথম-প্রথম ম্যাক্সিন ধৈর্য ধরেছিল। গোগোলকে ধাতস্থ হতে সময় দিয়েছিল। অফিসের পর জেরাল্ড আর লিডিয়ার বাড়িতে ফিরে যেত গোগোল, সেই দুনিয়ায় যেখানে কিছুই বদলায়নি, সবই আগের মতো। ডিনার টেবিলে গোগোলের নীরবতা কিছুদিন মেনে নিয়েছিল ম্যাক্সিন। মেনে নিয়েছিল যৌনমিলনে তার অনাগ্রহ, রোজ সন্ধেয় মা আর সোনিয়ার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন, উইকএন্ডে প্রেয়সীকে একা রেখে পেম্বারটন রোডে ফিরে যাওয়া। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে চায়নি একটা কথা। সে গোগোলের প্রেমিকা হওয়া সত্ত্বেও কেন তাকে না নিয়ে গোগোলরা সেই গ্রীষ্মে সকলের সঙ্গে দেখা করতে আর অশোকের অস্থিভস্ম গঙ্গায় নিক্ষেপ করতে কলকাতায় যাবে। সেই থেকে তর্কাতর্কি শুরু। একদিন ম্যাক্সিন বলেই ফেলল, মা আর সোনিয়াকে তার হিংসে হয়। গোগোলের এ কথাটা এতই অবাস্তব ঠেকেছিল যে, সে কোনও উত্তর দেয়নি। সুতরাং বাবার মৃত্যুর কয়েকমাস পরে গোগোল ম্যাক্সিনের জীবন থেকে বেরিয়ে এল। সম্প্রতি জেরাল্ড আর লিডিয়ার সঙ্গে একটা আর্ট গ্যালারিতে দেখা হয়েছিল। শোনা গেল, ম্যাক্সিনের সঙ্গে অন্য একটি লোকের এনগেজমেন্ট হয়েছে।

উইকএন্ডে সে ট্রেনে করে ম্যাসাচুসেট্স চলে যায়। সেই বাড়িতে, যেখানে তার বাবার শ্রাদ্ধের সময় বাঁধানো ছবিটা দোতলার ঘরে ঝুলছে। বাবার বাৎসরিকের দিন আর জন্মদিনে তিনজনে ছবিটার সামনে দাঁড়ায়, গোলাপের পাপড়ির মালা পরায় আর কাচের উপর দিয়ে বাবার কপালে চন্দন পরিয়ে দেয়। গোগোল বাড়িতে ফেরে সবচেয়ে বেশি ওই ছবিটার টানে। একদিন বাথরুম থেকে বেরিয়ে ফোটোয় বাবার হাসিমুখের দিকে নজর পড়তে

গোগোল বুঝল, এই ফোটোটাই তার কাছে বাবার সমাধির মতো। ঘুরে ঘুরে এখানে ফিরতেই হবে।

বাড়িটাও এখন আর তেমন নেই। বেশিরভাগ সময় সোনিয়া রান্না করে। সোনিয়া এখন ওখানেই আছে। ছোটবেলায় যে ঘরে থাকত, সেই ঘরেই। সপ্তাহে চারদিন সে ভোর সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়ে বাস আর ট্রেনে করে বস্টন শহরে যায়। সে এখন প্যারালিগাল হিসেবে কাজ করছে আর কাছাকাছি কোনও আইন কলেজে ভরতি হওয়ার চেষ্টা করছে। সোনিয়াই এখন মাকে উইকএন্ডের পার্টিগুলোয় আর শনিবার সকালে সবজি বাজারে নিয়ে যায়। মা রোগা হয়ে গিয়েছে। চুলেও পাক ধরেছে। মায়ের খালি সিঁথি আর ফাঁকা কবজি দেখলে গোগোলের খুব কষ্ট হয়। সোনিয়া বলেছে, মা কীভাবে একা-একা সন্ধেগুলো কাটায়। একা বিছানায় বসে, ঘুমহীন, টেলিভিশনের সাউন্ড অফ করে শুধু ছবি দেখে। এক শনিবার সে প্রস্তাব দিল, সবাই মিলে বাবার প্রিয় কোনও সমুদ্রের ধারে যাওয়া যাক। মা প্রথমে খুশি হয়ে রাজিও হয়েছিল। কিন্তু সেখানে পৌঁছে প্রচণ্ড হাওয়ার মধ্যে গাড়ি থেকে বেরোতে মা বলল, হাঁটবে না। গাড়িতেই থাকবে।

গোগোলের রেজিস্ট্রেশনের পরীক্ষা আসছে। দু'দিনের পরীক্ষা। পাস করলে সে লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্কিটেক্ট হতে পারবে। নিজের নামে ডিজ়াইন করতে পারবে, নকশার উপর স্ট্যাম্প মেরে সই করতেও পারবে। সে এখন বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে বা কলম্বিয়ায় লাইব্রেরিতে চলে যায়। একটা রিভিউ ক্লাসেও ভরতি হয়েছে। সপ্তাহে দু'দিন অফিসের পর সেখানে যেতে হয়। আবার অলসভাবে ক্লাসে বসে থাকতে, শিক্ষকের কথা শুনতে ভাল লাগে। কেউ তো বলে দিচ্ছে কী করতে হবে। ছাত্রাবস্থার কথা মনে পড়ে যায়। ক্লাসটা ছোট, শিগগিরই ক্লাসের কয়েকজন ড্রিংকসের জন্য বেরোতে শুরু করল। গোগোলকে ওরা জিজ্ঞেস করত, কিন্তু সে সব সময় না বলে। একদিন ক্লাসঘর থেকে বেরোনোর সময় এক মহিলা তাকে বলল, "তোমার আজকের অজুহাত কী?" সত্যিই কোনও অজুহাত ছিল না, তাই সে সঙ্গে চলল। মহিলার নাম ব্রিজেট। বারে সে গোগোলের পাশেই বসল। বেশ আকর্ষক চেহারা, খয়েরি চুল ছোট করে কাটা। এত ছোট যে বেশিরভাগ মেয়েকে মোটেই মানাবে না। খুব আস্তে, ভেবে ভেবে কথা বলে। ব্রিজেট নিউ অরলিয়্যান্সের মেয়ে। একটা ছোট ফার্মে চাকরি করে। কিছুক্ষণ নিজেদের প্রোজেক্ট নিয়ে কথা বলল তারা। পছন্দের আর্কিটেক্টদের নিয়েও

কথা বলল: গ্রোপিয়াস, ভ্যান ডার রো, সারিয়েন। ব্রিজেট গোগোলেরই বয়সি, কিন্তু বিবাহিত। ওর স্বামী বস্টনের কলেজে প্রোফেসর, শুধু শনি-রবিবার দেখা হয়। গোগোল নিজের বাবা-মার কথা ভাবল। বাবার জীবনের শেষকটা মাস দু'জনে দু'শহরে কাটিয়েছে। সে বলল, "এভাবে থাকা নিশ্চয়ই খুব কঠিন?"

ব্রিজেট বলল, "হতে পারে, কিন্তু মেনে নিতে হয়।" তার স্বামী নাকি ব্রুকলিনে বিরাট বড় একটা ভিক্টোরিয়ান বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। ভাড়া কিন্তু নিউ ইয়র্কের এক বেডরুমের ফ্ল্যাটের চেয়ে কম। ব্রিজেটের স্বামী ব্রুকলিনের সেই বাড়িতে নেমপ্লেটে ব্রিজেটের নাম লিখে রেখেছে, অ্যানসারিং মেশিনে ব্রিজেটের গলা, আলমারিতে ব্রিজেটের পোশাক, এমনকী, ব্রিজেটের একটা লিপস্টিকও সেখানে রয়েছে। তার স্বামী নাকি এ-সব দেখলে খুশি হয়। কিন্তু ব্রিজেটের মনে হয় এগুলো শুধু দূরে থাকার চিহ্ন।

সেই রাতে ওরা ট্যাক্সি নিয়ে গোগোলের অ্যাপার্টমেন্টে গেল। ব্রিজেট বাথরুমে ঢুকল, যখন বেরোল তার হাতে বিয়ের আংটি নেই। গোগোলের উপোসি শরীরে বান ডাকল সেদিন, যদিও সে মনে মনে জানে ব্রিজেটের সঙ্গে তেমন কোনও সম্পর্ক হবে না। যেদিন সে আর্কিটেকচারের গাইডবই নিয়ে রুজভেল্ট আইল্যান্ডের দিকে গেল, ব্রিজেটকে সঙ্গে নেওয়ার কথা মনেই পড়ল না। শুধু সপ্তাহে দু'দিন, রিভিউ ক্লাস যেদিন থাকে, সে ব্রিজেটের কথা ভাবে। পরস্পরের ফোন নম্বর তাদের কাছে নেই। ব্রিজেট কোথায় থাকে, তা জানে না গোগোল। ওরা সবসময় গোগোলের অ্যাপার্টমেন্টেই যায় কিন্তু ব্রিজেট কখনও রাত কাটায় না। গোগোলের এই সীমাবদ্ধতা পছন্দ। এমন সম্পর্কে সে আগে কখনও জড়িয়ে পড়েনি, যেখানে দাবিদাওয়া এত কম। গোগোল ব্রিজেটের স্বামীর নাম জানে না, জানতেও চায় না। একদিন সে যখন মা আর সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করতে ম্যাসাচুসেট্‌সে যাচ্ছিল, হঠাৎই মনে হল, উলটোদিকের ট্রেনে ব্রিজেটের স্বামী নিউ ইয়র্ক যাচ্ছে কি না! ব্রিজেটের স্বামীর একলার ভাড়াবাড়িটা কল্পনা করল সে। মেলবক্সে স্বৈরিণী স্ত্রীর নাম লেখা, খাটের পাশে তার লিপস্টিক। সেই মুহূর্তে অপরাধবোধে মন ভারী হয়ে উঠল গোগোলের।

মাঝে মাঝে মা জিজ্ঞেস করে গোগোলের নতুন গার্লফ্রেন্ড হল কি না। আগে মা এই একই প্রশ্ন করত ভয়ে-ভয়ে, কিন্তু এখন আগ্রহ নিয়ে করে,

বোঝাই যায় গোগোলের একাকিত্বে মা চিন্তায় আছে। এমনকী একবার এও জিজ্ঞেস করেছে যে, ম্যাক্সিনের সঙ্গে আবার মিল হতে পারে কি না। গোগোল মনে করিয়ে দিয়েছিল যে, ম্যাক্সিনকে মায়ের পছন্দ ছিল না। তবে মা বলল, সেটা কথা নয়, কথা হচ্ছে গোগোল নিজের জীবন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কি না। এখন এ-সব কথার জবাব গোগোল শান্ত হয়ে দেয়। আগের মতো নাক গলানোর অভিযোগ করে না। একবার সে বলেছিল, তার বয়স তিরিশও হয়নি। উত্তরে মা বলে, তিরিশ বয়স হওয়ার আগেই নাকি মায়ের বিয়ের দশ বছর পূর্ণ হয়েছিল। গোগোল বোঝে, বাবার মৃত্যুর ফলে মায়ের কতকগুলো আশা-আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হয়েছে, যেগুলো আগে ছিল না। মা চায় ছেলে এবার থিতু হোক। এখনও বিয়ে করেনি বলে তার নিজের কোনও হতাশা নেই, তবে মায়ের তা সহ্য হয় না। সময় পেলেই মা তাকে খবর দেয়, ম্যাসাচুসেটসে ছোটবেলার চেনা বাঙালি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অনেকেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বিয়ে হয়ে যাচ্ছে দেশের তুতো ভাইবোনেদেরও। এমনকী মায়ের প্রজন্মের অনেকের নাতি-নাতনিও জন্মাচ্ছে।

একদিন ফোনে মা জিজ্ঞেস করল, গোগোল একজনকে ফোন করতে রাজি আছে কি না। যাকে ফোন করতে বলা, সেই মেয়েটিকে নাকি গোগোল ছোটবেলায় চিনত। তার নাম মৌসুমি মজুমদার। গোগোলের মেয়েটিকে হালকাভাবে মনে আছে। বাবা-মায়ের বন্ধুর মেয়ে, মাঝে কিছুদিনের জন্য ম্যাসাচুসেট্‌সে থাকত বটে। পরে ওরা নিউ জার্সিতে চলে গিয়েছিল। মেয়েটি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে কথা বলত। পার্টিতে এসে বই মুখে করে বসে থাকত। গোগোলের এটুকুই মনে আছে, মেয়েটির প্রতি কোনও আকর্ষণও নেই, বিকর্ষণও নেই। মা বলল, মেয়েটি তার থেকে একবছরের ছোট। একটা ছোট ভাইও আছে। ওর বাবা নাকি নামকরা কেমিস্ট, তাঁর নামে পেটেন্টও আছে। গোগোল নাকি ওর মাকে রিনামাসি বলে ডাকত, ওর বাবাকে ডাকত সুবীরমেসো। বাবার কাজের সময় তাঁরা নাকি নিউ জার্সি থেকে এসেছিলেন, কিন্তু গোগোলের কাউকে মনে পড়ে না। মৌসুমি নাকি এখন নিউ ইয়র্কে থাকে, নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট। বছরখানেক আগে ওর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, তাতে ওদের তিনজনের নেমন্তন্নও ছিল, কিন্তু আমেরিকান হবু বর শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। তখন হোটেল বুকিং হয়ে গিয়েছে, নেমন্তন্নর চিঠি পাঠানো হয়ে গিয়েছে, উপহারও কেনা হয়ে গিয়েছে। মৌসুমির বাবা-মা মেয়েকে নিয়ে চিন্তিত, ওর নাকি একজন বন্ধু

দরকার। গোগোল কি একবার ওকে ফোন করতে পারে?

মা যখন বলল, পেন নিয়ে নম্বরটা লিখে নিতে, তখন গোগোল ভাঁওতা দিল। নম্বরটা শুনলও না, মনেও রাখল না। মৌসুমিকে ফোন করার কোনও আগ্রহ তার নেই। তার উপর গোগোলের পরীক্ষা সামনে। মাকে খুশি করতে সে চায় বটে, কিন্তু মা কারও সঙ্গে তার মিল করিয়ে দেবে, তা হবে না। পরের সপ্তাহে উইকএন্ডে বাড়ি গেলে মা আবার কথাটা তুলল। এবার দু'জনে একই ঘরে বসে। তাই গোগোলকে নম্বরটা লিখতেই হল। কিন্তু ফোন করবার কোনও ইচ্ছে ছিল না তার। কিন্তু মা গোগোলকে ছাড়ল না। বারবার মনে করিয়ে দিতে লাগল। বাবার শ্রাদ্ধে ওঁরা এসেছিলেন, গোগোল কি এটুকু করতে পারবে না? একটু কথা বলা, এককাপ চা। এই সময়টুকুও কি গোগোলের নেই?

* * *

ইস্ট ভিলেজের একটা বারে ওদের দেখা হল। জায়গাটা মৌসুমিরই বেছে নেওয়া। ছোট্ট, ঘুপচি, অন্ধকারমতো একটা চৌকো ঘর, দেওয়ালের ধারে তিনটে মোটে বুথ। গোগোল ঢুকে দেখল মৌসুমি এসে গিয়েছে। বারে বসে পেপারব্যাক বই পড়ছে। গোগোল ঢুকতে মৌসুমি মাথা তুলে তাকাল। গোগোল দেরিতে এসেছে, মৌসুমি নিশ্চয়ই ওর জন্য অপেক্ষা করছে, কিন্তু গোগোলের মনে হল যেন মৌসুমির বই পড়ায় বাধা পড়ল। মৌসুমির মুখ গোল নয়, মেদহীন। সরল ভুরু, বেড়ালের মতো ছিপছিপে শরীর, চোখের উপরটা ভারী। মোটা করে আইলাইনার লাগিয়েছে মৌসুমি, ছয়ের দশকের অভিনেত্রীদের মতো। মাঝখানে সিঁথি করে কায়দার খোঁপা বেঁধেছে সে, চোখে সরু টরটয়েজ়শেল ফ্রেমের চশমা। উলের তৈরি ছাইরঙের স্কার্ট আর পাতলা নীল সোয়েটার ছিপছিপে শরীরটায় এমনভাবে লেগে আছে, যাতে কল্পনা তীব্র হয়ে ওঠে। কালো টাইট্‌সে পা ঢাকা। যে বারস্টুলে মৌসুমি বসে আছে, তার পাশে মেঝের উপর বেশ কয়েকটা সাদা শপিং ব্যাগ। ফোনে গোগোল মা'কে জিজ্ঞেস করেনি মৌসুমিকে কেমন দেখতে, ভেবেছিল দেখলেই চিনতে পারবে, কিন্তু এখন আর ততটা নিশ্চিত লাগছে না।

সে এগিয়ে গিয়ে বলল, "মৌসুমি?"

"আরে," বলে মৌসুমি বই বন্ধ করল। গোগোলের দু'গালে হালকাভাবে

চুমু খেল। বইটার মলাট সাদা, তাতে ফরাসিতে নাম লেখা। যে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টের কথা গোগোলের স্মৃতিতে ছিল, তা এখন আর নেই। মৌসুমির উচ্চারণ এখন গোগোলের মতোই পুরোপুরি আমেরিকান। তার ভারী, দানাদার গলা শুনে ফোনেও গোগোল আশ্চর্য হয়েছিল। সে অলিভসহ মার্টিনি খাচ্ছে। টেবিলের উপর নীল ডানহিলের প্যাকেট রাখা।

পাশের স্টুলে বসে পড়ে একটা সিঙ্গল মল্ট চাইল গোগোল, বলল, "আমি নিখিল।"

"হ্যাঁ।"

"গোগোল নই।"

"হ্যাঁ।"

মৌসুমি ফোনে তাকে নিখিল নামে চিনতে না পারায় গোগোল বিরক্ত হয়েছিল। আসলে, এই প্রথম সে এমন একজন মহিলার সঙ্গে বেরোচ্ছে, যে তাকে পুরনো নামে চেনে। ফোনে দু'জনেরই কথাবার্তা ছিল একটু সতর্ক, সন্দেহপ্রবণ। বেশি কথা হয়নি, দু'জনেই অপ্রতিভ থাকলে যেমন হয়। গোগোল নাম পরিবর্তনের ব্যাপারটা বলে প্রশ্ন করেছিল, "আমি ফোন করায় তুমি কিছু মনে করোনি তো?" রবিবার বিকেলে একটু দেখা করতে পারবে কি না জিজ্ঞেস করলে মৌসুমি বলেছিল, "একবার ডায়েরিটা দেখে বলছি।" তারপর ফোনের ভিতর দিয়ে গোগোল খালি কাঠের মেঝেতে দূরে চলে যাওয়া পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল।

এখন মৌসুমি ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে হেসে বলল, "তুমি আমার চেয়ে বড় বলে মা আমাকে গোগোলদাদা ডাকতে শিখিয়েছিল।"

গোগোল লক্ষ করল, বারটেন্ডার ওদের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। হয়তো ভাবছে, এদের দৌড় কতটা? মৌসুমির সেন্টে ভিজে শ্যাওলার তীব্র গন্ধ। মনটা উথালপাথাল করে। এই ছোট্ট ঘর, নিস্তব্ধতা আর কাছাকাছি থাকা, সব মিলিয়ে গোগোল তখন অস্বস্তিতে। বলল, "ও-কথা থাক।"

মৌসুমি গ্লাস তুলে হাসল, "আউ উইল ড্রিংক টু দ্যাট।" তারপর যোগ করল, "আমি অবশ্য কখনও ডাকিনি। আচ্ছা, আমরা কি সোজাসুজি কথা বলেছি কখনও? মনে তো পড়ে না।"

"আমারও মনে পড়ে না।"

"তাই আমার আর তোমাকে দাদা বলা হয়নি," মৌসুমি বলল। খুবই

সাধারণভাবে ও কথা বলছে, কিন্তু তাও গোগোল ওর চোখের দিকে তাকাতে পারছে না।

"আমি এভাবে মায়ের ঠিক করে দেওয়া ব্লাইন্ড ডেটেও আগে কখনও আসিনি," কিছুক্ষণ বিরতির পর মৌসুমি বলল।

"এটা কিন্তু ঠিক ব্লাইন্ড ডেট নয়।"

"নয়?"

"আমরা তো পরস্পরকে চিনি।"

মৌসুমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে মৃদু হাসল, যেন ব্যাপারটা নিয়ে সে নিশ্চিত নয়। ওর দাঁতগুলো একটু বাঁকা, সেটিং ঠিক নেই। বলল, "হয়তো তা-ই। হ্যাঁ, তা-ই হবে।"

বারটেন্ডার দেওয়ালের সি ডি প্লেয়ারে নতুন সিডি চড়াচ্ছে। ওরা দু'জন একসঙ্গে সেদিকে তাকিয়ে রইল। জাজ়। এই ছোট্ট বিরতিটা গোগোলের দরকার ছিল।

তারপর মৌসুমি বলল, "তোমার বাবার কথা শুনলাম। দুঃখিত।"

ওর গলায় সত্যি সহানুভূতির সুর। তবে বাবাকে কি মনে আছে ওর? গোগোলের ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে, কিন্তু শুধুই মাথা নাড়ল সে, আর কিছু না ভেবে পেয়ে বলল, "ধন্যবাদ।"

"তোমার মা কেমন আছেন?"

"ভাল আছেন বলেই তো মনে হয়।"

"একা থাকতে অসুবিধা হচ্ছে না তো?"

"মা-র সঙ্গে এখন সোনিয়া থাকছে।"

"ভাল। তোমার চিন্তা তাতে কমে।"

মৌসুমি ডানহিলের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল। নতুন প্যাকেট। রাংতাটা ছিঁড়ে গোগোলের দিকে বাড়িয়ে দিল, তারপর নিজে বারের অ্যাশট্রের কাছে পড়ে থাকা দেশলাই দিয়ে সিগারেট ধরাল।

"আমি যে-বাড়িটায় বেড়াতে যেতাম, তোমরা কি এখনও সেখানেই থাকো?" জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ।"

"আমার বাড়িটা মনে আছে।"

"আছে?"

"বাড়িটার দিকে মুখ করে দাঁড়ালে ড্রাইভওয়ে ডানদিকে পড়বে। সামনের

ঘাসজমির মধ্যে দিয়ে পাথরের পথ ছিল।"

ওর নিখুঁত স্মৃতি গোগোলকে অবাক করে, খুশিও। "দারুণ তো। মানতে হবে।"

"আরও একটা জিনিস আমার মনে আছে। মোটা খয়েরি-সোনালি কার্পেট পাতা একটা ঘরে আমরা প্রচুর টিভি দেখতাম।"

গোগোল নিশ্বাস ফেলে বলে, "ও-ঘরটা এখনও তেমনই আছে।"

মৌসুমি বাবার কাজে আসতে পারেনি, ও সে-সময় প্যারিসে ছিল। স্নাতক হওয়ার পর ও সেখানেই ছিল। এখন নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি সাহিত্য নিয়ে পি এইচ ডি করছে। এখানে প্রায় বছর দুয়েক আছে সে। গতবছর গ্রীষ্মে সে দু'মাস একটা বড় হোটেলের বিজনেস অফিসে কাজ করেছে। কাজ বলতে হোটেলের অতিথিরা চলে যাওয়ার পর তাঁদের দিয়ে যাওয়া মতামতের কপি করা আর ঠিক লোককে পৌঁছে দেওয়া। এই সাধারণ কাজে সারাদিন কেটে যেত। মৌসুমির অবাক লেগেছে, লোকে সমীক্ষায় এত সময় ব্যয় করে? অতিথিরাও তেমন। বালিশ শক্ত না নরম, সিংকের পাশে সাজার জিনিস রাখার জায়গা আছে কি না, বা বিছানার চাদর থেকে সুতো ঝুলে আছে কি না, এই নিয়ে তারা প্রচুর কাগজ খরচ করে। এদের মধ্যে অনেকেই নিজের পকেট থেকে হোটেলভাড়া দেয়ওনি। অফিসের কাজে বা সেমিনারে এসেছে, সব খরচই কোম্পানির। একজন তো এমনও লিখেছিল যে, ডেস্কের উপর আটকানো একটা আর্কিটেকচারাল প্রিন্টের উপরের কাচে ধুলো লেগে আছে। গল্পটা শুনে মজা লাগল গোগোলের।

"সেটা হয়তো আমি।"

মৌসুমি হাসল।

"তুমি প্যারিস থেকে নিউ ইয়র্কে কেন এলে? ফরাসি সাহিত্যে নিয়ে পড়তে হলে ফ্রান্সই তো সেরা জায়গা," গোগোল জিজ্ঞস করল।

"এলাম প্রেমের টানে। আমার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার ঘটনা তো নিশ্চয়ই শুনেছ।"

মৌসুমির খোলামেলা কথা গোগোলকে আশ্চর্য করে। সে মিথ্যে করে বলে,"না, জানি না তো।"

"জানা উচিত ছিল। ইস্টকোস্টের বাসিন্দা সব বাঙালিই ঘটনাটা জানে।"

সাধারণভাবেই কথাগুলো বলে মৌসুমি, কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে তিক্ততা চাপা থাকে না, "আমি কিন্তু নিশ্চিত তোমাকে আর তোমার পরিবারকে নেমন্তন্ন

করা হয়েছিল।”

গোগোল প্রসঙ্গ পালটানোর চেষ্টা করল, “আচ্ছা, কবে তোমার সঙ্গে শেষ আমার দেখা হয়েছিল?”

“আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু যতদূর মনে হয়, তোমার হাইস্কুল গ্র্যাজুয়েশনের পার্টিতে।”

গোগোলের স্মৃতিতে একটা উজ্জ্বল আলোভরা হলঘরের ছবি ভেসে উঠল। একটা চার্চের বেসমেন্ট সেটা। বেশি বড় পার্টির জন্য বাবা-মা সেটা ভাড়া করতেন। রবিবারের বাইবেল ক্লাস হত সেখানে। দেওয়ালে, থামে জিশুর শিক্ষা ও জীবন সম্পর্কে লেখা ও ছবি। মনে পড়ল, বাবা আর সে লম্বা লম্বা কাঠের টেবিল পেতেছিল সেখানে। দেওয়ালে চকবোর্ড লাগানো হয়েছিল। সোনিয়া একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে বোর্ডে লিখেছিল ‘কনগ্র্যাচুলেশনস’।

“তুমি সেখানে ছিলে?”

“ছিলাম। সেটা আমাদের নিউ জার্সি চলে যাওয়ার ঠিক আগে। তুমি তোমার হাই স্কুলের মার্কিন বন্ধুদের সঙ্গে বসে ছিলে। তোমার কয়েকজন টিচারও সেখানে ছিলেন। তোমাকে অতসব ব্যবস্থার মধ্যে বেশ বিব্রত দেখাচ্ছিল।”

গোগোল মাথা নাড়ল, “আমার কিন্তু তোমাকে মনে নেই। আমি কি তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলাম?”

“তুমি আমাকে পাত্তাই দাওনি। কিন্তু তাতে কী? আমি নিশ্চয়ই বই নিয়ে ওখানে গিয়েছিলাম,” মৌসুমি হাসল।

আবার ড্রিংকস নিল দুজনে। বার ততক্ষণে ভরে উঠেছে। ওদের চারপাশে অনেক লোক বসে। একটা বড় দল ঢুকল। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে অর্ডার দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। ঢোকার সময় ফাঁকা ঘর দেখে গোগোলের অস্বস্তি হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল ওদের কথা আর আবেগ সকলে দেখতে পাবে। কিন্তু এই ভিড় আরও অসহ্য।

“বড্ড ভিড় হচ্ছে”, সে বলল।

“রবিবারে এত ভিড় তো হয় না। আমরা কি বেরিয়ে যাব?”

গোগোল ভেবে দেখল। বলল, “ তা বেরোনো যায়।”

বিল মিটিয়ে দু’জনে অক্টোবরের শীতল সন্ধ্যায় পা রাখল। ঘড়ি দেখল গোগোল, এখনও একঘণ্টা হয়নি।

“তুমি কোনদিকে যাবে?”

মৌসুমির প্রশ্নে গোগোল বুঝতে পারল আজকের দেখাশুনো এখানেই শেষ। গোগোল অবশ্য মৌসুমির সঙ্গে ডিনার করতে আসেনি। সে ভেবেছিল, দেখা করে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাবে। পড়াশোনা করবে। রাতের জন্য অর্ডার দিয়ে চিনে খাবার আনিয়ে নিলেই হল। কিন্তু হঠাৎ দেখল, সে বলছে, কিছু খেলে হয়। জিজ্ঞেস করছে মৌসুমি কি সঙ্গে যেতে রাজি?

“যেতে আমার ভালই লাগবে,” মৌসুমি বলল।

যাওয়ার মতো কোনও জায়গার কথা তখনই মাথায় না আসায় ওরা ঠিক করল, একটু হাঁটবে। গোগোল শপিং ব্যাগগুলো নিতে চাইলে মৌসুমি আপত্তি করল না। ব্যাগগুলো অবশ্য ভারী নয়। একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁর সামনে পৌঁছোল দু’জনে। জায়গাটার চেহারা দেখে মনে হয় সদ্য খুলেছে। জানালার কাচে একটা হাতে লেখা মেনুকার্ড সাঁটা। তা ছাড়া কয়েকদিন আগে টাইম্‌স-এ বেরোনো একটা রিভিউ। জানালার কাচে মৌসুমির ছায়া গোগোলের নজর কেড়ে নিল। ছায়াটা যেন আসল মেয়েটার থেকেও বেশি আকর্ষক।

“ঢুকব নাকি?” দরজার হাতলে হাত রেখে সে জিজ্ঞেস করল।

ভিতরে দেওয়ালের রং লাল। পুরনো ওয়াইনের পোস্টার, রাস্তার ম্যাপ, আর প্যারিসের ফোটো দিয়ে সাজানো।

“জায়গাটা বোকা-বোকা ঠেকছে তো?” মৌসুমিকে দেওয়ালের দিকে তাকাতে দেখে জিজ্ঞেস করল সে।

“না তো। আসলে জায়গাটা খাঁটি বলেই মনে হচ্ছে।”

ওরা বসলে মৌসুমি এক গ্লাস শ্যাম্পেন অর্ডার দিল। তারপর ওয়াইনের লিস্টটা মন দিয়ে দেখতে লাগল। গোগোল সিঙ্গল মল্ট হুইস্কি চাইতে জানা গেল শুধু বিয়ার আর ওয়াইন পাওয়া যায়। মৌসুমি জিজ্ঞেস করল এক বোতল ওয়াইন নেওয়া যায় কি না। গোগোল বলল, “তুমি অর্ডার দাও।”

মৌসুমি একটা স্যালাড চাইল, একটা বুইয়াবেস আর সাঁস্যার ওয়াইনের একটা বোতলও। গোগোল অর্ডার দিল কাসুলে। ওয়েটার নিজে ফ্রেঞ্চ কিন্তু মৌসুমি তার সঙ্গে ফ্রেঞ্চে কথা বলল না। কিন্তু অর্ডার দেওয়ার সময় তার ফরাসি উচ্চারণ শুনে পরিষ্কার বোঝা যায়, সে মাতৃভাষার মতো ফরাসি জানে। গোগোল প্রভাবিত। ইংরেজি আর বাংলা ছাড়া সে কোনও ভাষা শেখার চেষ্টা করেনি। তাড়াতাড়ি সময় কেটে গেল। গোগোল নিজের

প্রোজেক্ট আর কাজের কথা বলল, আগামী পরীক্ষার কথা আলোচনা করল। ব্রেড ডিশের উপর একে অন্যের খাবার তুলে নিয়ে চাখল, মন্তব্য করল। একটা 'ক্রেম ব্রুলে' ভাগ করে খেল ওরা। শেষে খাওয়া হল এসপ্রেসো কফি।

বিল এলে মৌসুমি নিজের ভাগের দাম দিতে চাইল (বারে ওরা ভাগ করে দাম মিটিয়েছিল) কিন্তু এবারে গোগোল তাকে দাম দিতে দিল না। তারপর হাঁটতে-হাঁটতে পৌঁছে গেল মৌসুমির অ্যাপার্টমেন্টে। বাড়িটা পুরনো কিন্তু সুন্দর, পাড়াটা ভাল। প্রথমে যে-বারে ওরা গিয়েছিল, ঠিক তারই কাছে। জমির ঢালে মেটে রঙের বাড়ি, উজ্জ্বল সবুজ কার্নিশ। মৌসুমি ডিনারের জন্য ধন্যবাদ দিল, দু'গালে চুমু খেল, তারপর ব্যাগের মধ্যে চাবি খুঁজতে শুরু করল।

গোগোল শপিং ব্যাগগুলো এগিয়ে দিয়ে বলল, "এগুলো নিতে ভুলো না।" মৌসুমি ওগুলো নিয়ে কবজিতে ঝুলিয়ে নিল। ব্যাগগুলো হাত থেকে চলে যাওয়া মাত্র গোগোল অস্বস্তিতে পড়ে গেল, হাত নিয়ে কী করবে, ভেবে না পেলে যেমন হয়। অ্যালকোহল পেটে গিয়ে খেলা দেখাতে শুরু করেছে। সে বলল, "তাহলে আমরা কি বাবা-মায়েদের খুশি করার জন্য আবার দেখা করব?"

মৌসুমি মন দিয়ে গোগোলের মুখটা দেখল। বলল, "হয়তো।" তার নজর ধীরে-ধীরে পাশ দিয়ে যাওয়া একটা গাড়ির দিকে সরে গেল। দু'জনের গায়ে হেডলাইটের আলো পড়ল। মৌসুমির চোখ আবার গোগোলের দিকে ফিরে এল, সে হাসল, বলল, "ফোন কোরো।"

মৌসুমি ঢাল বেয়ে বাড়ির দিকে চলল, গোগোল তাকিয়ে রইল যতক্ষণ তাকে দেখা যায়। মনে হচ্ছিল জুতোর হিল পিছলে যাবে, ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়বে মেয়েটা, কিন্তু তেমন কিছুই হল না। কাচের দরজায় পৌঁছে পিছন ফিরে হাত নাড়ল মৌসুমি, তারপর গোগোল হাত নাড়ার আগেই ঢুকে গেল। গোগোল দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। একজন অন্য ভাড়াটে বেরিয়ে ট্র্যাশ ক্যানে কিছু ফেলল। গোগোল উপরের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, কোন জানলাটা মৌসুমির। নিশ্চয়ই এখন আলো জ্বলে উঠবে সেটায়।

গোগোল মোটেই ভাবেনি এই সময়টুকু কাটিয়ে এমনভাবে মন ভরে উঠবে, এই রকম আকর্ষণ বোধ করবে মেয়েটির প্রতি। হঠাৎই তার মনে হল, ছোটবেলায় যখন দেখা হয়েছিল, তখন ওদের দু'জনের সম্পর্ক কী ছিল? ওদের বাবা-মায়েরা বন্ধু, ওরা কিন্তু পরস্পরের বন্ধু ছিল না। আজকের আগে

ওদের দু'জনের সম্পর্ক ছিল পুরোপুরি কৃত্রিম, অন্য লোকের চাপিয়ে দেওয়া। ঠিক যেমন কলকাতার তুতো ভাই-বোনদের সঙ্গে সম্পর্ক। অবশ্য এখানে সেই রক্তের সম্পর্কটাও নেই। আজকের আগে ওরা পরস্পরকে পরিবারের বাইরে আলাদা, সম্পূর্ণ মানুষ বলেই ভাবেনি কখনও। গোগোল বুঝতে পারল, এই মেয়েটিকে চিনেও না চেনাটাই তাকে আকর্ষণ করছে। সাবওয়ের দিকে হাঁটতে হাঁটতে গোগোল ভাবতে লাগল, কবে আবার ওর সঙ্গে দেখা হবে। মাঝরাস্তায় মত বদলে একটা ট্যাক্সি ধরল সে। হয়তো খরচটা বেশিই হয়ে গেল, কারণ ট্যাক্সি নেওয়ার কোনও কারণ নেই। না বৃষ্টি পড়ছে, না বেশি শীত, না দেরি হয়েছে, না বাড়িতে কেউ তার জন্য অপেক্ষা করে বসে। কিন্তু তার এখন ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি করতে ইচ্ছে করছে না। সে একা থাকতে চায়, সদ্য কাটানো বিকেলটা নিয়ে ভাবতে চায়। ট্যাক্সির ড্রাইভার বাংলাদেশি। ড্রাইভার ও সওয়ারির মাঝখানে কাচের উপর আটকানো নামের কাগজটা বলছে, চালকের নাম মুস্তাফা সইদ। সে চালাতে চালাতে নিজের সেলফোনে বাংলায় কথা বলছে। রাস্তার ট্র্যাফিক, খারাপ সওয়ারি, এই-সব নিয়ে কাউকে নালিশ জানাচ্ছে। ট্যাক্সি এইট্‌থ অ্যাভিনিউয়ের দোকান আর রেস্তোরাঁর পাশ দিয়ে শহরের কেন্দ্রের দিকে চলেছে। গোগোলের বাবা বা মা হলে ড্রাইভারের সঙ্গে বাংলায় কথা জুড়ে দিত। জিজ্ঞেস করত, তার বাড়ি বাংলাদেশের কোন জেলায়, কতদিন হল এদেশে এসেছে, ছেলে-বউ কোথায় আছে। গোগোল এমনভাবে বসে রইল যেন সে বাংলা জানে না, মৌসুমির চিন্তায় ডুবে গেল। কিন্তু নিজের অ্যাপার্টমেন্টের কাছে পৌঁছে গোগোল কাচের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বাংলায় বলল, ডানদিকে থামতে হবে।

ড্রাইভার খুশি হয়ে পিছনে ফিরে তাকাল, হাসল, বলল, "আমি বুঝতে পারিনি।"

গোগোল বলল, "তাতে কী হয়েছে?" ভাড়ার সঙ্গে মোটা বকশিশ দিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল সে।

হঠাৎই মৌসুমিকে মনে পড়তে শুরু করল গোগোলের। কাজ করতে করতে, মিটিঙের সময়, ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগে বা শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে অনেক দিন আগে দেখা মৌসুমির কোনও কথা বা অঙ্গভঙ্গি মনে পড়ে যেতে লাগল। যেন এই দৃশ্যগুলো মনের কোথাও চাপা পড়ে ছিল,

বেরোতে পারছিল না, হঠাৎ বেরিয়ে আসছে। এই স্মৃতিগুলো সংগ্রহ করে রাখার জন্য সে নিজেই নিজেকে বাহবা দিতে শুরু করল, যেন সহসাই নিজের কোনও লুকোনো প্রতিভা আবিষ্কার করে ফেলেছে। বেশি যা মনে পড়ছে, তা হল পুজোতে দেখা মৌসুমিকে। তখন প্রতি বছরে দু'বার পুজো উপলক্ষে বাঙালিরা একত্র হত। সেখানে মৌসুমিকে দেখা যেত। শাড়ি পরে, কাঁধের উপর আঁচলটা সাবধানে পিন করা। সোনিয়াও শাড়ি পরত, কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাদে সেটা ছেড়ে জিন্‌স পরে ফেলত, শাড়িটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ঠেসে ঢুকিয়ে বাবা বা দাদাকে বলত, সেটা গাড়িতে রেখে আসতে। যেখানে পুজো হত, তার উলটোদিকেই একটা ম্যাকডোনাল্ডস ছিল। কিন্তু মৌসুমিকে অন্য সব টিনএজারের সঙ্গে রাস্তা পার হয়ে ম্যাকডোনাল্ডসে ঢুকতে কখনও দেখেনি গোগোল। অন্যদের মতো পার্কিং লটে বসে গাড়ির রেডিয়ো শুনতে শুনতে ক্যান থেকে বিয়ারে চুমুক দিত না মেয়েটি। পেম্বারটন রোডের বাড়িতে মৌসুমিকে বিশেষ মনে পড়ে না গোগোলের। তবে সে যে সেখানে গিয়েছিল, মায়ের হাতের রান্না খেয়েছিল, ঘরে ঘুরে বেড়িয়েছিল, বাথরুমে হাত ধুয়েছিল, একথা ভেবে খুব শান্তি হয়।

একবার মৌসুমির বাবা-মায়ের ডাকে ওদের বাড়িতে ক্রিসমাস পার্টিতে গিয়েছিল গোগোলরা। সোনিয়ার আর তার নিজের যাওয়ার কোনও ইচ্ছে ছিল না, ক্রিসমাস তো বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে কাটানোর কথা! কিন্তু অশোক বুঝিয়েছিল যে, আমেরিকাতে কাছেপিঠে থাকা বাঙালিরাই তো পরিবার। তাই ওরা বেডফোর্ডে মজুমদারদের বাড়িতে হাজির হয়েছিল। মৌসুমির মা, রিনামাসি, ঠান্ডা পাউন্ড কেক খেতে দিয়েছিলেন আর গরম করা ডোনাট। ওর ভাই, সম্রাটের বয়স তখন চার। সে স্পাইডারম্যান নিয়ে পাগল। রিনামাসি অনেক কষ্ট করে বেনামা উপহার বিনিময় করার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রত্যেক পরিবারকে বলা হয়েছিল, যতজন সদস্য ততগুলো উপহার নিয়ে যেতে, যাতে বিনিময় হলে সকলেই কিছু না কিছু পায়। গোগোলকে বলা হয়েছিল কাগজের চৌকো টুকরোয় নম্বর লিখতে। একই নম্বর দু'বার করে। একটা উপহারের প্যাকেটের গায়ে লাগানো হবে, আর অন্যটা দিয়ে লটারি করা হবে। একটা ঘরে ঠাসাঠাসি করে সবাই বসেছিল, মনে আছে। মৌসুমি পিয়ানোয় কিছু বাজিয়েছিল, অন্য সকলের সঙ্গে বসে গোগোলও শুনেছিল। পিয়ানোর উপরের দেওয়ালে রেনোয়ারের 'গার্ল উইথ গ্রিন ওয়াটারিং ক্যান' ছবিটার বাঁধানো প্রিন্ট টাঙানো ছিল। অনেক

বলাকওয়ার পরে, শ্রোতারা যখন আড়মোড়া ভাঙতে শুরু করেছে, মৌসুমি মোৎজ়ার্টের ছোট একটা পিস বাজিয়েছিল কিন্তু অন্য সবাই ততক্ষণে 'জিঙ্গল বেলস' শুনতে আগ্রহী। মৌসুমি মাথা নেড়ে 'না' বলায় রিনামাসি বলেছিলেন, "ও খুব ভাল করে জিঙ্গল বেলস বাজাতে জানে, এখন লজ্জা পাচ্ছে।" মৌসুমি মা-র দিকে রাগ করে তাকিয়েছিল বটে, কিন্তু তারপরে দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসে অনেকবার জিঙ্গল বেলস বাজিয়েছিল, যতক্ষণ না সব উপহার দেওয়া-নেওয়া শেষ হচ্ছে।

এক সপ্তাহ পরে ওরা লাঞ্চের সময় দেখা করল। সপ্তাহের মাঝামাঝি, তাই মৌসুমি বলেছে, গোগোলের অফিসের কাছাকাছি কোথাও আসবে। গোগোল ওকে অফিস-বিল্ডিংয়েই আসতে বলেছে। যখন রিসেপশনিস্ট ফোন করে জানাল, মৌসুমি লবিতে তার জন্য অপেক্ষা করছে, গোগোলের বুক প্রত্যাশায় দুরদুর করে উঠল। সারাদিন সে কাজে মন দিতে পারেনি। কয়েক মিনিট খরচ করে সে মৌসুমিকে কাজের জায়গা ঘুরিয়ে দেখাল, যে-সব বাড়ির প্ল্যানে সে কাজ করেছে সেগুলোর ছবি দেখাল। একজন প্রধান ডিজ়াইনারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, এমনকী ফার্মের মালিকরা যেখানে মিটিং করেন, সে-ঘরটাও দেখাল। গোগোলের সহকর্মীরা কাজ করতে করতে মাথা তুলে মৌসুমির দিকে তাকাল। নভেম্বরের প্রথম দিক, একটু বেশিই ঠান্ডা ছিল সেদিন। বাইরে পথচারীরা এই শীতের জন্য তৈরি নয় তখনও, তারা অখুশি মুখে বুকের উপর হাত ভাঁজ করে রেখে তাড়াতাড়ি হাঁটছে। হিমেল হাওয়ায় ঝরা পাতা ফুটপাথে চক্কর খাচ্ছে। গোগোলেরও টুপি বা দস্তানা আনা হয়নি, সে জ্যাকেটের পকেটে হাত দু'টো ঢুকিয়ে রাখল। শীত কিন্তু মৌসুমিকে স্পর্শ করছে না। সে একটা নেভি ব্লু কোট পরেছে, গলায় জড়ানো লম্বা কালো স্কার্ফ, পায়ে পাশে চেন দেওয়া কালো বুট।

গোগোল একটা ইতালিয়ান রেস্তোরাঁয় ঢুকল, যেখানে এর আগে সে সহকর্মীদের সঙ্গে এসেছে। ঢোকার দরজাটা রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ নীচে, জানালায় লেসের পরদা। ওয়েটার গোগোলকে চিনতে পেরে হাসল। ওরা বসল কোণের ছোট টেবিলে। অফিসের লোকেদের সঙ্গে আসলে অবশ্য গোগোল ঘরের মাঝখানে বড়সড় লম্বা টেবিলেই বসে। কোটের নীচে মৌসুমি একটা ছাইরঙের সুট পরেছে, সেটার শার্টে বড় বড় বোতাম। স্কার্টটা ঘণ্টাকৃতি, হাঁটু পর্যন্ত ঝুল।

গোগোল তাকাচ্ছে দেখে সে বলল, “আমি আজ ক্লাস নিয়েছি।” বুঝিয়ে বলল, ক্লাস থাকলে সে সুটই পরতে পছন্দ করে কারণ ছাত্ররা তার থেকে বেশি ছোট নয়। ফর্মাল পোশাক না পরলে নিজেকে ঠিক শিক্ষক মনে হয় না। হঠাৎ মৌসুমির ছাত্রছাত্রীদের হিংসা হল গোগোলের। সপ্তাহে তিনবার করে তারা ওকে দেখতে পায়। সে কল্পনা করল, ডেস্কে বসে তারা মৌসুমির কথা শুনছে, বোর্ডে লিখছে মৌসুমি।

ওয়েটার মেনু নিয়ে এলে সে মন্তব্য করল,“এখানে পাস্তা ভাল করে।”

“আমি এক গ্লাস ওয়াইন খাই?” মৌসুমি বলে, “আমার আজকের মতো কাজ শেষ। তুমিও আমার সঙ্গে খাও।”

“তোমার ভাগ্য ভাল। আমার এর পর বিচ্ছিরি মিটিং আছে।”

মেনুকার্ড বন্ধ করে মৌসুমি হেসে তাকাল, “তা হলে তো এখন ওয়াইন নিতেই হবে। মন ভাল থাকবে।”

“তা বটে।”

“দু’ গ্লাস মারলট,” ওয়েটার ফিরলে অর্ডার দেয় মৌসুমি। খাবার দু’জনেরই এক: পরচিনি রাভিওলি আর স্যালাড। গোগোলের ভয় ছিল, খাবার মৌসুমির যদি না পছন্দ হয়! কিন্তু প্লেট দু’টো এলে সে প্রশংসার দৃষ্টিতেই দেখল। খেলও খুব তাড়াতাড়ি, তৃপ্তি করে, এমনকী প্লেটে পড়ে থাকা ঝোল রুটি দিয়ে মুছে খেল। মৌসুমির মুখে আলোর প্রতিফলন গোগোলকে মুগ্ধ করছিল। ছাত্রছাত্রী, ডিসারটেশন, বিংশ শতকের আলজিরিয়ান ফ্রাঙ্কোফোনি কবিদের কথা বলছিল মৌসুমি। গোগোল বলল, ক্রিসমাস পার্টিতে জিঙ্গল বেল বাজানোর কথা কেমন মনে আছে তার।

“তোমার সে-রাতের কথা মনে আছে?” আশাভরে জিজ্ঞেস করল সে।

“না। মা তো আমাকে দিয়ে জোর করে এমন সব কাজ করাত যা আমার পছন্দ হত না।”

“এখনও তুমি পিয়ানো বাজাও?”

মৌসুমি মাথা নাড়িয়ে না বলল, “আমার কোনওদিনই ইচ্ছে ছিল না। ওসব মায়ের ইচ্ছে। ও-রকম অনেক ইচ্ছে মায়ের হত। এখন সম্ভবত নিজেই পিয়ানো শিখছে।”

রেস্তোরাঁ এখন ফাঁকা, দুপুরের খাবার সময় শেষ হয়েছে। অন্য সবাই বেরিয়ে গিয়েছে। এত তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়ে গেল তা হলে? এত

তাড়াতাড়ি কেটে গেল সময়? গোগোল ওয়েটারকে আঙুলের ইশারায় ডেকে নিল, বিল চাইল।

বিলটা এনে দু'জনের মাঝখানে রাখতে রাখতে ওয়েটার মৌসুমির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সেনর, উনি কি আপনার বোন?"

"না, না," গোগোল হাসবে, না কাঁদবে ভেবে পেল না। একই সঙ্গে অপমানিত আর উত্তেজিত লাগলেও একটু হাসল সে। অবশ্য ওয়েটারটিকে দোষও দেওয়া যায় না। দু'জনেরই গায়ের রং একরকম, সোজা ভুরু, ছিপছিপে শরীর, উঁচু গালের হাড় আর কালো চুল।

"আপনি ঠিক বলছেন?" ওয়েটারের সন্দেহ যায় না।

"ঠিকই বলছি," গোগোল বলে।

"ভাই-বোন হলে অবাক হতাম না," ওয়েটারটি আবার বলল, "আপনাদের মধ্যে প্রচুর মিল।"

"আপনার তাই মনে হচ্ছে?" মৌসুমি বলল। সে যেন পুরো ব্যাপারটা উপভোগই করছে, এমনভাবে গোগোলের দিকে আড়চোখে তাকাল। তবু গোগোলের মনে হল, মৌসুমির গাল লাল হয়ে উঠেছে, অবশ্য তা ওয়াইনের গুণে না ওয়েটারের প্রশ্নের জন্য, তা বলা যায় না।

বাইরের হিমেল হাওয়ায় বেরিয়েই মৌসুমি বলল, "ওয়েটারটার কথা অদ্ভুত, না?"

"অদ্ভুত কেন?"

"এই যে আমাদের বাবা-মায়েরা এদেশে আমাদের মানুষ করেছিলেন এমনভাবে, যেন আমরা সকলে পরস্পরের ভাই-বোন। যেন আমরা বিরাট একটা বাঙালি পরিবারের অংশ। আর এই দেখো, এখন কেউ সত্যি সত্যি ভাবল যে, আমাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে।"

গোগোল কী বলবে বুঝতে পারল না। ওয়েটারের কথাটা তার মনে কাঁটার মতো বিঁধে আছে। মনে হচ্ছে, মৌসুমির সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন যেন অবৈধ।

মৌসুমি স্কার্ফটা বেশ করে গলায় জড়াতে জড়াতে বলল, "তুমি যথেষ্ট গরমজামা পরে নেই।"

"আমার অ্যাপার্টমেন্টে এত গরম! কেন যেন আমি মানতে পারি না, বাইরে ভীষণ ঠান্ডা হতে পারে।"

"কাগজে দেখো না, কেমন ঠান্ডা পড়বে?"

"আমি কাজে বেরোনোর সময় রাস্তা থেকে কাগজ কিনি।"

"আমি বেরোনোর আগে ফোনে জেনে নিই বাইরের আবহাওয়া কীরকম।"

"দুর! সত্যি নাকি?" গোগোল অবাক হল, সে ভাবতেই পারেনি মৌসুমি এমন পিটপিটে হতে পারে।

"আমি কিন্তু সকলের কাছে এ ব্যাপারটা স্বীকার করি না," মৌসুমি হাসতে হাসতে বলল। তারপর নিজের স্কার্ফটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, "তুমি আপাতত এটা নিয়ে যাও।"

"প্লিজ়, আমি ঠিক আছি," গোগোল টাইয়ের গিঁটটা স্পর্শ করল।

"ঠিক তো?"

গোগোল সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে, যদিও মৌসুমির স্কার্ফের স্পর্শ নিজের ত্বকে নিতে তার মন উৎসুক হয়ে উঠছে।

"তবে তোমার একটা হ্যাট দরকার হবে," মৌসুমি বলল, "আমি কাছেই একটা দোকান চিনি। তোমার অফিসে একটু দেরি হলে কিছু হবে?"

গোগোলকে নিয়ে মৌসুমি ম্যাডিসনে একটা বুটিকে ঢুকল। দোকানটার জানালায় ভিড় করে একফুট লম্বা গলাওয়ালা পুতুলের মাথায় মেয়েদের হ্যাট সাজানো। মৌসুমি বলল, "ছেলেদের হ্যাটও আছে। পিছনদিকে।" ভিতরে মেয়েদের ভিড় কিন্তু পিছনদিকটা অপেক্ষাকৃত শান্ত। কাঠের তাকে থরেথরে ফেডোরা আর বেরে সাজানো। গোগোল একটা টপহ্যাট আর একটা ফারহ্যাট তুলে নিয়ে মজা করে পরে দেখল। ওয়াইনটা পেটে ঢুকে একটু বেসামাল করে দিয়েছে। মৌসুমি ঝুড়িতে মানানসই হ্যাট খুঁজতে লাগল। "এটা গরম হবে," একটা নীল-কালো টুপি তুলে ধরে সে বলল। আঙুল দিয়ে টুপির ফাঁদটা বড় করে ধরে গোগোলের মাথায় পরিয়ে দিল সেটা, ওর হাত ছুঁয়ে দিল গোগোলের কপাল, মাথা, চুল, "কী মনে হয়?" গোগোল আয়নায় নিজেকে দেখল, পিছনে দাঁড়িয়ে মৌসুমি ওকেই দেখছে। আয়নায় প্রতিফলিত চেহারা নয়, রক্তমাংসের মানুষটাকে। চশমাটা ছাড়া কেমন লাগে মৌসুমিকে? কেমন দেখায় যখন ওর চুল অগোছালোভাবে খোলা থাকে? ওকে ঠোঁটে চুমু খেতে কেমন লাগবে? "বেশ তো, ভালই," গোগোল মুখে বলল, "আমি এটা নেব।"

মৌসুমি একটানে মাথা থেকে টুপিটা খুলে নেয়, চুল এলোমেলো হয়ে যায় গোগোলের। সে বলে, "কী হল?"

"আমি তোমাকে এটা কিনে দেব।"

“তার কোনও দরকার নেই।”

“আমার ইচ্ছে করছে।”

মৌসুমি ততক্ষণে কাউন্টারে পৌঁছে গিয়েছে। সে বলল,“এমনিতে টুপি কেনার কথাটা তো আমিই তুলেছিলাম। তোমার তো জমে বরফ হয়ে যেতে কোনও আপত্তি ছিল না।”

ওদিকে ক্যাশ কাউন্টারে ক্যাশিয়ার লক্ষ করেছে, মৌসুমির নজর একটা বিশেষ মেয়েদের টুপিতে আটকেছে। খয়েরি উল আর ভেলভেটের তৈরি, উপরে পালক লাগানো। তিনি সেটা মডেলের মাথা থেকে নামিয়ে বললেন, “দারুণ জিনিস। স্পেনের মহিলাদের হাতে তৈরি। এই একটিই তৈরি হয়েছে, জুড়ি নেই। পরে দেখবেন?”

মৌসুমি টুপিটা নিয়ে মাথায় দিল। একজন অন্য খরিদ্দার প্রশংসা করলেন। ক্যাশিয়ারও তাই, “সব মেয়েদের মাথায় এ-রকম টুপি মানায় না।”

মৌসুমি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। পাশে ঝুলে থাকা দামের কাগজটা দেখে বলল, “কিন্তু আজকের মতো এটা আমার বাজেটের বাইরে।”

ক্যাশিয়ার টুপিটা জায়গায় তুলে রাখলেন, তারপর গোগোলকে বললেন, “এবার তো আপনার জানা হয়ে গেল ম্যাডামকে জন্মদিনে কী দিতে হবে।”

গোগোলের মাথায় নতুন টুপি, দু’জনে দোকান থেকে বেরোল। এখন মিটিংয়ের পক্ষে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আজকের মিটিংটা না থাকলে গোগোল সারাদিন মৌসুমির পাশে-পাশে ঘুরত, বা কোনও সিনেমাহলে ঢুকে পড়ত। তাপমাত্রা আরও নেমে গিয়েছে, হিমেল হাওয়ারও জোর বাড়ছে। মৌসুমি গোগোলকে অফিস পর্যন্ত পৌঁছে দিল। বাকি দিনটা, মিটিং আর কাজের মাঝখানে গোগোলের মৌসুমির কথাই মনে পড়ল। অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা সাবওয়ের দিকে যাওয়ার বদলে সে সেই সব রাস্তায় হেঁটে গেল যেখানে দুপুরে মৌসুমির সঙ্গে হেঁটেছে। সেই ইতালিয়ান রেস্তোরাঁটায় এখন ডিনারের ভিড়। টুপির দোকানটা দেখে গোগোলের মনটা ভাল হয়ে গেল। প্রায় আটটা বাজে, অন্ধকার নামছে। ভেবেছিল, দোকানটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু না, আলো জ্বলছে তখনও, গেটটা পুরো বন্ধ হয়নি। গোগোল জানালায় দাঁড়িয়ে কাচে নিজের প্রতিফলন দেখতে পেল। মৌসুমির কিনে দেওয়া টুপিটা তার মাথায়। কিছুক্ষণ পরে দোকানে ঢুকে পড়ল সে। দোকান ফাঁকা, গোগোলই একমাত্র খরিদ্দার। ভিতরে কোথাও ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

“আমি জানতাম, আপনি ফিরে আসবেন,” সেই সেল্‌সওম্যান এগিয়ে এলেন। মৌসুমির পছন্দ করা টুপিটা মডেলের মাথা থেকে খুলে নিলেন তিনি। গোগোলকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। অ্যাসিস্ট্যান্টের দিকে ফিরে বললেন, “ইনি দুপুরে এঁর গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে এসেছিলেন।” তারপর বললেন, “প্যাক করে দেব?”

গোগোল বলল, “তা-ই ভাল।” নিজের সম্বন্ধে কথাগুলো শুনে ভারী ভাল লাগছিল তার। সে দেখল, টুপিটা গোল চকোলেট রঙের বাক্সে পুরে ক্রিম রঙের ফিতে দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। হঠাৎ মনে পড়ল, দামটা জিজ্ঞেস করা হয়নি। কিন্তু না ভেবেই দুশো ডলারের রসিদটায় সে সই করে দিল।

নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গোগোল বাক্সটা আলমারির একেবারে পিছনে লুকিয়ে রাখল। যদিও মৌসুমি কোনওদিন সেখানে আসেনি। মৌসুমির জন্মদিনে এটা উপহার দেবে গোগোল, কিন্তু জন্মদিনটা কবে, সে-সম্পর্কে কোনও ধারণা তার নেই।

অবশ্য গোগোল নিশ্চিত, সে ছোটবেলায় মৌসুমির বেশ কয়েকটা জন্মদিনে গিয়ে থাকবে। মৌসুমিও নিশ্চয়ই তার জন্মদিনে এসেছে। সেই উইকএন্ডে মা-র বাড়িতে গিয়ে এ ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজ করল গোগোল। মা আর সোনিয়া ঘুমুতে যাওয়ার পর মা-র বছরের পর বছর ধরে জমিয়ে তোলা ফোটো অ্যালবাম নামাল। মৌসুমির ছবি সেখানে রয়েছে। পেম্বারটন রোডের ডাইনিং রুমে মোমবাতি জ্বলা কেকের পিছনে দাঁড়িয়ে। মাথায় একটা কাগজের টুপি, কিন্তু নজর ক্যামেরার দিকে নেই। গোগোল নিজে কিন্তু সোজা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে। একটা ছুরি বাগিয়ে কেকের উপর পোজ় দিচ্ছে। মুখে-চোখে জ্বলজ্বল করছে কৈশোরের উত্তেজনা। ফোটোটা অ্যালবাম থেকে খুলে নেওয়ার চেষ্টা করলে সে, যাতে পরের বার মৌসুমিকে দেখাতে পারে। কিন্তু হলুদ আঠা দিয়ে লাগানো ফোটোটা কোনওমতেই অ্যালবামের স্তব্ধ অতীত থেকে উঠে আসতে চাইল না।

পরের শনিবার মৌসুমি গোগোলকে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে রাতে খেতে ডাকল। কলিং বেল ভেঙে গিয়েছে, তাই মৌসুমিকে নীচে নেমে এসে দরজা খুলে দিতে হল। গোগোলের টুপিটার প্রশংসা করল সে। মৌসুমি কালো স্লিভলেস জামা পরে আছে, পিঠের দিকে হালকা করে বাঁধা। পায়ে মোজা

নেই, শুধু একটা চটি। মেরুন নেলপালিশপরা নখ দেখা যাচ্ছে। খোঁপা থেকে কয়েকগুছি চুল খুলে ঝুলছে। তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে একটা আধখাওয়া সিগারেট। কিন্তু গোগোলের গালে চুমু খাওয়ার আগে সেটা মাটিতে ফেলে চটি দিয়ে ঘষে ফেলল সে। মৌসুমির অ্যাপার্টমেন্ট চারতলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। দরজাটা খোলাই ছিল। ঘরের ভিতরে রান্নার তীব্র গন্ধ। উনুনে একপাত্র তেলে কয়েক টুকরো চিকেন ফুটছে। গান বাজছে, একজন পুরুষ গায়কের গলায় ফরাসি গান। গোগোল ওকে একগোছা সূর্যমুখী ফুল উপহার দিল। ফুলগুলোর ডাঁটির ওজন, সঙ্গে আনা ওয়াইনের বোতলের ওজনের চেয়েও বেশি। ফুলগুলো রাখাই সমস্যা। সব খালি জায়গাই রান্নার জিনিসে ভরা— পেঁয়াজ, মাশরুম, ময়দা, মাখন, একগ্লাস ওয়াইন, প্লাস্টিকের ব্যাগে মুদির দোকান থেকে কেনা জিনিস যা সরানোর সময় পাওয়া যায়নি।

গোগোল বলল, "ম্যানেজ করা যায়, এমন কিছু দিলে ভাল হত, না?"

মৌসুমি ঘরের মাঝখানে ফুলগুলো কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চারদিকে তাকাচ্ছে যেন ম্যাজিকের মতো সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বা ঘরটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

"আমি কবে থেকে ভাবছি সূর্যমুখী কিনব," সে বলল। চট করে ফুটন্ত ঝোলটার দিকে দেখে নিয়ে সে গোগোলকে লিভিং রুমে নিয়ে গেল। ফুলগুলোর ডাঁটি থেকে কাগজ খুলতে খুলতে বলল, "বইয়ের তাকের উপর একটা ফুলদানি আছে। ওটা নামাতে পারবে?"

ফুলদানিটা নিয়ে বাথরুমে গেল মৌসুমি, গোগোল জল ভরার শব্দ শুনতে পেল। এই সুযোগে কোট আর টুপি খুলে সোফার উপর গুছিয়ে রাখল সে। যত্ন করে জামাকাপড় পরেছে আজ। একটা নীল-সাদা স্ট্রাইপ ইতালিয়ান শার্ট, কালো জিন্স। শার্টটা সোনিয়া বড় দোকানের সেল থেকে কিনে দিয়েছিল। মৌসুমি ফুলদানিতে জল ভরে ফিরল, ফুল সাজিয়ে কফি টেবিলের উপর রাখল। ঢোকার সময় লবিটা বেশ নোংরা লেগেছিল গোগোলের, কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টটা বেশ সুন্দর। মেঝে নতুন করে করা হয়েছে। দেওয়ালে তাজা রং। ছাতে ট্র্যাকলাইট্স লাগানো। লিভিং রুমের কোনায় একটা চৌকো ডাইনিং টেবিল, অন্যদিকে ডেস্ক আর ফাইলিং ক্যাবিনেট। এক দেওয়াল জুড়ে বইয়ের তাক। ডাইনিং টেবিলের উপর নুন ও মরিচদানি, একটা বাটিতে উজ্জ্বল রঙের ফুল। পারিবারিক সূত্রে গোগোলের চেনা কয়েকটা জিনিস সাজানো রয়েছে: মেঝেতে কাশ্মীরি

কার্পেট, সোফার উপর রাজস্থানি সিল্কের বালিশ, বইয়ের তাকে লোহার নটরাজ।

রান্নাঘরে ফিরে মৌসুমি কিছু জলপাই আর চিজ় বের করে রাখল। একটা কর্কস্ক্রু দিয়ে গোগোলকে বলল সঙ্গে আনা ওয়াইনের বোতলটা খুলে একগ্লাস ঢেলে নিতে। সে নিজে আরও চিকেন নিয়ে ময়দায় মাখতে লাগল। এদিকে উনুনে বসানো পাত্রটা খুব জোরে জোরে ফুটছে, তেল ছিটকে পিছনের দেওয়ালে লাগছে। মৌসুমি জুলিয়া চাইল্ডের লেখা রান্নার বই পড়তে লাগল। গোগোলের জন্য এত পরিশ্রম করছে এই মেয়েটি? গোগোলের একটু নার্ভাস লাগতে লাগল।

"কখন খাবে তুমি? খিদে পেয়েছে?" মৌসুমি প্রশ্ন করল।

"যখন হয়। তুমি কী রাঁধছ?"

মৌসুমি একটু ভয়ে-ভয়ে গোগোলের দিকে তাকাল। "কক ও ভ্যাঁ। আমি আগে কখনও এটা রাঁধিনি। এখনই দেখলাম এটা আসলে ২৪ ঘণ্টা আগে রাঁধতে শুরু করতে হয়। আমি বেশ কিছুটা পিছিয়ে আছি।"

গোগোল বলল, "গন্ধটা কিন্তু এখনই দারুণ লাগছে। আমি সাহায্য করি? কী করব?"

গোগোল জামার হাতা গুটোতে শুরু করল। মৌসুমি রান্নার বইয়ে ডুবে আছে। বলল, "আচ্ছা, দেখি। ও! তুমি এই পেঁয়াজগুলো নাও। একটা ছুরি দিয়ে তলায় 'এক্স'-এর মতো করে কাটতে থাকো। তারপর এই ডেকচিটায় ফেলো।"

"চিকেনের সঙ্গে ফেলব?"

"না, দাঁড়াও," মৌসুমি নিচু হয়ে তলার তাক থেকে একটা বড় ডেকচি বের করল, "এতে ফেলো। এক মিনিট ফুটিয়ে নামিয়ে নেব।"

গোগোল তাই করল, উনুনে আগুন জ্বালিয়ে ডেকচিতে পেঁয়াজ আর জল দিয়ে বসিয়ে দিল। ম্যাক্সিনদের বাড়িতে ব্রুসেল্‌স স্প্রাউট কাটতে শিখেছিল, তাই অসুবিধে হল না। মৌসুমি ওয়াইন আর টোম্যাটো-পেস্ট মেপে ফুটন্ত চিকেনে মিশিয়ে দিল। তারপর চারদিক খুঁজে স্টেনলেস স্টিলের মশলার কৌটো বের করে একটা তেজপাতাও ফেলে দিল।

"মা খুব রাগ করেছে, কারণ আমি তোমায় বাঙালি খাবার রেঁধে খাওয়াচ্ছি না," ফুটন্ত পাত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে মৌসুমি বলল।

"তুমি বলে দিয়েছ আমি আজকে আসছি?"

"মা আজকেই ফোন করল যে। আর তুমি? তুমি তোমার মাকে জানাওনি?"

"যতটুকু দরকার ততটুকুই বলেছি। অবশ্য আজ শনিবার, আমি বাড়ি যাইনি। সুতরাং কিছু সন্দেহ করে থাকবে।"

মৌসুমি রান্নার উপর ঝুঁকে পড়ে কাঠের হাতা দিয়ে চিকেনের টুকরোগুলো নাড়তে লাগল। তারপর ফের রান্নার বইয়ের দিকে তাকাল। "মনে হয় আরও ঝোল লাগবে," রান্নায় জল ঢালতে লাগল সে। ফুটন্ত পাত্রে জল ঢালার ফলে ধোঁয়া উঠে মৌসুমির চশমা ঝাপসা হয়ে এল। সে হেসে বলল, "কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।" দু'পা পিছিয়ে আসায় মৌসুমি গোগোলের বেশ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে সিডিটা শেষ হয়ে গেছে। অ্যাপার্টমেন্টে রান্নার শব্দ ছাড়া শুধুই নিস্তব্ধতা। মৌসুমি গোগোলের দিকে ফিরে তাকাল। চশমার কাচ তখনও ধোঁয়াটে। হাতে ময়দা আর চিকেন ফ্যাট। সে বলল, "আমার হাতগুলো পরিষ্কার করতে সাহায্য করবে?"

গোগোল দু'হাত দিয়ে ওর চোখ থেকে চশমাটা সরিয়ে কাউন্টারে রাখল। তারপর একটু ঝুঁকে পড়ে চুমু খেল মৌসুমিকে। রান্নাঘরের উত্তাপ সত্ত্বেও ওর ঠান্ডা খালি হাতটাকে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল গোগোল। ওকে কাছে টেনে নিয়ে একটা হাত পিঠের নীচের দিকে পোশাকের গিঁটটার উপর রাখল, অনুভব করল ওর মুখের উষ্ণ, হালকা নোনতা স্বাদ। লিভিং রুম থেকে দু'জনে এগিয়ে গেল বেডরুমের দিকে। সেখানে একটা বাক্সখাটের উপর গদি পাতা রয়েছে। মৌসুমির পিঠের বাঁধনটা খুলতে একটু অসুবিধে হলেও লম্বা জ়িপটা সহজেই খুলে ফেলল সে। পোশাকটা ছোট কালো স্তূপের মতো পড়ে রইল মৌসুমির পায়ের কাছে। লিভিং রুম থেকে আসা আবছা আলোয় সে দেখতে পেল, মৌসুমির কালো নেটের অন্তর্বাস এবং ম্যাচিং ব্রা। পোশাক পরা অবস্থায় যেমন দেখায়, তার চেয়েও বেশি ভরাট শরীর মৌসুমির, সুগঠিত বুক, চওড়া নিতম্ব। তারা বেডকভারের উপরে এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হল যেন দু'জন দু'জনের শরীরকে অনেক বছর ধরে চেনে। উত্তাপের পালা শেষ হওয়ার পর তারা বিছানার পাশের আলোটা জ্বালিয়ে গভীরভাবে দেখতে লাগল পরস্পরের শরীর, কোথায় তিল, কোথায় দাগ আর কোথায় আঁচিল।

"ভাবা যায়?" বলল মৌসুমি, সে হাসছিল, চোখ দু'টো আধবোজা। গোগোল তার মুখের দিকে তাকাল, বলল, "তুমি খুব সুন্দর।"

“তুমিও।”

“চশমা ছাড়া দেখতে পাচ্ছ আমাকে?”

“শুধু যখন খুব কাছে থাকো।”

“তা হলে আমার এখান থেকে সরে না যাওয়াই ভাল।”

“যেয়ো না।”

ঢাকা তুলে ফেলে ওরা দু'জনে শুয়ে রইল। শরীরে ঘাম জমল, মনে তৃপ্তি। গোগোল আবার মৌসুমিকে চুমু খেতে শুরু করলে সে দু'পা দিয়ে জড়িয়ে ধরল গোগোলের শরীর। হঠাৎ একটা পোড়ার গন্ধ নাকে যেতে দু'জনেই সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ছিটকে উঠল খাট থেকে, কমিক বইয়ের চরিত্রের মতো দৌড়ে রান্নাঘরে ঢুকল। ঝোল তো উবে গেছেই, চিকেনের টুকরোগুলো পুড়ে ঝামা। এতই পুড়েছে যে, হয়তো রান্নার পাত্রটাই ফেলে দিতে হবে। ততক্ষণে পেটে ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়ে গিয়েছে, আবার রান্না করা বা বাইরে যাওয়ার মতো ইচ্ছেও নেই কারও, তাই ওরা চিনে খাবার বাড়িতে দিয়ে যাওয়ার অর্ডার দিয়ে দিল।

তিনমাসের মধ্যে গোগোল আর মৌসুমি পরস্পরের অ্যাপার্টমেন্টে টুথব্রাশ আর জামাকাপড় রাখতে শুরু করে দিল। গোগোল মৌসুমিকে উইকএন্ড জুড়ে বিনা মেকআপে দেখতে পায়, ডেস্কে বসে টাইপ করতে করতে তার দু'চোখের নীচে জমে যাওয়া কালি দেখতে পায়। মৌসুমির মাথায় ঠোঁট ছোঁয়ালে শ্যাম্পু করার মাঝে চুলে জমে ওঠা তেলের স্বাদ পায় গোগোল। দেখতে পায় ওয়্যাক্সিং করা না থাকলে মৌসুমির পায়ের চামড়ায় রোম মাথা তুলছে। বিউটি পার্লারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার অপেক্ষায় মাথা তোলা কালো রোমের ডগা দেখতে পেয়ে সে বুঝতে পারে, এর চেয়ে বেশি অন্তরঙ্গভাবে সে কোনও মেয়েকে পায়নি। এখন গোগোল জানে, মৌসুমি বাঁ-পা সোজা করে, ডান-পা বেঁকিয়ে ঘুমোয়, ইংরেজি চারের মতো দেখতে লাগে ওকে। জানে, খারাপ হয়ে যাওয়া লন মোয়ারের মতো শব্দ করে হালকা নাক ডাকে মৌসুমির, আর ঘুমোবার সময় দাঁতে শব্দ হয়। রেস্তোরাঁয় বা বারে খাবার সময় পাশের টেবিলে কারও খারাপ চুল বা পোশাক সম্পর্কে মন্তব্য করতে চাইলে বাংলা বলতে দ্বিধা করে না তারা।

দু'জনের কথার মধ্যে প্রায়ই ঘুরে আসে একটি কথা: ওরা পরস্পরকে কতটা ভাল করে চেনে। আসলে এ বিষয়ে বেশি কথা বলার দরকারই নেই। ওরা ছোটবেলায় একই পার্টিতে গিয়েছে, বড়রা যখন অন্য ঘরে গল্প করত তখন ওরা অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে *দ্য লাভ বোট* আর *ফ্যানটাসি আইল্যান্ডের* একই কিস্তি একসঙ্গে দেখেছে। একইরকম কাগজের প্লেটে, কার্পেটে একই খবরের কাগজ বিছিয়ে ওরা খাবার খেয়েছে। মৌসুমিরা নিউ জার্সিতে চলে যাওয়ার পর জীবন কেমন হতে পারে তা কল্পনা করতে গোগোলের একটুও অসুবিধে হয় না। সেখানকার বিশাল মফস্‌সলি বাড়ি, ডাইনিং রুমে কাচের বাসন রাখার ক্যাবিনেট (মৌসুমির মায়ের গর্বের জিনিস) বা পাবলিক স্কুলটা, যেখানে মৌসুমি ভাল রেজাল্ট করেছে কিন্তু পড়ে আনন্দ পায়নি— এ-সব গোগোলের খুবই চেনা মনে হয়। ওরা দু'জনে একইভাবে জীবনের বেশ কয়েকটি মাস কলকাতায় কাটিয়েছে। মার্কিন জীবন থেকে নিজেদের ছিঁড়ে নিয়ে কলকাতার জীবনে ঢুকে গিয়েছে। দু'জনে হিসেব করে ক'মাস কলকাতায় ছিল, দেখা যায় একবার একই সপ্তাহে আর একবার কয়েকমাস দু'জনেই কলকাতায় ছিল। অথচ তখন কোনও যোগাযোগই হয়নি। দু'জনকেই বারবার গ্রিক, মিশরীয় বা মেক্সিকান বলে চারপাশের লোকেরা ভুল করেছে। এই ভুল বোঝাবুঝিতেও দু'জনে একসূত্রে বাঁধা।

মৌসুমি ইংল্যান্ডে কাটানো দিনগুলোর কথা ভালবাসার সঙ্গে মনে করে। প্রথমদিকে ওরা লন্ডনে থাকত, সে-কথা অবশ্য বিশেষ মনে নেই। খুব হালকা মনে পড়ে ক্রয়ডনের বাড়িটা, সামনে গোলাপের ঝাড় ছিল। ভিতরে সরু সরু ঘর, গ্যাসের ফায়ারপ্লেস, বাথরুমের সোঁদা গন্ধ, সকালে উইটাবিক্স আর গরম দুধ খেয়ে ইউনিফর্ম পরে স্কুলে যাওয়া। মৌসুমি বলে, আমেরিকায় আসতে ওর মোটেই ভাল লাগেনি। তাই উচ্চারণে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট যতদিন পেরেছিল, ধরে রেখেছিল। ওর বাবা-মা'র ইংল্যান্ডের চেয়ে আমেরিকাকে বেশি সন্দেহজনক *ঠেকেছিল*। হয়তো আমেরিকা বিরাট বড় দেশ বলে অথবা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ইংল্যান্ডের তুলনায় ক্ষীণ বলে। ম্যাসাচুসেট্‌সে আসার মাসকয়েক আগে ওরা জানতে পারে, উঠোনে খেলার সময় সেখানকার একটি বাচ্চা হারিয়ে গিয়েছিল, আর পাওয়া যায়নি। সুপার মার্কেটে বহুদিন এই নিয়ে পোস্টার লাগানো ছিল। মৌসুমির মনে আছে, প্রত্যেকবার বন্ধুদের বাড়ি যাওয়ার সময় বা খেলতে খেলতে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যেতে হলে, কারও বাড়িতে কুকি খেতে হলে ফোন করে মায়ের

অনুমতি নিতে হত। সবক'টি বাড়িই ওদের বাড়ি থেকে দেখা যেত, তবুও। বন্ধুর বাড়িতে ঢুকে ফোন করার অনুমতি চাইত সে। আমেরিকান মায়েরা তার এই কর্তব্যবোধ দেখে খুশি হতেন, অবাকও কম হতেন না। "আমি আনার বাড়িতে বা আমি স্যুর বাড়িতে," সে ফোনে ইংরেজিতে মা'কে বলত।

মৌসুমি গোগোলকে এও বলেছে যে, সারাজীবন গোগোলের মতো কাউকে এড়িয়ে চলাই তার লক্ষ্য ছিল। গোগোল তাতে অপমানিত বোধ করে না, বরং তার ভালই লাগে। ছোটবেলা থেকে, মৌসুমি বলে, তার প্রতিজ্ঞা ছিল নিজের বিয়েতে বাবা বা মা'কে কোনও ভূমিকায় রাখবে না। ইচ্ছে ছিল, আমেরিকানকে বিয়ে করবে। গোগোলেরও তো তাই ইচ্ছে ছিল। তবে মৌসুমিকে আমেরিকান বিয়ের বিপক্ষে যতটা জপানো হয়েছে, গোগোলকে ততটা হয়নি। পাঁচ বছর বয়সেই মৌসুমিকে আত্মীয়রা জিজ্ঞেস করেছিল, সে লাল শাড়ি পরে বিয়ে করবে না সাদা গাউন পরে। সে-কথার কোনও উত্তর সে দেয়নি বটে কিন্তু মনে মনে মৌসুমি দিব্যি জানত, কী বললে ওরা খুশি হবে। বারো বছর বয়সে চেনা দুই বাঙালি বন্ধুর সঙ্গে মিলে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, বাঙালি ছেলে কক্ষনও বিয়ে করবে না। কথাটা একটা কাগজে লিখে তারা তিনজনে সেটার উপর একসঙ্গে থুতু ফেলেছিল আর ওর বাড়ির পিছনের উঠোনে পুঁতে ফেলেছিল।

বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মৌসুমিকে অনেক অসফল পরিকল্পনার শিকার হতে হয়। মাঝে মাঝেই বাবার কমবয়সি বাঙালি সহকর্মীদের ওদের বাড়িতে আসতে দেখা যেত। মৌসুমি কোনওদিন ওদের সঙ্গে কথা বলেনি, হোমওয়ার্ক করার অছিলায় সে গটগট করে উপরে চলে যেত, বিদায় জানাতেও নীচে আসত না। গরমকালে কলকাতায় বেড়াতে গেলে তার দাদুর ফ্ল্যাটে অচেনা যুবকেরা উদয় হত। একবার ট্রেনে করে দুর্গাপুরে কাকার বাড়ি যাওয়ার সময় এক ভদ্রমহিলা মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সে বাগদত্তা কি না কারণ তাঁদের একমাত্র ছেলে মিশিগানে সার্জারি পড়ছে। অনেকে বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করত, "তোমরা ওর বিয়ের সম্বন্ধ দেখছ না?" এই সব কথা মৌসুমিকে কেমন ভয় ধরিয়ে দিত। ওরা এমনভাবে কথা বলত যেন বিয়ে মৌসুমির জীবনে বাঙালি মতেই হবে, কোন সময়ে কী রংয়ের শাড়ি পরা হবে, কী খাওয়ানো হবে, কীভাবে বিয়ে হবে, তার খুঁটিনাটি আলোচনা শুনে ঘেন্না হত ওর। ঠাকুমা যখন আলমারি খুলে গয়না দেখাত আর বলত, বিয়েতে এ-সব গয়নাই তার হবে, মৌসুমির ভীষণ খারাপ লাগত।

তবে লজ্জাটা ছিল অন্য জায়গায়। মৌসুমি ক্রমাগত একলা হয়ে যাচ্ছিল। ভারতীয়দের সঙ্গে সে মিশত না আর টিনএজার হিসেবে তাকে ডেটিং করতে দেওয়া হত না। কলেজে অচেনা প্রোফেসরদের বা ছাত্রদের সম্বন্ধে ইনফ্যাচুয়েশনে ভুগত। মনে-মনে এদের সঙ্গে প্রেম করত মৌসুমি। বাস্তব জীবনে লাইব্রেরিতে একবার দেখা হওয়া, দু-একটা কথা বিনিময় বা আরও অনেক ছাত্রের সঙ্গে করা একটা ক্লাসকে ভিত্তি করে রঙিন কল্পনার জাল বুনত। এতটাই জোর ছিল সে কল্পনার যে, এখনও স্কুল বা কলেজের একটা বছরকে সে একজন কারও প্রেমে পড়া দিয়ে চিহ্নিত করে। কখনও কখনও এমনভাবে মনে-মনে প্রেমে পড়া মানুষটির সঙ্গে ছোটখাটো কফি-ডেটেও বেরিয়েছে সে, কিন্তু কায়মনোবাক্যে আশা করা সত্ত্বেও আদতে কিছুই ঘটেনি। কারও সঙ্গে সম্পর্ক না হওয়ার দরুন কলেজের শেষ দিকে সে ভাবতে আরম্ভ করেছিল যে তার জীবনে কেউই আসবে না। অচেনা কাউকে বিয়ে করার সম্ভাবনা বা ভয়ই কি তাকে অন্তর্মুখী করে তুলেছিল? এ-সব বলতে বলতে মৌসুমি মাথা নাড়ে, অতীতের সেই অধ্যায় তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। এতদিন পরেও নিজের কৈশোর ভাল লাগে না তার। মায়ের কথা শুনে চলা, লম্বা অসুন্দর চুল, পিয়ানো শেখা আর লেসের কলারওয়ালা শার্ট নিয়ে খুব পশ্চাত্তাপ হয়। বয়ঃসন্ধির সময় নিজের আত্মবিশ্বাসের অভাব ও পৃথুলতা নিয়ে খুব আফসোস হয়। “ওই কারণেই তুমি কখনও আমার সঙ্গে কথা বলতে না তখন,” সে বলে। এই সময়গুলোয় মৌসুমির প্রতি গোগোলের আবেগ উথলে ওঠে। গোগোলের জীবনেও ওইরকম সময় কেটেছে, কিন্তু সে-সব আর মনে পড়ে না। আজকের চেনা এই মেয়েটির স্মৃতিতে গোগোলের নিজের স্মৃতি চাপা পড়ে যায়।

ব্রাউনে পড়ার সময় মৌসুমি প্রথম বিপ্লব করেছিল কিন্তু তা লেখাপড়ার জগতেই। বাবা-মায়ের উৎসাহে সে কেমিস্ট্রিতে মেজর করেছিল, তাঁরা ভেবেছিলেন যে, মেয়ে বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। তবে তাঁদের না বলে মৌসুমি কেমিস্ট্রির সঙ্গে সঙ্গে ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যেও মেজর করে ফেলল। তৃতীয় এক সংস্কৃতি ও ভাষার সন্ধানে ফরাসি নিয়ে মৌসুমি আগ্রহী হয়েছিল। পড়তে শুরু করেছিল বাংলা বা ইংরেজির সঙ্গে কোনও যোগ না রেখে, কোনও প্রত্যাশা না নিয়েই। যে-দুটি দেশের দাবি মৌসুমির উপরে ছিল, সেগুলিকে ছেড়ে তৃতীয় এমন এক দেশের দিকে ঝুঁকল সে, যেটার সঙ্গে দাবিদাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। চার বছর ধরে লুকিয়ে ফরাসি নিয়ে

পড়াশোনা করে তৈরি হয়েছিল সে, যেন কলেজ শেষ করেই যত দূরে সম্ভব পালাতে পারে। বাবা-মাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল, সে কেমিস্ট হতে চায় না। তাঁদের আপত্তি আর প্রতিবাদ কানে না তুলে নিজের সম্বলটুকু নিয়ে প্যারিসের পথে পাড়ি দিয়েছিল সে।

হঠাৎই জীবন খুব সহজ হয়ে উঠল। যে মৌসুমি ভেবেছিল তার আর প্রেমিক জুটবে না, সে খুব দ্রুত প্রেমে পড়তে শুরু করল। একটুও না ভেবে পার্কে, কাফেতে বা মিউজ়িয়ামে যে-কোনও পুরুষের জালে ধরা দিতে লাগল। নিজেকে পুরোপুরি উজাড় করে দিত, পিছুটান বা রাখঢাক না রেখে। উপরে-উপরে তার চেহারা পালটায়নি বটে, কিন্তু মৌসুমি নতুন শহরে এমন এক মেয়েতে পরিণত হল যাকে সে চিরকাল মনে-মনে হিংসে করেছে। ছেলেদের পয়সায় ড্রিংকস আর ডিনারে তার আপত্তি ছিল না, আপত্তি ছিল না রাতে ট্যাক্সিতে করে ছেলেদের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছোতেও। এমন সব পাড়ায় সে গিয়ে পৌঁছোতে লাগল যেখানে সে একা-একা কখনও যেতে পারত না। আসলে এই অগুনতি পুরুষমানুষেরা নয়, মৌসুমির কাছে সবচেয়ে আকর্ষক ছিল তার নিজের এই খোলামেলা মানসিকতাই। সেই সময়কার পুরুষ-বন্ধুদের মধ্যে কেউ-কেউ বিবাহিত ছিল, কেউ ছিল হাইস্কুলে ছেলে-মেয়ের বয়স্ক বাবা। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ফরাসি বটে, কিন্তু জার্মান, পারসিক, ইতালিয়ান বা লেবানিজ়ও ছিল। কোনও কোনও দিন দুপুরে খাবার খেয়ে সে একজন পুরুষের সঙ্গে বিছানায় যেত, রাতের ডিনার শেষ করে অন্য এক পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হত। সেই পুরুষের দল তাকে পারফিউম আর গয়না উপহার দিত। একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল তখন, চোখের ইশারা করে মৌসুমি গোগোলকে বলে।

ফরাসি ব্যবসায়ীদের কথ্য ইংরেজি আর আমেরিকান্ ব্যবসায়ীদের কথ্য ফরাসি শেখানোর একটা চাকরি পেয়ে গেল সে। ফোনে বা ক্যাফেতে দেখা করে তাদের সঙ্গে পরিবার, বাড়ি, বই বা প্রিয় খাবার নিয়ে কথা বলতে হত। প্রবাসী আমেরিকানদের সঙ্গে মেলামেশা বাড়তে লাগল মৌসুমির। যার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা ঠিক হয়, তার সঙ্গে সেভাবেই আলাপ। লোকটা নিউ ইয়র্কের ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার, এক বছরের জন্য প্যারিসে ছিল। নাম গ্রাহাম। প্রেমে পড়ার পর খুব তাড়াতাড়ি মৌসুমি তার সঙ্গে থাকতে শুরু করে। গ্রাহামের সঙ্গে থাকার জন্যই সে নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হয়েছিল। ইয়র্ক অ্যাভিনিউতে দু'জনে একটা বাড়ি ভাড়াও নেয়। সেখানে

দু'জনে গোপনে থাকত, দুটো আলাদা টেলিফোন নিয়ে যাতে মৌসুমির বাবা-মা জানতে না পারেন। তাঁরা মৌসুমির কাছে এলে গ্রাহাম ঘরদোর পুরো পরিষ্কার করে কোনও হোটেলে চলে যেত, চিহ্নটিও রেখে যেত না। প্রথমদিকে পুরো ব্যাপারটাই ভারী উত্তেজক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরে আর তেমন রইল না, অসম্ভব ক্লান্তিকর মনে হত। মৌসুমি যেদিন বয়ফ্রেন্ড নিয়ে নিউ জার্সিতে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল, ভেবেছিল দারুণ ঝগড়া হবে। কিন্তু বাবা-মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। মেয়ের আমেরিকান বর নিয়ে তাঁদের কোনও অসুবিধে ছিল না। অনেক প্রবাসী বন্ধুদের ছেলে-মেয়েই আমেরিকান বিয়ে করেছে আর অর্ধেক আমেরিকান নাতি-নাতনির জন্ম দিয়েছে, তারা ফরসা, চুল কালো। ব্যাপারটা যে সে-রকম ভয়ানক, তা নয়। সুতরাং মৌসুমির বাবা-মা আমেরিকান জামাই নিয়ে বিশেষ প্রশ্ন তোলেননি। তাঁরা বাঙালি বন্ধুদের কাছে গল্প করতে লাগলেন যে, গ্রাহাম ছেলে ভাল, আইভিতে শিক্ষিত, অনেক মাইনে পায়। গ্রাহামের বাবা-মা যে ডিভোর্সি, তার বাবা যে ডিভোর্সের পর দু'বার বিয়ে করেছেন এবং তাঁর তৃতীয় স্ত্রী মৌসুমির চেয়েও বছরদশেকের ছোট— এই তথ্যগুলো তাঁরা মুখেও আনলেন না।

এক রাতে, ট্র্যাফিক জ্যামের মধ্যে ট্যাক্সিতে বসে থাকতে থাকতে ঝোঁকের মাথায় মৌসুমি গ্রাহামকে বলল তাকে বিয়ে করতে। এখন মনে হয়, ছোটবেলা থেকে সারাক্ষণ বিয়ের কথা শুনতে শুনতে তার নিজের মাথায় বিয়ে ব্যাপারটা ঢুকে গিয়ে থাকবে। গ্রাহাম রাজি হয়েছিল, ঠাকুমার হিরের আংটি উপহার দিয়েছিল মৌসুমিকে। রাজি হয়েছিল মৌসুমি আর ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে কলকাতা গিয়ে পরিবারের সকলের সঙ্গে দেখা করতে, ঠাকুমা-ঠাকুরদার কাছে আশীর্বাদ নিতে। সে মাটিতে বসে হাত দিয়ে খেতে, বড়দের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে শিখে গিয়েছিল। সকলকে মুগ্ধ করেছিল গ্রাহাম। কলকাতায় গিয়ে মৌসুমিদের দশ-বারোজন আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিল, প্লেটভরতি রসের মিষ্টি খেয়েছিল, ছাদে উঠে মৌসুমির তুতো ভাই-বোনদের পাশে হাজারখানা ছবির জন্য দাঁড়িয়েছিল। গ্রাহাম হিন্দু বিয়েতেও রাজি ছিল। তাই মৌসুমি আর মৌসুমির মা গড়িয়াহাট আর নিউ মার্কেটে ঘুরে ডজনখানেক শাড়ি, লাল ভেলভেটের বাক্সে সোনার গয়না, একটা ধুতি আর টোপর কিনে ফেলেছিল। টোপরটা মৌসুমির মা ফেরার সময় প্লেনে হাতে করে নিয়ে এসেছিলেন। ঠিক ছিল, গরমের সময় নিউ

জার্সিতে বিয়ে হবে। তার আগে এনগেজমেন্ট পার্টি দেওয়া হয়েছিল, উপহারও পাওয়া গিয়েছিল কয়েকটা। মৌসুমির মা বাঙালি বিয়ের নিয়মকানুন ইংরেজিতে লিখে আমেরিকান অতিথিদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। স্থানীয় কাগজের তরফে নবদম্পতির ছবিও তোলা হয়েছিল।

বিয়ের কয়েক সপ্তাহ আগে দু'জনে বন্ধুদের সঙ্গে খেতে বেরিয়েছিল। মদের নেশা যখন জমে উঠতে শুরু করেছে, মৌসুমি শুনতে পেল গ্রাহাম কলকাতার অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলছে। অবাক হয়ে শুনল, গ্রাহাম বলছে, কলকাতায় ওর মোটেই ভাল লাগেনি। সেখানকার সংস্কৃতি নাকি ভীষণ বদ্ধ। মৌসুমির আত্মীয়দের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া ছাড়া কিছুই করার ছিল না। শহরটা আকর্ষক, কিন্তু লোকগুলো গেঁয়ো। তারা বাড়ি থেকে বেরোয় না, মদ খায় না। "মদ ছাড়া শ্বশুরবাড়ির পঞ্চাশজন লোককে সহ্য করতে হয়েছে, ভেবে দেখো। ওর হাতটাও ধরতে পারিনি, রাস্তার লোক তাকাবে," সে বলেছিল। মৌসুমি শুনছিল, কিছুটা রেগে উঠে, কিছুটা সহানুভূতির সঙ্গে। সে নিজে পরিবার বা দেশজ সংস্কৃতির নিন্দা করে বটে কিন্তু গ্রাহামের মুখে তা শুনতে চায় না। গ্রাহাম তা হলে সকলকে ঠকিয়েছে, তাকেও? রেস্তোরাঁ থেকে বাড়ি ফেরার পথে কথাটা আবার তুলেছিল মৌসুমি। বলেছিল, কথাগুলো ভাল লাগেনি। কেন গ্রাহাম তাকে আগে বলেনি এসব? কলকাতায় কেন ভাল লাগার ভান করেছিল? তর্ক চলতে লাগল, দু'জনের মধ্যেকার দূরত্ব গভীর খাদের মতো বাড়তে লাগল, আর হঠাৎ রাগের বশে মৌসুমি গ্রাহামের ঠাকুমার হিরের আংটিটা আঙুল থেকে খুলে রাস্তার যানবাহনের নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। গ্রাহাম তখন মৌসুমির গালে সটান থাপ্পড় মেরেছিল। চারদিকের লোকজন তখন ওদের দিকেই তাকিয়ে। সেই শনিবার গ্রাহাম অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে আসে। মৌসুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। আধ বোতল ঘুমের বড়ি খেয়েছিল সে, তারপর হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হয়। তারপর এক মনোবিদের কাছে যেতে হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডভাইসারকে বলে এক সেমেস্টার ছুটি নিতে হল। শয়ে শয়ে ফোনকল করতে হল, লোকজনকে জানাতে হল বিয়ে ভেঙে গিয়েছে। শাজাহান কেটারারকে দেওয়া সিকিউরিটি ডিপোজ়িট আর হানিমুনের জন্য রিজ়ার্ভ করা প্যালেস অন হুইল্‌স-এর আগাম ভাড়া খোয়াতে হল। সোনার গয়নাগুলো ব্যাংকের ভল্টে বন্ধ হয়ে গেল, শাড়ি-সায়ার স্থান হল পোকামাকড় ঢোকে না এমন বাক্সে।

প্রথমে মৌসুমি ভেবেছিল, প্যারিসে ফিরে যাবে। কিন্তু এতদিন কোর্স করে ছেড়ে দেওয়া মুশকিল, আর তেমন অর্থবলও ছিল না। ইয়র্ক অ্যাভিনিউয়ের অ্যাপার্টমেন্টের খরচ একা চালাতে না পেরে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল কিন্তু বাড়ি ফিরে যেতেও ইচ্ছে ছিল না তার। কিছুদিন কাটল ব্রুকলিনে এক বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে। গোগোলকে বলেছে মৌসুমি, সে-সময়টা মোটেই সহজ ছিল না। মনের ওই রকম অবস্থায় প্রেমিকযুগলের সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকা, রোজ সকালে তাদের একসঙ্গে স্নান করতে দেখা, চুমু খেতে দেখা, রাতে দু'জনে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে একা থাকার শোক নতুন করে টের পাওয়া, সে বড় দুঃখের। একা থাকা তখন সহ্য হচ্ছিল না মৌসুমির। সে পার্টটাইম কাজ করতে আরম্ভ করল। ইস্ট ভিলেজে নিজের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে উঠে যাওয়ার মতো টাকা যতদিনে জমল, ততদিনে একা থাকা পছন্দ হয়ে গিয়েছে। গরমের সময় রোজই একা-একা সিনেমা দেখতে যেত সে, কখনও দিনে তিনটেও দেখত। প্রতি সপ্তাহে *টিভি গাইড* কিনে এ-মলাট থেকে ও-মলাট পড়ে ফেলত। কারণ রাতে টিভি দেখাই ছিল সময় কাটানোর একমাত্র উপায়। রান্না করাও ছেড়ে দিল সে, রায়তা আর বিস্কুট খেয়েই দিন কাটতে লাগল। সারা জীবনের মধ্যে সবচেয়ে রোগা সেই সময় হয়েছিল সে, তখন তোলা ছবিগুলোয় মৌসুমিকে চেনাই যায় না। গরমের শেষ মাসে সেলে গিয়ে এত ছোট সাইজের জামাকাপড় কিনে ফেলেছিল যে ছ'মাস বাদে সে-সব দান করে দিতে হল। হেমন্তকালের সেমেস্টারে নিজেকে পড়াশোনায় ডুবিয়ে দিল মৌসুমি, বসন্তকালে যে-সব পড়া মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছিল, সেগুলো শেষ করার দিকে মন দিল। আর মাঝে মাঝে ডেটিংও করতে লাগল। তারপর একদিন মৌসুমির মা ফোন করলেন, জিজ্ঞেস করলেন গোগোল নামে কোনও ছেলেকে মনে আছে কি না।

নয়

এক বছরের মধ্যে গোগোল আর মৌসুমির বিয়ে হয়ে গেল। অনুষ্ঠান হল নিউ জার্সিতে মৌসুমির বাড়ির কাছের একটি হোটেলে। বিরাট করে বাঙালিমতে বিয়ে করার ইচ্ছে অবশ্য বর-কনের ছিল না। তাদের মতে ঘটনাটি ঘটলে আমেরিকান বন্ধুরা যে-সব জায়গায় বিয়ে করে, তেমন কোনও জায়গা বেছে নিত তারা। যেমন ব্রুকলিন বোটানিক গার্ডেন বা মেট্রোপলিটন ক্লাব বা সেন্ট্রাল পার্কের বোট হাউস। মৌসুমি আর গোগোল চাইত বসে খাওয়ার কেতাবি ডিনার, নেপথ্যে জাজ় সংগীত, সাদা-কালো ছবি তোলা এবং সব কিছুই ছোট করে করা। কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠান বলে কথা, দু'জনেরই বাড়ির লোকেরা অন্যরকম পরিকল্পনা করল। প্রায় তিনশোজনকে নিমন্ত্রণ করা হল। খাওয়ানো হল ভারতীয় খাবার। সকলের গাড়ি যাতে সহজে দাঁড় করানো যায় তার ব্যবস্থাও করতে হল। গোগোল আর মৌসুমি দু'জনেরই মতে পারিবারিক ঝগড়া এড়িয়ে এ-সব মেনে নেওয়াই ভাল। নিজেদের মধ্যে রসিকতা করে দু'জনে বলতে লাগল, মায়েদের কথা শুনে বিয়ে করলে এ-রকমই হয়। তবে এ বিষয়ে দু'জনেরই ভাগ্য একরকম হওয়াতে সহ্য করতে সুবিধে হল। এনগেজমেন্টের কথা বাড়িতে জানানোর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। হোটেল বুকিং, মেনু সব ঠিকঠাক। রোজ রাতে মৌসুমির মা ফোন করে জানতে চাইতেন, কেমন কেক ওদের পছন্দ, ন্যাপকিনের রং কেমন হবে, কোন ওয়াইন সার্ভ করা হবে। এ-সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া গোগোল আর মৌসুমির বিশেষ কিছু করার ছিল না। তাও, সরাসরি উত্তর দেওয়ার বদলে ওরা ক্রমাগত বলে গেল, সব ঠিক আছে, পরিবারের লোকেরা যা ঠিক করবে, তাই হবে। গোগোলের সহকর্মীরা মন্তব্য করল, "তোমরা ভাগ্যবান।" বিয়ের ব্যবস্থা করা নাকি সাংঘাতিক ব্যাপার। বিয়ের পর কী হতে চলেছে, তার প্রথম পরীক্ষা সফলভাবে বিয়ের ব্যবস্থা করায়। তবু গোগোলের নিজের বিয়েতে

নিজের অবদান এত কম যে, একটু অস্বস্তি হয় বটে। অবশ্য জন্মদিন বা গ্র্যাজুয়েশন পার্টিতে গোগোলের কী বা করার ছিল? সবই তো বাবা-মা করতেন, তাঁদের বন্ধুরাই খেতে আসতেন, গোগোলের চিরকালই মনে হয়েছে যে এ-সব উৎসবের সঙ্গে তার একটু দূরত্ব থেকে যায়।

বিয়ের দিন শনিবার সুটকেস নিয়ে ভাড়া করা বাড়িতে দু'জনে নিউ জার্সিতে পৌঁছোল। হোটেলে পৌঁছে অবশ্য আর একসঙ্গে থাকা গেল না। নিজের নিজের পরিবারের সঙ্গে থাকতে হল। গোগোল শিহরনের সঙ্গে ভাবল, কাল থেকে সে আর মৌসুমি একটা নতুন পরিবার গড়ে তুলবে। হোটেলটা আগে কখনও দেখেনি সে। সবচেয়ে আকর্ষক লাগল কাচের লিফ্‌টটা, হোটেলের লবির ঠিক মাঝখানে সেটা বারবার ওঠানামা করে চলেছে। শুধু বাচ্চারা নয়, বড়রাও লিফ্‌টটা দেখে খুশি হচ্ছেন। একটা ডিম্বাকৃতি ব্যালকনির চারপাশে ঘরগুলোর দরজা। ব্যালকনিটা লবি থেকে দেখা যায়। গোগোলের জন্য একটা আলাদা ঘর ভাড়া করা হয়েছে, মা আর সোনিয়ার জন্য অন্য একটা। সেই তলাতেই গাঙ্গুলি পরিবারের খুব কাছের বন্ধুদের জন্য কয়েকটা ঘর নেওয়া হয়েছে। মৌসুমিকে খুব পবিত্রভাবে গোগোলের উপরের তলায় আলাদা একটা ঘরে রাখা হয়েছে। ওর বাবা-মার ঠিক পাশে, যদিও ওরা দু'জনে এখন মৌসুমির ফ্ল্যাটে একসঙ্গেই থাকে। গোগোলের বিয়েতে পরার পোশাক মা সঙ্গে এনেছে। একটা কোরা পাঞ্জাবি যেটা একসময়ে গোগোলের বাবার ছিল, আগে থাকতে প্লিট করা দড়ি লাগানো ধুতি আর নাগরাই চটি। বাবা অবশ্য কোনওদিন পাঞ্জাবিটা পরেনি। এতদিন ভাঁজ করা অবস্থায় ছিল বলে ভাঁজের দাগ বসে গিয়েছে। গোগোল বাথরুমে গরমজল চালিয়ে পাঞ্জাবিটা ঝুলিয়ে রাখল যাতে ভাঁজের দাগ চলে যায়। গোগোলের মা ছেলের মাথায় আশীর্বাদের হাত রেখে বললেন, "বাবা সবসময় তোমার সঙ্গে আছেন।" বাবার মৃত্যুর পর এই প্রথম মা যত্ন করে পোশাক পরেছে। খুব সুন্দর হালকা সবুজ একটা শাড়ি, মুক্তোর নেকলেস। সোনিয়া অল্প করে লিপস্টিকও লাগিয়ে দিয়েছে। মা বারবার আয়নায় লিপস্টিক দেখছে আর চিন্তিত গলায় বলছে, "বেশি হয়ে যাচ্ছে না তো?" গোগোল বেশ কিছুদিন মাকে এত খুশি-খুশি দেখেনি। সোনিয়াও আজ শাড়ি পরেছে। গোলাপি শাড়িতে রুপোলি এমব্রয়ডারি, চুলে একটা গোলাপ। সে গোগোলকে কাপড়ে মোড়া একটা বাক্স দিল।

"এটা কী?" গোগোল জিজ্ঞেস করল।

"আমি তোমার তিরিশতম জন্মদিন ভুলে যাইনি, দাদা।"

সত্যিই গোগোল কয়েকদিন আগে তিরিশে পড়েছে। সপ্তাহের মধ্যে দিন পড়ায় মৌসুমি বা সে কেউই জন্মদিন পালন করার সময় পায়নি। বিয়ের কাজে ব্যস্ত থাকায় মা অন্যবারের মতো সকালে ফোন করতে ভুলে গিয়েছিল।

গোগোল উপহারটা নিতে নিতে বলল, "এই বয়সে আবার জন্মদিন হয় নাকি? এখন এ-সব ভুলে যাওয়াই ভাল।"

সোনিয়া শুধু বলল, "বেচারা গগল্‌স।"

বাক্সটার ভিতরে একটা পারফিউমের বোতল আর একটা লাল চামড়ার ফ্লাস্ক। সোনিয়া বলল, "আমি ফ্লাস্কটায় নাম লিখিয়ে দিয়েছি।" ফ্লাস্কটার নীচের দিকে 'এন জি' লেখা রয়েছে। গোগোলের মনে পড়ল সেই দিনটার কথা। যেদিন গোগোল সোনিয়ার ঘরে মুখ বাড়িয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, সে নাম পালটে গোগোল থেকে নিখিল হতে যাচ্ছে। সোনিয়ার বয়স তখন তেরো হবে, বিছানায় বসে হোমওয়ার্ক করছিল। গোগোলের কথা শুনে সে মাথা নেড়ে না বলেছিল, বলেছিল, "দুর, তাই কখনও হয় নাকি!"

"কেন?" গোগোল জিজ্ঞেস করেছিল।

"হয় না, কারণ হতেই পারে না। তুমি তো গোগোল।"

গোগোল এখন সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। সে এখন মেকআপ করছে। চোখের পাশের ত্বক টেনে ধরে চোখের পাতায় কালো লাইনারের সরু রেখা টানছে। হঠাৎ গোগোলের নিজের মায়ের বিয়ের ছবিগুলো মনে পড়ে গেল। সে সোনিয়াকে বলল, "এবার তোর পালা কিন্তু।"

"আমাকে মনে করিয়ে দিস না।" সোনিয়া মুখ ভ্যাংচাল, তারপর হেসে উঠল। এই যে একসঙ্গে ব্যস্ত থাকা, উত্তেজনা অনুভব করা, এগুলো গোগোলকে বিমর্ষ করে তুলছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে, বাবা আর নেই। বাবা পুজোর সময় ঠিক আজকের মতো করে সাজত, এই রকম পাঞ্জাবি পরে কাঁধে একটা শাল নিত। "এই পোশাকে আমাকে নিশ্চয়ই বোকা-বোকা দেখাচ্ছে," সে ভাবে, "বাবার মতো সুন্দর লাগছে না নিশ্চয়ই।" নাগরা চটিজোড়া একটু বড় হয়েছে। ভিতরে কাগজ ঢুকিয়ে তারপর পরেছে গোগোল। মৌসুমি পেশাদার মেকআপ শিল্পীর কাছে সাজছে, চুল বাঁধছে। গোগোলের তৈরি হতে মোটেই সময় লাগল না। কেন' যে দৌড়োনোর

জুতোজোড়া সঙ্গে আনেনি! বিয়ে করতে যাওয়ার আগে ট্রেডমিলে কয়েকমাইল দৌড়ে নেওয়া যেত।

চাদর দিয়ে ঢাকা একটা মঞ্চের উপর ঘণ্টাখানেক ধরে হিন্দুমতে বিয়ের অনুষ্ঠান হল। তাও আসল অনুষ্ঠানের চেয়ে ছোট করে। গোগোল আর মৌসুমি বাবু হয়ে মাটিতে বসল, প্রথমে মুখোমুখি তারপর পাশাপাশি। অতিথিরা সামনে লোহার ফোল্ডিং চেয়ারে বসে। দু'টো ছোট ব্যাঙ্কোয়েট হলের মধ্যেকার কৃত্রিম দেওয়াল তুলে দিয়ে ঘরটাকে বড় করা হয়েছে। একটা ভিডিয়ো ক্যামেরা আর তীব্র আলো চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বক্সে সানাইয়ের সিডি বেজে চলেছে। কী হচ্ছে, না হচ্ছে তা গোগোল বা মৌসুমিকে কেউ বুঝিয়ে বলেনি। বর-কনের চারদিকে মাসি ও মেসোদের ভিড়। তাঁরাই ক্রমাগত নির্দেশ দিয়ে চলেছেন, কখন কী বলতে হবে, কখন দাঁড়াতে হবে, আর কখন তামার পাত্রে ফুল ছুড়ে দিতে হবে। পুরোহিতমশাই মৌসুমির বাবার বন্ধু। তিনি আসলে অ্যানাস্থেসিস্ট, যিনি ভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণও বটে। সামনে রাখা গোগোলের বাবা ও দু'জনের দাদু-ঠাকুমার ছবিতে শ্রদ্ধা জানানো হল। হোটেল ম্যানেজমেন্টের আপত্তির জন্য আগুন জ্বালানো যায়নি। সাজিয়ে রাখা কাঠের উপর আগুন ছাড়াই খই ছড়াতে হয়েছে। গোগোলের মনে পড়ল বাবা-মার যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন তাঁরা পরস্পরের পুরোপুরি অচেনা ছিলেন। এখন, মৌসুমির পাশে বসে, গোগোল বুঝতে পারল ব্যাপারটা কত কঠিন। বাবা আর মায়ের সাহস এবং বাধ্যতার প্রশংসা না করে পারল না সে।

এই প্রথমবার গোগোল মৌসুমিকে শাড়িপরা অবস্থায় দেখছে। অবশ্য বহু আগে পুজোর অনুষ্ঠানে দেখে থাকবে। প্রায় কুড়ি পাউন্ড ওজনের সোনার গয়না মৌসুমির সারা গায়ে। চেক-চেক লাল কাপড়ের নীচে মৌসুমির হাত ছুঁয়ে বসে থাকার সময় গোগোল গুনেছে, ওর গলায় এগারোটা সোনার হার। ওর গালে বড় বড় লাল-সাদা কলকা আঁকা রয়েছে। এতদিন ওর বাবা-মাকে সুবীরমেসো আর রিনামাসি বলে ডেকে এসেছে গোগোল। সেই সূত্রে মৌসুমি এতদিন ওর দূর সম্পর্কের তুতো বোন হত। কিন্তু আজ রাত শেষ হতে-না-হতে ওঁরা দু'জন গোগোলের শ্বশুর-শাশুড়ি হয়ে যাবেন। বাবা-মা বলে ডাকতে হবে।

রিসেপশনের জন্য গোগোল ধুতি ছেড়ে সুট পরে ফেলল। মৌসুমি পরেছে স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপওয়ালা বেনারসি কাপড়ের গাউন। এই পোশাকটা

মৌসুমি নিজে ডিজ়াইন করেছে, তারপর এক দর্জি বন্ধুকে দিয়ে বানিয়েছে। মৌসুমির মা অবশ্য গাউন পরা নিয়ে খুব আপত্তি করেছিলেন। শাড়ি না পরলে সালোয়ার-কামিজে আপত্তি কোথায়? রিসেপশন পার্টিতে মৌসুমি একবার গায়ের শালটা ভুলে চেয়ারের উপর ফেলে অন্য জায়গায় চলে গেল। শ্যামলা রঙের খোলা কাঁধে গ্লিটার পাউডার চকচক করে উঠল। মৌসুমির মা কটমট করে মেয়ের দিকে তাকালেন। মৌসুমি অবশ্য তাঁকে পাত্তাও দিল না। কত লোক যে গোগোলকে অভিনন্দন জানাতে এল! সকলেই বলল, খুব ছোটবেলায় গোগোলকে চিনত। ফোটো তোলার জন্য বারবার পোজ় দিতে হল, অনেককে জড়িয়ে ধরতে হল। বেশ কয়েকঘণ্টা ধরে ক্রমাগত হেসে যেতে হল। পুরো সময়টা গোগোল নেশার ঘোরে কাটিয়ে দিল, মৌসুমির বাবা-মার খুলে দেওয়া বারের কল্যাণে। ব্যাঙ্কোয়েট রুমে টেবিলগুলো খুব সাজানো হয়েছে। সন্ধ্যায় একবার বাথরুমে যাওয়ার পথে মৌসুমির সঙ্গে দেখা হল গোগোলের। চট করে ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াল সে। টের পেল মৌসুমির নিশ্বাসে পেপারমিন্ট চাপা সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ। বুঝল, টয়লেটে বসে মৌসুমি সিগারেট খেয়েছে। সন্ধে থেকে পরস্পরের সঙ্গে কথাও বলতে পারেনি তারা। অনুষ্ঠান চলার সময় মৌসুমি মাথা নিচু করে বসেছিল। রিসেপশনে যতবারই দেখা হয়েছে, অচেনা লোকজনের সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ ওকে একা পেতে ইচ্ছে হল গোগোলের। ছোট্ট ছেলের মতো পার্টি ছেড়ে ওর হাত ধরে উপরের কোনও ঘরে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করল। "চলো না, পনেরো মিনিট। কেউ খেয়াল করবে না", গোগোল চুপিচুপি মৌসুমিকে কাচের লিফ্‌টটা দেখাল। কিন্তু ডিনার শুরু হয়ে গিয়েছে। লাউড স্পিকারে টেবিল নম্বর আর নাম ঘোষণা করা হচ্ছে। মৌসুমি বলল, "দাঁড়াও, আমার চুলটা ঠিক করতে হবে।" আমেরিকান অতিথিদের জন্য হিটারের উপর রুপোর বাসনে খাবার দেওয়া হয়েছে। তন্দুরি চিকেন, কমলা ঝোলের মধ্যে আলু আর ফুলকপি। প্লেট হাতে লাইনে দাঁড়িয়ে কেউ বলল, কড়াইশুঁটি নষ্ট হয়ে গেছে। গোগোল আর মৌসুমি হলঘরের ঠিক মাঝখানের টেবিলটাতে বসেছে, সঙ্গে গোগোলের মা, সোনিয়া, মৌসুমির মা-বাবা আর কলকাতা থেকে আসা কয়েকজন নিকটাত্মীয়। অবশ্য মৌসুমির ভাই সম্রাটও রয়েছে। এই বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্য সে শিকাগো ইউনিভার্সিটির ওরিয়েন্টেশনে যেতে পারেনি। খুব অস্বস্তির মধ্যে দিয়ে শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলে ওদের অভিনন্দন জানাল বাড়ির

লোকেরা। পরিবারের সকলে আর কাছের বন্ধুরা বক্তৃতা দিল। মৌসুমির বাবা শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলে বললেন, "আপনাদের এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ।" তারপর গোগোল-মৌসুমির দিকে ফিরে বললেন, "ভাল থেকো তা হলে।" শ্যাম্পেনের গ্লাসে কাঁটাচামচ ঠোকার আওয়াজ এল। মাসি-মেসোরা বলতে লাগলেন কখন চুমু খাওয়া উচিত। সকলকে খুশি করে গোগোল কয়েকবার লাজুকভাবে মৌসুমির গালে ঠোঁট ছোঁয়াল।

বিরাট বড় একটা কেক ঠেলাগাড়িতে করে ঘরে আনা হল, তার উপরে লেখা 'নিখিল ওয়েড্‌স মৌসুমি'। মৌসুমি ফোটো তোলার সময় বাঁদিকে মাথা হেলিয়ে যেমন হাসে, ঠিক তেমনভাবে হাসল। গোগোল জানে, এখানে উপস্থিত অনেকেই এই বিয়েতে এসে খুব খুশি কারণ বর-কনে দু'জনেই বাঙালি। এখানকার বাঙালিদের অবচেতনের ইচ্ছেকে তারা পূর্ণ করছে। অবাক লাগে ভাবতে, দু'বছর আগে এই অতিথিরাই দেখতে পেত মৌসুমির সঙ্গে অন্য এক পুরুষের বিয়ে হচ্ছে। হঠাৎ সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে পড়ে গেলে যেমন হয়, তেমনই মনে হল গোগোলের। তবু নিজেকে সামাল দিল সে। আজ তো মৌসুমি তারই স্ত্রী। লাল বেনারসি শাড়ি আর সোনার গয়নাগুলো কিন্তু গ্রাহামের সঙ্গে বিয়ে উপলক্ষেই কেনা হয়েছিল। এবার শুধু পুরনো জিনিসগুলোকে বাক্স থেকে বের করে আনা হয়েছে। সম্ভবত আজকের মেনুটিও সেবারেই ঠিক করা হয়েছিল। শুধু নতুন করে অর্ডার দিতে হয়েছে। দু'বছরের পুরনো জিনিসের ছড়াছড়ি। শুধু অসীমা আর গোগোলের তরফে ছাপানো নিমন্ত্রণপত্রটাই যা নতুন।

বিয়ের ঠিক পরেই তিনদিন মৌসুমিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিতে হবে। তাই মধুচন্দ্রিমা পিছিয়ে দেওয়া হল। একদিন অবশ্য হোটেলে তারা একসঙ্গে থাকতে পেল। কিন্তু হোটেলে থাকতে কার ইচ্ছে করে? যাই হোক, অনেক খরচ করে মৌসুমির বাবা-মা এই নববিবাহিতদের সুইটটি ভাড়া করেছেন। তাই সেখানে থাকতেই হল। ওরা একা হওয়ামাত্র মৌসুমি বলল, "আমি স্নান করতে যাচ্ছি।" বলেই বাথরুমে ঢুকে গেল। গোগোল জানে, মৌসুমি ক্লান্ত। দু'জনেই সারারাত নাচানাচি করেছে, গোগোল নিজেও ক্লান্ত। সে একা-একা ঘরটা ঘুরে দেখতে লাগল, ড্রয়ার টেনে খুলে দেখল, কাগজপত্র দেখল, মিনিবার খুলে দেখে নিল, রুম সার্ভিসের মেনুটা আগাপাশতলা পড়ল, যদিও একেবারেই খিদে পাচ্ছিল না। বরং বেশ কিছুটা হুইস্কি আর দু'টুকরো কেক খেয়ে গা গোলাচ্ছিল। সেভাবে তো ডিনারও খাওয়া হয়নি। বিশাল খাটে শুয়ে

পড়ল গোগোল। বেডকভারের উপরে প্রচুর ফুলের পাপড়ি ছড়ানো, হোটেল ছেড়ে যাওয়ার আগে বাড়ির লোকেরাই এ-সব করে গেছে। টিভি চালিয়ে চ্যানেল সার্ফিং করতে করতে মৌসুমির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল গোগোল। খাটের পাশের টেবিলে রুপোর বালতিতে এক বোতল শ্যাম্পেন আর পানপাতার আকৃতির একপ্লেট চকোলেট, লেসের ঢাকনি দিয়ে ঢাকা। গোগোল অন্যমনস্কভাবে একটা চকোলেট তুলে কামড় দিল। চকোলেটের নরম আস্তরণের ভিতরে বেশ শক্ত একটা টফি। কষ্ট করে কামড়ে খেতে হবে।

কেক কাটার পরে মৌসুমি যে সোনার আংটিটা পরিয়ে দিয়েছিল, সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল গোগোল। ঠিক এ-রকমই একটা আংটি মৌসুমিকেও গোগোল পরিয়ে দিয়েছে। মৌসুমির জন্মদিনে গোগোল বিয়ের প্রস্তাবটা দিয়েছিল। দ্বিতীয় দিন দেখা করার পর যে টুপিটা কিনেছিল, সেটা তো বটেই, একটা হিরের আংটিও মৌসুমিকে উপহার দিয়েছিল। জন্মদিন উপলক্ষে গ্রামের একটা সরাইখানায় মৌসুমিকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল। সেটাই প্রথমবার দু'জনের দূরে বেড়াতে যাওয়া। তখন বসন্ত সবে শুরু হয়েছে, ভেলভেটের টুপিটা আউট অফ ফ্যাশন। তবু মৌসুমি খুশি হয়েছিল, গোগোল এতদিন মনে রেখেছে দেখে অবাক হয়েছিল, "এতদিন দোকানে টুপিটা ছিল?" গোগোল অবশ্য বলেনি যে, সেদিনই টুপিটা কিনে ফেলেছিল সে। রাতে খাবার সময় ওয়াইনের বোতল খোলার পর টুপিটা উপহার দিয়েছিল, মৌসুমির মাথায় সেটা দেখে অনেকেই ফিরে তাকিয়েছে। টুপিটা খুলে চেয়ারের উপর রাখার সময় রঙিন কাগজের মধ্যে হিরের আংটির বাক্সটা লক্ষই করেনি মৌসুমি। গোগোলই বলল, "ওখানে আরও একটা জিনিস রয়েছে, দেখো।"

হয়তো বিয়ের প্রস্তাব শুনে মৌসুমি বেশ হকচকিয়ে থাকবে। তবে টুপিটা দেখে যতটা চমকেছিল, বিয়ের প্রস্তাবে ততটা নয়। বিয়ের ব্যাপারটা প্রত্যাশিত ছিল। টুপিটা ছিল অপ্রত্যাশিত। ওরা যেন মনে-মনে জানত, পরস্পরকে পছন্দ করলে সম্পর্কটা বিয়ের দিকে গড়াবেই। দুই পরিবারেরও সেটাই প্রত্যাশা ছিল। সে-কারণেই আংটির বাক্সটা দেখে দেরি করেনি মৌসুমি। চোখ তুলে, হেসে গোগোলকে বলেছিল, "হ্যাঁ"।

সাদা রঙের বাথরোব পরে মৌসুমি বাথরুম থেকে বেরোল। গয়না খুলে ফেলেছে, মেকআপ তুলে ফেলেছে। সিঁদুরদানের সিঁদুরও সিঁথি থেকে শ্যাম্পু দিয়ে ঘষে তোলা হয়ে গেছে। তিন ইঞ্চি হিলের চটিটা আর পায়ে নেই। এমন

সাজগোজহীন মৌসুমিকেই ভাল লাগে গোগোলের। এভাবে মেকআপ ছাড়া একমাত্র গোগোল ছাড়া কারও সামনে যায় না মৌসুমি। খাটের উপর বসে মৌসুমি নীল টিউব থেকে পায়ে ক্রিম মাখতে লাগল। সে একবার এভাবেই গোগোলের পায়ে ক্রিম ম্যাসাজ করে দিয়েছিল। যেদিন ব্রুকলিন ব্রিজের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঠান্ডায় জমে গিয়েছিল গোগোলের পা। পা ম্যাসাজ করা শেষ করে মৌসুমি বালিশে মাথা দিয়ে সটান শুয়ে পড়ল। একটা হাত বাড়িয়ে দিল গোগোলের দিকে। গোগোল ভেবেছিল, সাদা বাথরোবের নীচে কালো লেসের অন্তর্বাস থাকবে, নিউ ইয়র্কে তেমন কিছু গোগোলের চোখে পড়েছিল। কিন্তু এখন মৌসুমি সম্পূর্ণ নগ্ন, তার সদ্যস্নাত ত্বকে বুনো ফলের গন্ধ। গোগোল মুখ নামিয়ে তার হাতের কালো রোমে চুমু খেল, উঁচু গলার হাড়ে ঠোঁট ছোঁয়াল। একবার মৌসুমি বলেছিল, গলার এই অংশটাই তার সবচেয়ে প্রিয় অংশ। ক্লান্তি সত্ত্বেও তারা মিলিত হল। মৌসুমির ভেজা চুল শীতল পরদার মতো গোগোলের মুখে লাগল। বিছানায় ছড়িয়ে থাকা গোলাপের পাপড়ি দু'জনের কনুইয়ে, কাঁধে, পায়ের ডিমে লেগে রইল। গোগোল মৌসুমির শরীরে মুখ ডুবিয়ে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিল, তখনও যেন বিশ্বাস করা কঠিন যে তারা স্বামী-স্ত্রী। কখন এই সত্য পুরোপুরি বোঝা যাবে? সেই মুহূর্তেও গোগোল যে মৌসুমির সঙ্গে একা হতে পারছিল না। তার অর্ধেক চেতনা জাগরূক এই চিন্তায় যে, এখনই কেউ দরজায় টোকা মেরে তাদের বলে দেবে, কীভাবে কী করতে হয়। সে-রাতের মতো নিজের করে সে মৌসুমিকে কখনও চায়নি। তবু যখন মিলনক্লান্ত দুটি দেহ আলগা হয়ে পাশাপাশি পড়ে রইল, তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল গোগোল। সব কর্তব্য সম্পূর্ণ হয়েছে। সকলের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে তারা। এবার বিশ্রাম করা যায়।

তারপর শ্যাম্পেনের বোতল খুলে দুজনে খাটে বসে রইল, এক ব্যাগভরতি কার্ড আর ব্যক্তিগত চেক খুলে দেখতে লাগল। দু'জনের বাবা-মায়ের অগুনতি বন্ধুরা অনেকেই চেক দিয়েছেন। মৌসুমি উপহার নিতে চায়নি, গোগোলকে বলেছে, জীবনে দ্বিতীয়বার বিয়ের উপহার নেওয়া থেকে সে মুক্তি পেতে চায়। গোগোলেরও কোনও আপত্তি ছিল না। ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে গুচ্ছের ফুলদানি, প্লেট আর বাসনপত্র রাখার জায়গাই বা কোথায়। সঙ্গে ক্যালকুলেটর না থাকায় হোটেলের প্যাডের কাগজে টাকার অঙ্ক যোগ করে দেখল তারা। বেশিরভাগ চেকই মি. অ্যান্ড মিসেস নিখিল অ্যান্ড মৌসুমি গাঙ্গুলির নামে। কয়েকটা আবার গোগোল ও মৌসুমি

গাঙ্গুলির নামেও। যোগ শেষ করে গোগোল বলল, "সাত হাজার পঁয়ত্রিশ ডলার।"

"নট ব্যাড, মি. গাঙ্গুলি।"

"আমরা জমিয়ে দিয়েছি, মিসেস গাঙ্গুলি।"

অবশ্য মৌসুমি মিসেস গাঙ্গুলি নয়। সে মজুমদার পদবিটা বিয়ের পরেও রেখে দিয়েছে। হাইফেন দিয়ে গাঙ্গুলি যোগ করেনি। মজুমদার পদবিটা এমনিতেই যথেষ্ট বড়। তার সঙ্গে গাঙ্গুলি লাগালে খামের উপর আঁটবে না। তা ছাড়া এখন মৌসুমি মজুমদার নামে অনেক অ্যাকাডেমিক লেখা বেরোতে শুরু করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই নাম দিয়ে প্রবন্ধ লেখে মৌসুমি। গোগোল এতে কিছুই বলেনি, কিন্তু আশা করেছিল যেদিন ওরা বিয়ের লাইসেন্সের ফর্ম ভরবে, সেদিন মৌসুমি মত পালটাবে। আর কিছু না হোক, গোগোলের মৃত বাবার সম্মানের জন্য। কিন্তু মজুমদারের বদলে গাঙ্গুলি লেখার ব্যাপারটা কোনওদিন মৌসুমির মাথাতেই আসেনি। ভারত থেকে 'মিসেস মৌসুমি গাঙ্গুলি' লেখা চিঠি এলে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

* * *

উপহারে পাওয়া টাকাটা দিয়ে এক বেডরুমের একটা ফ্ল্যাট বুক করা হল। দামটা অবশ্য ওদের ক্ষমতার সামান্য বাইরে। কিন্তু মেরুন ছাত, দরজায় পাহারাদার আর হলদেটে রঙের টাইল বসানো লবি দেখে লোভ সামলানো গেল না। ফ্ল্যাটটা ছোট হলেও খুব যত্ন করে বানানো। দামি কাঠের মেঝে, ছাত পর্যন্ত উঠে গেছে মেহগনি কাঠের তৈরি বইয়ের তাক। লিভিং রুমে স্কাইলাইট আছে। রান্নাঘরে দামি স্টিলের ফিটিং, বাথরুমে মার্বেল। শোবার ঘরের লাগোয়া ঝুলন্ত ব্যালকনি। শোবার ঘরের এক কোনায় মৌসুমি নিজের কম্পিউটার, ডেস্ক আর প্রিন্টার বসিয়েছে। ওরা বাড়িটার সবচেয়ে উঁচু তলায়। বাথরুমের জানালা দিয়ে অনেকটা ঝুঁকে বাঁদিকে তাকালে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং দেখা যায়। কয়েক সপ্তাহ ধরে ওরা বাড়ি সাজাল। নকল জাপানি আলো, কালো সোফা, কার্পেট, প্ল্যাটফর্ম বিছানা। মৌসুমির বাবা-মা আর গোগোলের মা সবাই বাড়ি দেখতে এসে অবাক হয়ে গেলেন। এত ছোট বাড়ি নেবার দরকার ছিল কি? এখন বিয়ে হয়েছে, সংসার বাড়বে। কিন্তু গোগোল আর মৌসুমি এখন বাচ্চার কথা মোটেই ভাবছে না। অন্তত মৌসুমির রিসার্চ

শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছে। শনিবার করে তারা ইউনিয়ন স্কোয়্যারে খাবার কিনতে যায়। ক্যানভাস ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ফেরে। এমন সব জিনিস কিনে ফেলে যেগুলো ওরা রাঁধতে জানে না। বিয়েতে পাওয়া রান্নার বই খুলে দেখতে হয়। কখনও রান্না করতে গিয়ে ফায়ার অ্যালার্ম চালু হয়ে যায়। তখন ঝাঁটার হাতল দিয়ে সেটাকে মেরে বন্ধ করতে হয়।

মাঝে মাঝে পার্টি হয়। এমন সব পার্টি যা ওদের বাবা-মায়েরা দেখেনি। স্টিলের পাত্রে মার্টিনি মেশাতে হয়। গোগোলের সহকর্মীরা বা মৌসুমির বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা আসে। পাঁউরুটি সালামি আর চিজ খেতে দেওয়া হয়। গোগোল নিজের অ্যাকাউন্টের সব ডলার মৌসুমির অ্যাকাউন্টে জমা দিয়েছে। এখন হালকা সবুজ চেক বই পেয়েছে ওরা, চেকের উপর দু'জনেরই নাম ছাপানো। এ টি এম কার্ডের জন্য যে-পাসওয়ার্ড ঠিক করল ওরা সেটা প্রথম দেখা হওয়ার দিন যে-রেস্টুরেন্টে খেয়েছিল তার নাম, লুলু। কফি-টেবিল বা কিচেন-কাউন্টার পাশাপাশি বলে থালা নিয়ে ওরা রাতের খাবার খায়, সামনে টিভি চলে। বাঙালি খাবার খুব কমই রান্না হয়। বেশিরভাগ দিনই পাস্তা কিংবা সেদ্ধ মাছ বা থাই রেস্তোরাঁ থেকে বাড়িতে আনা খাবার। কিন্তু কোনও কোনও রবিবার ভারতীয় খাবারের জন্য প্রাণ আনচান করে ওঠে। যে-খাবার খেয়ে ওরা বড় হয়েছে, তা খেতে ইচ্ছে হয়। দু'জনে ট্রেনে করে কুইনসে যায়। জ্যাকসন ডাইনার বলে একটা দোকানে তন্দুরি চিকেন, পাকোড়া আর কাবাব পেটভরে খায়। তারপর বাসমতি চাল আর নানারকম মশলা কিনে বাড়ি ফেরে। কিংবা খুব ছোট বাংলাদেশি চায়ের দোকানে ঢোকে। কাগজের কাপে দুধ দেওয়া মিষ্টি চা খায়। খাবার এনে দেওয়ার মেয়েটিকে বাংলায় বলে, মিষ্টি দই আর হালিম এনে দিতে। অফিস থেকে বেরোনোর আগে গোগোল রোজ ফোন করে মৌসুমিকে বলে, সে আসছে। জিজ্ঞেস করে বাঁধাকপি বা পাউরুটি কিনে আনতে হবে কি না। রাতের খাবার খেয়ে টিভির সামনে বসে মৌসুমি যাঁরা চেক দিয়েছিলেন তাঁদের থ্যাংক ইউ নোট লেখে। এগুলোই গোগোলের বিবাহিত জীবনের চিহ্ন। এ ছাড়া সবই আগের মতো। শুধু এখন চব্বিশ ঘণ্টাই দু'জনে একসঙ্গে। রাতে ঘুমোতে ঘুমোতে গোগোল মৌসুমির গায়ে গড়িয়ে পড়ে। মৌসুমি সকালে ওঠে মাথার উপর বালিশ চাপা দিয়ে।

মাঝে মাঝে গ্রাহামের চিহ্নও খুঁজে পায় গোগোল। মৌসুমির আগের জীবনের ধ্বংসস্তূপ। ওদের দুজনের নামলেখা কবিতার বই। ডিকশনারিতে

গুঁজে রাখা একটা পোস্টকার্ড। গ্রাহাম আর মৌসুমির গোপন অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা লেখা কোনও চিঠি। একদিন আর থাকতে না পেরে গোগোল গোপন ঠিকানাটা খুঁজে খুঁজে সেখানে হাজির হয়েছিল। কেমন ছিল মৌসুমির তখনকার জীবন? কল্পনা করল অন্য একজনের প্রেমিকা মৌসুমি, মুদির দোকান সেরে ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে ঘরে ফিরছে। অবশ্য হিংসে হয় না গোগোলের। শুধু মনে হয়, সে নিজে কি মৌসুমির কোনও পরাজয়ের প্রতীক? সবসময় নয়, কখনও কখনও সে এ-সব ভাবে। মাকড়সার জালের মতো ভাবনাগুলো তাকে ঘিরে ধরে। তাদের বিবাহিত জীবনের ফ্ল্যাটটায় ফিরে সান্ত্বনা খোঁজে। বিয়ের সময় তোলা যুগল ছবিতে আশ্রয় খোঁজে। শোবার ঘরে ঢুকে মৌসুমির কাঁধে চুমু খায়, তাকে টেনে বিছানায় নিয়ে যায়। কিন্তু ওদের আলমারিতে একটা সাদা গাউন রয়েছে। গোগোল জানে গ্রাহামের সঙ্গে ভারতীয় মতে বিয়ে হয়ে যাওয়ার একমাস পরে খ্রিস্টান বিয়ের সময় মৌসুমির সেটা পরার কথা ছিল। সেই বিয়েটা পেনসিলভিনিয়াতে গ্রাহামের বাবার বাড়ির লনে হওয়ার কথা ছিল। জামাটা একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ঢোকানো। তবু একটা কোনা বেরিয়ে থাকে। একবার ব্যাগের চেনটা খুলে জামাটা দেখেছিল গোগোল। জামাটা হাঁটু পর্যন্ত, গোল গলা। অনেকটা টেনিস-ফ্রকের মতো। একদিন মৌসুমিকে জিজ্ঞেসই করে ফেলল, "এটা এখনও রেখে দিয়েছ কেন?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে মৌসুমি বলল, "ও, ওটা? ওটাতে রং করাব ভাবছিলাম।"

মার্চ মাসে দু'জনে প্যারিসে বেড়াতে গেল। মৌসুমি সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা পেপার পড়বে। সেই উপলক্ষে ছুটি কাটানোও হয়ে যাবে। গোগোল এক সপ্তাহ ছুটি নিল। হোটেলে না থেকে মৌসুমির বন্ধুর অ্যাপার্টমেন্টে থাকল ওরা। বন্ধুটির নাম ইমানুয়েল, সে সাংবাদিক, গ্রিসে বেড়াতে গিয়েছে। অ্যাপার্টমেন্টটা বড্ড ঠান্ডা। ছোট্ট, সাততলার উপরে। বাথরুমটার আয়তন ফোনবুথের মতো। খুব উঁচু একটা খাট, প্রায় ছাতের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। নড়াচড়াই মুশকিল, সেক্স তো দূরস্থান। ছোট্ট রান্নাঘরের কাউন্টারে একটা কফিমেশিন প্রায় সবটা জুড়ে রয়েছে। ডাইনিং টেবিলের দু'টো চেয়ার ছাড়া বসার জায়গা নেই। ফ্রান্সের আবহাওয়াও ভাল লাগল না। সূর্য দেখা যায় না, গুমোট হয়ে রয়েছে, যেন চারদিক নিরানন্দ।

মৌসুমি বলল প্যারিসে নাকি এ-রকমটাই থাকে। রাস্তায় বেরোলে গোগোলের নিজেকে অদৃশ্য মনে হয়। পুরুষেরা সবাই খোলাখুলি মৌসুমির দিকে তাকিয়ে থাকে। গোগোল যে পাশে আছে, সেটা কেউ খেয়ালই করে না।

এই প্রথমবার গোগোল ইউরোপে এসেছে। যে-ধরনের আর্কিটেকচার সম্পর্কে সে এতকাল বইয়ে পড়ে এসেছে, তা দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মৌসুমি সঙ্গে থাকায় উত্তেজনার চেয়ে অস্বস্তি আর অপরাধবোধ বেশি হচ্ছে গোগোলের। একদিন একসঙ্গে শার্ত্র দেখতে গেল ওরা, আর একদিন ভার্সাই। কিন্তু গোগোলের কেমন যেন মনে হয়, মৌসুমি পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে বসে কফি খেতে পারলে বেশি আনন্দ পেত। হয়তো মৌসুমি বিশেষ কোনও সেমিনারে যেতে চায়, প্রিয় বিস্ত্রোগুলোতে খেতে চায় বা শপিং করতে চায়। এখানে প্রথম থেকেই তার কোনও কাজ নেই। মৌসুমিই সব কথা বলে, সব সিদ্ধান্ত নেয়। লাঞ্চ খেতে রেস্তোরাঁয় গিয়ে, বেল্ট-টাই-কাগজ বা কলম কিনতে দোকানে ঢুকে সে চুপ করেই থাকে। এক বৃষ্টির দিনে বেড়াতে বেরিয়ে তাকে চুপ করেই থাকতে হয়। মৌসুমির ফরাসি বন্ধুদের সঙ্গে খেতে বেরিয়েও তাকে চুপ করেই থাকতে হয়। সে বুঝতে চেষ্টা করে কী নিয়ে কথা হচ্ছে। ইউরো, মনিকা লিউনস্কি, নতুন শতাব্দী? কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই ধোঁয়াটে, ওদের কথার সঙ্গে প্লেটের শব্দের কোনও তফাত করা যায় না। কাছে ঝোলানো আয়নায় দেখতে পায়, বন্ধুদের মাথাগুলো একসঙ্গে ঝুঁকে পড়েছে।

গোগোল ভাবে, এ তো ভাল কথা, প্রথমবার সে প্যারিসে এসেছে এমন একজনের সঙ্গে যে শহরটাকে এত ভাল করে চেনে! আর অন্য একটা মন বলে, পর্যটকদের মতো এলেই হয়তো ভাল হত। গাইডবই হাতে নিয়ে হাতড়ে হাতড়ে শহরটায় ঘোরা, ফরাসি ভাষা শেখার বই নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করা, হারিয়ে যাওয়া, তাই কি ভাল নয়? এক রাতে বাড়ি ফেরার সময় এই গোপন ইচ্ছেটার কথা মৌসুমিকে খুলেই বলল। মৌসুমি অবাক, “আমাকে আগে বলোনি কেন?” পরদিন গোগোলকে সব বুঝিয়ে দিল সে। মেট্রো স্টেশনে গিয়ে ফোটো তোলাতে হবে, তারপর কার্ত ওরঁজের জন্য আবেদন করতে হবে। সুতরাং পরদিন থেকে গোগোল একাই প্যারিসে বেড়াতে বেরোল। মৌসুমি কনফারেন্সে যায় কিংবা বাড়িতে বসে পেপার ঠিকঠাক করে। এখন গোগোলের একমাত্র পথপ্রদর্শক হল মৌসুমির দেওয়া

প্যারিসের গাইড: প্লঁ দ্য পারি। ছোট্ট লাল বই, পিছনে একটা ম্যাপ লাগানো আছে। শেষ পাতায় গোগোলের সুবিধের জন্য মৌসুমি ফরাসিতে কয়েকটা কথা লিখে দিয়েছে: 'দয়া করে আমাকে এক কাপ কফি দিন। টয়লেট কোথায় বলতে পারেন?' বেরোনোর আগে মৌসুমি গোগোলকে সাবধান করে দেয়, "সকাল ছাড়া কখনও দোকানে সাদা কফি চেয়ো না যেন, ফরাসিরা কখনও তা করে না।"

সেদিনটা বেশ রোদঝলমলে, কিন্তু শীত মোটেও কম নয়। মাঝে মাঝেই হাওয়ায় কান হিম হয়ে যাচ্ছে। যেদিন মৌসুমির সঙ্গে প্রথম লাঞ্চ খেতে বেরিয়ে টুপির দোকানে গিয়ে হাজির হয়েছিল, সেই দিনটার কথা গোগোলের মনে পড়ে গেল। এই রকমই ঠান্ডা ছিল সেদিন। সেদিনও এমন হাওয়ার ঝাপটা ছিল, ওরা দু'জনে একসঙ্গে কেঁপে উঠছিল। কিন্তু তখনও উত্তাপের খোঁজে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরার মতো পর্যায়ে পৌঁছোয়নি তাদের সম্পর্ক। রাস্তা ধরে এগোতে এগোতে গোগোল ঠিক করল, মোড়ের রুটির দোকানে গিয়ে আর-একটা ক্রোয়াসঁ খাবে। ওই দোকানটাতেই সে আর মৌসুমি রোজ ব্রেকফাস্ট করে। ফুটপাথের রোদে অল্পবয়সি একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঠোঙা থেকে পেস্ট্রি বের করে একে-অন্যকে খাইয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ গোগোলের ইচ্ছে হল, ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টটায় ফিরে গিয়ে উঁচু বিছানাটায় মৌসুমিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতে। বেড়াতে যাওয়া আপাতত স্থগিত থাকুক। সম্পর্কের প্রথমদিকে এমনই করত ওরা, একসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থাকত, খেতেও ভুলে যেত। তারপর অবেলায় বেরিয়ে খাবারের খোঁজে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত। কিন্তু এ-সপ্তাহের শেষদিকে পেপারটা জমা দিতে হবে মৌসুমিকে। গোগোল জানে পেপার লেখা, ঘড়ি ধরে সময় বেঁধে সেটা পড়া আর মার্জিনে মন্তব্য লিখে রাখার কাজ থেকে এখন কোনওমতেই মৌসুমিকে নড়ানো যাবে না।

পরের কয়েকদিন মৌসুমির দাগ দিয়ে দেওয়া পথে ম্যাপ ধরে ঘুরে বেড়াল সে। বিখ্যাত বুলেভার্ড আর মিউজ়িয়াম খুঁজতে গিয়ে পথ হারাল। বেঞ্চের উপর বসে টাউন হাউস আর বাগানের স্কেচ করল। আকাদেমি দে বোজ়ার-এর সামনের দোকানগুলোয় ছবির প্রিন্ট দেখে বেড়াল, শেষ পর্যন্ত ওতেল দ্য লোজ়ুঁর একটা স্কেচ কিনেও ফেলল। পুরনো অন্ধকার গলি, পাথরঢাকা রাস্তা আর প্রাচীন সাদা পাথরের বাড়িগুলোর ছবি তুলল। এ-সবই তার ভারী সুন্দর ঠেকল, কিন্তু মনের কোণে একটা খচখচানি থেকে

গেল কেন-না মৌসুমির কাছে এর কিছুই নতুন নয়। সে এ-সব বহুবার দেখেছে। গোগোল এখন বুঝতে পারছে মৌসুমি কেন এতদিন এই অচেনা শহরটায় কাটিয়েছে, নিজের পরিবারের থেকে এত দূরে। ওর ফরাসি বন্ধুরা মৌসুমিকে পাগলের মতো পছন্দ করে। এমনকী, ওয়েটার আর দোকানদাররাও ওকে আলাদা চোখে দেখে। মৌসুমি এক হিসেবে ওদেরই একজন, কিন্তু অন্যদিক দিয়ে দেখলে, ওদের পরিধির একটু বাইরেও বটে। এই প্যারিসে মৌসুমি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিল, কোনও অপরাধবোধ বা ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া। অন্য দেশে পাড়ি দিয়ে অন্যরকম জীবন তৈরি করার জন্য গোগোলের এখন মৌসুমিকে শ্রদ্ধা হয়, অল্প হিংসেও হয়। সে বোঝে, তার নিজের বাবা-মা এভাবেই আমেরিকায় নতুন জীবন শুরু করেছিল। আর গোগোল এও জানে যে, সে নিজে তেমন কখনও করতে পারবে না।

ফিরে যাওয়ার আগের দিন মৌসুমি শাশুড়ি আর ননদের জন্য উপহার কিনল। সেদিনই আবার মৌসুমি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ পেপার পড়বে। গোগোল বলেছিল, সে সঙ্গে গিয়ে মৌসুমির কথা শুনবে। মৌসুমিই বারণ করেছে। একঘর লোকের মাঝখানে বসে অতক্ষণ ধরে এমন একটা ভাষায় বক্তৃতা শোনার কী মানে, যার একটা শব্দও গোগোল বোঝে না? সেই সময়ে শহরটা আরও ভাল করে দেখা যেতে পারে! তাই উপহার কেনা শেষ হলে গোগোল একাই ল্যুভর মিউজ়িয়ামের দিকে রওনা হল। এই একটা জায়গা সে এখনও দেখেনি। দিনের শেষে মৌসুমির সঙ্গে একটা কাফেতে দেখা করল গোগোল। মৌসুমি কাফের কাচের দেওয়ালের পিছনে গোগোলের জন্য অপেক্ষা করছে। ঠোঁটে লাল লিপস্টিক, হাতে ওয়াইনের গ্লাস।

গোগোল সামনে বসে কফি অর্ডার দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেমন হল?"

মৌসুমি সিগারেট ধরাল, "ঠিক আছে। অন্তত শেষ হয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা।"

মৌসুমির চোখে-মুখে স্বস্তির চিহ্ন খুঁজে পেল না গোগোল, বরং দুঃখের ছাপ স্পষ্ট। শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর নজর রেখে বসে আছে সে, পাথরের মধ্যে নীল শিরাগুলোর দিকে তাকিয়ে।

অন্যদিন মৌসুমি গোগোলকে জিজ্ঞেস করে, সারাটা দিন কেমন কাটল। কিন্তু আজ ওরা দু'জনেই চুপ করে বসে রইল, দেখতে লাগল পাশ দিয়ে ঘরমুখী জনতার স্রোত। গোগোল দেখাল, বাড়ির লোকেদের

জন্য কী কিনেছে। মৌসুমির বাবার জন্য টাই, দুই মায়ের জন্য সাবান, সম্রাটের জন্য শার্ট, সোনিয়ার জন্য সিল্কের স্কার্ফ, নিজের জন্য স্কেচবই, কলম, কালি। মৌসুমি গোগোলের করা স্কেচগুলো দেখে ভাল বলল। এই কাফেটায় ওরা আগেও এসেছে। চলে যাওয়ার আগের দিন বলে কাফেটার জন্যও কষ্ট হচ্ছিল গোগোলের। নতুন জায়গায় বেশ কিছুদিন থেকে চলে যাওয়ার আগে এমন কষ্ট হতেই পারে। এখানকার ছোট ছোট জিনিসগুলো শেষবারের মতো মনে এঁকে নিচ্ছিল গোগোল। রাস্তার ওপারে দোকানের সারি, গোমড়ামুখো ওয়েটারটি, সবুজ-হলুদ চেয়ার।

কফিতে চিনি মিশিয়ে একঢোঁকে খেয়ে নিয়ে গোগোল জিজ্ঞেস করল, “চলে যেতে হবে বলে মন খারাপ?”

“একটু। আমার মনের একটা অংশ কোনওদিন প্যারিস ছাড়তে চায়নি, জানো?”

গোগোল ঝুঁকে পড়ে মৌসুমির দু’হাত নিজের মুঠোতে নেয়, “প্যারিস না ছাড়লে আমাদের দেখা হত না সোনা।” বলার সময়ই গোগোল টের পায় তার আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে।

“হ্যাঁ,” মৌসুমি বলে, “তবে কোনওদিন হয়তো আমরা এখানেই থাকব।”

“হয়তো।”

মৌসুমিকে ভারী সুন্দর দেখায় তখন। ক্লান্ত মুখটিতে পড়ন্ত রোদের লাল-গোলাপি ছোঁয়া, ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে সামনে দিয়ে। এই মুহূর্তটাকে চিরকাল মনে রাখতে চায় গোগোল, এরা দু’জনে এখানে এভাবে বসে। প্যারিসের স্মৃতি এর মধ্যেই অম্লান থাক। সে ক্যামেরা বের করে মৌসুমির দিকে তাক করায় হেসে গড়িয়ে পড়ে মৌসুমি, “না, নিখিল, প্লিজ়, না। আমাকে জঘন্য দেখাচ্ছে।” সে হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে।

গোগোল তখনও ক্যামেরা সরায় না, বলে, “মো, তোমাকে এমনিতেই সুন্দর দেখতে।”

কিন্তু কিছুতেই ছবি তুলতে দেয় না মৌসুমি, চেয়ার ছেড়ে উঠে যায় লেন্সের ফোকাসের বাইরে। বলে, এই শহরে তাকে সাধারণ টুরিস্ট বলে কেউ মনে করুক, তা সে মোটেই চায় না।

মে মাসের এক শনিবার। ব্রুকলিনে ডিনার পার্টি। প্রায় একডজন লোক জমায়েত হয়েছিল লম্বা ডাইনিং টেবিলটাকে ঘিরে, কাঠের টুলে বসে কেউ সিগারেট খাচ্ছিল আবার কেউ বা জুস গ্লাস থেকে ওয়াইন খাচ্ছিল। লম্বা কর্ড

দিয়ে ঝুলছিল একটা ফিকে ধাতব আলো, সেটা ছাড়া গোটা ঘরটা মোটামুটি অন্ধকার। আলোটা টেবিলের ঠিক মাঝখানে একটা পুকুরের মতো কেন্দ্রীভূত হয়েছে। মেঝের উপর একটা পুরনো বক্সে একটি অপেরা চালানো হয়েছে। গোগোল বেশ উৎসাহিত হয়েছিল। কিন্তু নিশ্বাস বন্ধ করে যেই বসল তখনই তার মনে হল, এতক্ষণ কিছুই খায়নি সে। দশটা প্রায় বাজতে চলেছে, ডিনার সার্ভ করা অবশ্য এখনও বাকি আছে। ওয়াইন ছাড়া এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে পাউরুটি এবং একটা ছোট বাটিতে জলপাই। রুটিটা বড্ড শক্ত, পুরনো হয়ে গেলে গদি যেমন শক্ত হয়, ঠিক তেমন।

তারা মৌসুমির বন্ধু অ্যাস্ট্রিড এবং ডোনাল্ডের বাড়িতে রয়েছে। বাড়িটা খয়েরি পাথরের, তাতে মেরামতের কাজ চলছে। অ্যাস্ট্রিড এবং ডোনাল্ড অপেক্ষা করছে তাদের প্রথম সন্তানের জন্য। তারা তাদের পরিধি বাড়িয়ে নিতে চায় একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত। ছাদের ঢালু অংশটা থেকে ঝুলে থাকা মোটা মোটা প্লাস্টিক শিট স্বচ্ছ অস্থায়ী বারান্দার মতো সৃষ্টি করেছে। তাদের পিছনের দেওয়ালটা নেই। বসন্তকালের ঠান্ডাটুকু এবং বাইরের গাছগুলোকে নাড়িয়ে দেওয়া অস্বস্তিকর হাওয়া নিয়ে অভিযোগ করতে করতে তারা ঢুকেছিল। তারপর কোট খুলে তারা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করল, নিজেদের জন্য গ্লাসে ওয়াইন ঢেলে নিল। সারা বাড়িটায় ঘুরে বেড়াল তারা। সিঁড়ি দিয়ে ছাতে উঠে গেল। টিনের ছাত, নার্সারি হবে যে ঘরটি, সব ঘুরে দেখল। ছাত থেকে ম্যানহ্যাটনের ঝিলমিলে আলো স্পষ্ট দেখা যায়।

গোগোল এ-বাড়িতে আগেও এসেছে। তার মতে, একটু বেশি বেশি করেই এ বাড়িতে আসে তারা। অ্যাস্ট্রিড কলেজ থেকে মৌসুমির বন্ধু। ডোনাল্ড আর অ্যাস্ট্রিডের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল বিয়ের সময়। অন্তত মৌসুমি তাই বলে। গোগোলের মনে নেই। গোগোল আর মৌসুমির বিয়ের আগে ওরা রোমে ছিল। তারপর নিউ ইয়র্কে ফিরে এসেছে। এখন অ্যাস্ট্রিড একটা স্কুলে ফিল্ম থিয়োরি পড়ায়। ডোনাল্ড মাঝারি প্রতিভাসম্পন্ন স্টিললাইফ শিল্পী: ডিম, কাপ, চিরুনি ইত্যাদি আঁকে। ডোনাল্ডের আঁকা এক রিল সুতোর ছবি গোগোলদের শোবার ঘরে টাঙানো। ডোনাল্ড আর অ্যাস্ট্রিড বেশ আত্মবিশ্বাসী দম্পতি। গোগোলের মনে হয়, মৌসুমি আশা করে তাদের নিজেদের দাম্পত্যজীবনও ঠিক ও-রকম হবে। তাদের অনেক বন্ধু, প্রায়ই বাড়িতে ডিনার পার্টি হয়, নিজেদের জীবন বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ওরা ভালবাসে। নিজেদের জীবনযাপন সম্পর্কে ওদের ধারণা খুবই উঁচু।

মৌসুমিদের নানা রকম পরামর্শ দিতে খুবই আনন্দ পায় ওরা। যেমন, সালিভান স্ট্রিটের একটি বিশেষ বেকারি নাকি সেরা, মট স্ট্রিটের মাংসের দোকান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ, অমুক কোম্পানির কফিমেকারই কেনা উচিত, বেডকভার ফ্লোরেন্টাইন ডিজ়াইনের না হলে জীবন বৃথা। এই সব সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা গোগোলের অসহ্য লাগে। কিন্তু মৌসুমি বিশ্বস্ত। সে রোজকার জীবনযাত্রা ব্যাহত করে সেই সব দোকানেই জিনিস কেনে এবং অতিরিক্ত খরচ করে বসে।

আজ গোগোল কয়েকটি চেনা মুখ দেখতে পাচ্ছে। এডিথ আর কলিম যথাক্রমে প্রিন্সটন আর ইয়েলে সোশিয়োলজি পড়ায়, লুইস আর ব্লেক মৌসুমির মতোই নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট করছে, অলিভার একটা আর্ট ম্যাগাজ়িনের সম্পাদক, অলিভারের স্ত্রী স্যালি পেস্ট্রি শেফ। বাকিরা সবাই ডোনাল্ডের বন্ধু, কেউ কবি, কেউ শিল্পী, কেউ ডকুমেন্টারি ছবি বানায়। সকলেই বিবাহিত। এখনও এই অমোঘ সত্যটি গোগোলকে অবাক করে। এরা সবাই বিবাহিত! কিন্তু এখন এমন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে সে। কাজের দিনগুলোর চেয়ে উইকএন্ড কাটানোর চাপ যেন বেশি ঠেকছে গোগোলের কাছে। হাজারটা ডিনার পার্টি, ককটেল পার্টি, আফটার-ইলেভেন পার্টি, নাচা, যৌবনের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ড্রাগ নেওয়া, রবিবার সকালের ব্রাঞ্চে অগুনতি ব্লাডি মেরি আর বেশি দামের ডিম।

এরা সকলেই অবশ্য বুদ্ধিমান, আকর্ষক। ভাল জামাকাপড় পরে। কিন্তু যৌনজীবনে একটু খোলামেলা, বাঁধনবিহীন। এরা ছাত্রজীবন থেকেই পরস্পরকে চেনে। গোগোলের মনের মধ্যে একটা কথা প্রায়ই খচখচ করে: এদের মধ্যে অনেকেই পরস্পরের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। সেই পুরনো শিক্ষাসংক্রান্ত কথাবার্তাই হয়ে থাকে এদের মধ্যে, যাতে গোগোল অংশ নিতে পারে না। কনফারেন্স, জব লিস্টিং, অকৃতজ্ঞ ছাত্র, ডেডলাইন ইত্যাদি। টেবিলের এক কোনায় বসে ছোট লাল চুল আর বিড়ালচোখের মতো চশমা পরা একটি মেয়ে বলে চলেছে, কীভাবে সে সানফ্রান্সিসকোয় ব্রেখটের নাটকে অভিনয় করেছিল। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে। অন্যদিকে স্যালি নিজের তৈরি ডেজ়ার্ট নিয়ে ব্যস্ত। অ্যাস্ট্রিড কয়েকজনকে আপেল-সবুজ রঙের নমুনা দেখাচ্ছে। ডোনাল্ড ভাবছে সামনের ঘরটা ওই রকম রং করাবে। চশমার ভিতর দিয়ে সে নমুনাগুলোকে দেখছে, তাসের মতো সামনে ধরে রেখেছে সেগুলোকে। গোগোল জানে অ্যাস্ট্রিড সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কোন

রংটা লাগানো হবে, তবু বন্ধুদের মত নেওয়ার ভান করছে। গোগোলের বাঁদিকে এডিথ বুঝিয়ে বলছে, কেন পাউরুটি খাওয়া উচিত নয়, "গমের তৈরি কিছু না খেলে আমি তো দারুণ এনার্জি পাই।"

গোগোল এখানে কী বলবে? এর কিছুই বলার নেই। কে, কী নিয়ে গবেষণা করছে, কার দেওয়ালে কী রং লাগানো হবে বা কেউ কেন গম খায় না, এই সব নিয়ে গোগোলের কোনও আগ্রহ নেই। প্রথমদিকে অবশ্য এ-রকম জমায়েত খারাপ লাগত না গোগোলের। মৌসুমি বন্ধুদের সঙ্গে গোগোলের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। সে নিজে বন্ধুদের সঙ্গে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকত আর গল্প করত, গোগোলকে নিয়ে বিশেষ ভাবত না। ওদের কথাবার্তার মাঝে অন্য সকলেই ফুটনোট। একবার স্যালি আর অলিভারের বাড়িতে গোগোল আর মৌসুমি একটা বিরাট দেওয়াল-আলমারির ভিতরে দ্রুত মিলিত হয়েছিল। তবে গোগোল জানে, ওই রকম উত্তেজনা সাময়িক, বেশিদিন ধরে রাখা কঠিন। এখন এই বন্ধুদের দলটার প্রতি মৌসুমির আনুগত্য গোগোলকে বিস্মিত করে। এই মুহূর্তে সে একটা ডানহিল সিগারেট ধরাচ্ছে। প্রথমদিকে মৌসুমির এই সিগারেট খাওয়ার স্বভাবও গোগোলকে ভাবায়নি। বরং যৌনমিলনের পর মৌসুমি যখন বেডসাইড টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে সিগারেটে আগুন দিত, ভালই লাগত গোগোলের। তার পাশে শুয়ে চুপচাপ সিগারেটে টান দিত মৌসুমি, ধোঁয়ার রিং মাথার উপর দিয়ে ছাদের দিকে উড়ে যেত। কিন্তু এতদিন পরে সে-সব আর ভাল লাগে না। মৌসুমির চুলে আর আঙুলের ডগায় ধোঁয়ার বাসি গন্ধ, শোবার ঘরে কম্পিউটারে কাজ করে বলে সেখানেও সিগারেটের গন্ধ। গোগোলের এখন বিরক্ত লাগে। কখনও কখনও মনে হয়, এই নেশার জালে জড়িয়ে মৌসুমি ওকে ছেড়ে যেতেও পারে। একথা একদিন মৌসুমিকে বলেছিল সে। মৌসুমি হেসে বলে, "ওঃ গোগোল, বোকার মতো কথা বোলো না।"

এখন মৌসুমি হাসছে। ব্লেকের কথা শুনছে আর হাসছে। এত হাসি শেষ কবে হেসেছে ও? মৌসুমির সোজা, চকচকে চুলের দিকে তাকাল গোগোল, কিছুদিন আগে চুল কাটার ফলে ওর চুলের নীচটা এখন গুটিয়ে থাকে। চশমা পরে আরও সুন্দর দেখায় ওকে। ঠোঁট দু'টো ফ্যাকাশে হলেও চোখ জুড়োনো। গোগোল জানে, এই সব বন্ধুদের প্রশংসা পাওয়াকে খুব গুরুত্ব দেয় তার স্ত্রী, কিন্তু কেন তা বোঝে না। আবার সম্প্রতি গোগোল লক্ষ

করেছে, অ্যাস্ট্রিড ও ডোনাল্ডের সঙ্গে থাকতে পারলে মৌসুমি যেমন খুশি হয়, পরে তেমনই মুষড়ে পড়ে। হয়তো ভাবে, ওদের মতো জীবনযাত্রা গোগোল-মৌসুমির কখনও হবে না। গতবার অ্যাস্ট্রিডদের বাড়িতে ডিনার পার্টি সেরে বাড়ি ফিরেই মৌসুমি গোগোলের সঙ্গে ঝগড়া করতে আরম্ভ করেছিল। থার্ড অ্যাভিনিউ থেকে ভেসে আসা গাড়ির শব্দে রাতে ঘুম হয় না, আলমারির স্লাইডিং দরজাগুলো বারবার খুলে আসে, বাথরুমে গেলে এগজ়স্ট ফ্যানের শব্দে কানে তালা ধরে যায়, ইত্যাদি। গোগোল নিজেই এই অকারণ ঝগড়ার অজুহাত খুঁজে নিয়েছিল। নিশ্চয়ই স্ট্রেস। মৌসুমি মৌখিক পরীক্ষার জন্য পড়ছে, রাত ন'টা পর্যন্ত লাইব্রেরিতে আটকে থাকতে হয়, তাই হয়তো এমন হয়েছে। লাইসেন্সিং পরীক্ষার সময়ে পড়ার চাপে কী অবস্থা হত, তা তো গোগোলের মনে আছে। তাও পাস করার আগে সে-পরীক্ষায় দু'বার ফেল করেছে সে। মনে আছে, তখন সম্পূর্ণ একাকিত্ব দরকার হত তার নিজেরও, কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করত না। তাই গোগোল সেদিন কোনও কথার উত্তর দেয়নি। আশা করেছিল, আজ রাতে মৌখিক পরীক্ষার অজুহাতে এই ডিনার-পার্টিতে আসবে না মৌসুমি। কিন্তু এখন সে বুঝে গিয়েছে, অ্যাস্ট্রিড-ডোনাল্ড ডাকলে না বলার কোনও প্রশ্নই নেই।

এই অ্যাস্ট্রিডদের মাধ্যমেই মৌসুমির সঙ্গে তার পূর্বতন হবু বর গ্রাহামের দেখা হয়েছিল। ডোনাল্ডের সঙ্গে প্রাইমারি স্কুলে পড়ত গ্রাহাম। সে যখন প্যারিসে যায়, তাকে মৌসুমির ফোন নম্বর গ্রাহামই দিয়েছিল। ডোনাল্ডের মাধ্যমেই মৌসুমি জানতে পেরেছে যে, গ্রাহাম এখন টরন্টোতে। বিয়ে করেছে, যমজ বাচ্চাও হয়েছে তার। গ্রাহামের সঙ্গে এই ক্ষীণ যোগাযোগও ভাল লাগে না গোগোলের। যাদের মাধ্যমে এই যোগাযোগ, তাদেরও ভাল লাগে না। অ্যাস্ট্রিড আর ডোনাল্ডের সঙ্গে গ্রাহাম-মৌসুমির দারুণ সম্পর্ক ছিল। ওরা চারজনে বহু জায়গায় বেড়াতে গিয়েছে। অবশ্য গোগোলকেও ওরা সেভাবেই দলে টানার চেষ্টা করে। যেমন, এবছর গ্রীষ্মে চারজনে ব্রিটানির সমুদ্রতীরে বাড়িভাড়া নেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। এমনিতে ডোনাল্ডরা গোগোলের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করেছে চিরকাল, কিন্তু গোগোলর মনে হয় ওকে এখনও গ্রাহাম মনে করে সবাই। একদিন অ্যাস্ট্রিড ওকে ভুল করে গ্রাহাম বলে ডেকেও ফেলেছিল। গোগোল নিজে ছাড়া কেউ অবশ্য তা খেয়াল করেনি। সকলেরই নেশা একটু চড়ে গিয়েছিল সেদিন। কিন্তু গোগোল ভুল শোনেনি। একটু রাতের দিকে অ্যাস্ট্রিড বলেছিল, "মো,

তুই আর গ্রাহাম এই মাংসের টুকরোটা বাড়ি নিয়ে যা। ভাল স্যান্ডউইচ হবে।"

এখন অন্য সব অতিথিরা বাচ্চার নাম নিয়ে আলোচনা করছে। "আমি এমন নাম চাই যা আর কারও না থাকে," অ্যাস্ট্রিড বলছে। সম্প্রতি গোগোল দেখেছে, দম্পতিদের এই আড্ডায় আলোচনা ঘুরেফিরে বাচ্চাদের নামে এসে ঠেকছে। আর কেউ যদি অন্তঃসত্ত্বা হয়, এখন যেমন অ্যাস্ট্রিড, তা হলে তো নামের আলোচনা অবশ্যম্ভাবী।

ব্লেক বলল, "আমার পোপদের নাম খুব পছন্দ।"

"মানে জন বা পল?" লুইসের প্রশ্ন।

"ইনোসেন্ট বা ক্লেমেন্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।"

অনেক অর্থহীন নামও উঠে আসে, যেমন জেট বা টিপার। তখন সকলে মুখ দিয়ে বিরক্তির শব্দ করে। একজন বলল, আনা গ্রাহাম বলে একটি মেয়েকে চিনত: "বুঝতে পারছ? অ্যানাগ্রাম!" সবাই হেসে উঠল। মৌসুমি বলে উঠল, তার মতো নাম অভিশাপ ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারে না, ছোটবেলার বন্ধুরা ওকে মুসুমি বা মুজ় বলে ডাকত। "আমি ছাড়া আর কোনও মৌসুমিকে চিনতাম না। এটা আমার এত খারাপ লাগত!"

"দেখো দেখি! আমার ও-রকম নাম হলে যে কী ভাল হত!" অলিভার বলল।

গোগোল আর একগ্লাস ওয়াইন ঢেলে নিল। এই সব কথা শুনতে তার তীব্র ঘৃণা হয়, মন্তব্য করার তো প্রশ্নই ওঠে না। কয়েকটা নামকরণের বই হাতে-হাতে ঘুরছে। কোনওটার নাম *ফাইন্ডিং দ্য পারফেক্ট নেম*, কোনওটা *অলটারনেটিভ বেবি নেম্‌স*, বা *দ্য ইডিয়ট্‌স গাইড টু নেমিং ইয়োর বেবি*। একটার নাম *হোয়াট নট টু নেম ইয়োর বেবি*। পাতায় ভাঁজ করে চিহ্ন রাখা হচ্ছে, তারা এঁকে বা দাগ দিয়ে নাম চিহ্নিত করা হচ্ছে। কেউ বলল, জ়াকারি নাম দেওয়া যেতে পারে। সকলেই নিজের নামের মানেটা দেখে নিচ্ছে, কেউ খুশি হচ্ছে, কেউ বিমর্ষ। গোগোল বা মৌসুমির নাম এই বইগুলোয় নেই। এই একটা বিষয়ে এই মুহূর্তেও তাদের একাত্মতা টের পেল গোগোল। সে উঠে মৌসুমির পাশে গিয়ে বসল, টেবিলে রাখা মৌসুমির হাতটা তুলে নিজের হাতে নিল। মৌসুমি ঘুরে তাকাল, "হে দেয়ার।" তারপর গোগোলের কাঁধে মাথাটা রাখল। গোগোল টের পেল, মৌসুমি মাতলামি করছে।

অন্যদিক থেকে অলিভার জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু মৌসুমি মানে কী?"

"দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে আসা জলীয় বাষ্প ভরা বাতাস," মৌসুমি চোখ ঘুরিয়ে উত্তর দিল।

"এখন যেমন বাইরে হাওয়া দিচ্ছে?"

"আমি জানতাম তুই প্রাকৃতিক শক্তির অধিকারী," অ্যাস্ট্রিড হেসে বলল।

গোগোল মৌসুমির দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার নামের মানে তা-ই?" একথা কোনওদিন জিজ্ঞেস করেনি গোগোল, সে জানতও না। বলল, "তুমি তো আমাকে বলোনি।"

মৌসুমি অবাক হয়ে বলে, "বলিনি?"

গোগোলের ব্যাপারটা ভাল লাগে না। কেন, তা অবশ্য বোঝে না সে। এখন এ নিয়ে ভাবা চলবে না, এত হট্টগোলের মধ্যে তো নয়ই। সে উঠে বাথরুমের দিকে গেল। হয়ে গেলে আড্ডার ঘরে না ফিরে এসে সে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চলে গেল, নতুন-নতুন আর কী এরা বানিয়েছে, তা দেখতে। উপরে পরপর হোয়াইটওয়াশ করা ঘরে কয়েকটা মই। মনে পড়ে গেল, ডেটিঙের প্রথম জমানায় সে আর মৌসুমি একটা বারে বসে আদর্শ বাড়ির প্ল্যান ছকেছিল। গোগোল বলেছিল, আধুনিক ঢঙের বাড়ি হবে, অনেক আলো-বাতাস আসবে সে বাড়িতে। কিন্তু মৌসুমি এ-রকম খয়েরি পাথরের বাড়ি চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ডিজাইন যা দাঁড়িয়েছিল, তা একটি অসম্ভব বাড়ির। কাচ আর কংক্রিটের তেমন মিশ্রণ নিশ্চয়ই কেউ কখনও দেখেনি। তখন পর্যন্ত ওদের যৌনসংসর্গ হয়নি বলে বেডরুমের কথা উঠলে পরে দু'জনেই লজ্জা পেয়েছিল।

রান্নাঘরে পৌঁছে গেল গোগোল। সেখানে ডোনাল্ড এখন স্প্যাগেটি রাঁধছে। এই রান্নাঘরটা পুরনোই থেকে গিয়েছে। ময়লা লিনোলিয়াম আর পুরনো বাসনপত্র দেখে গোগোলের আমস্টারডাম অ্যাভিনিউয়ের অ্যাপার্টমেন্টের কথা মনে পড়ে গেল। উনুনের উপর বিশাল একটা পাত্র গরম হচ্ছে। বাটিতে স্যালাড কেটে কাগজের ন্যাপকিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। সিংকে হালকা সবুজ রঙের একগাদা ঝিনুক।

ডোনাল্ড বেশ লম্বা, পরনে জিনস, হাওয়াই চটি, কনুই অবধি হাতাগোটানো লাল শার্ট। দেখতে তাকে ভালই, হালকা খয়েরি রঙের চুল পিছনে টেনে আঁচড়ানো। জামাকাপড়ের উপর একটা অ্যাপ্রন পরে আছে সে। পার্সলে পাতার বিরাট আঁটি থেকে গোটা পাতা ছিঁড়ে আলাদা করছে।

"এই যে! সাহায্য লাগবে নাকি?" গোগোল জিজ্ঞেস করল।

"আরে নিখিল যে, এসো সাহায্য করো।" পার্সলের আঁটি বাড়িয়ে দিয়ে ডোনাল্ড বলল।

কিছু একটা করতে পেরে গোগোল আশ্বস্ত। সময় কাটছে, কাজও হচ্ছে। যদিও ডোনাল্ডের সহকারী রাঁধুনি হিসেবে কাজ করতে হচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করল, "বাড়ি সারানো কেমন চলছে তা হলে?"

ডোনাল্ড বলল, "আর বোলো না। পুরনো কন্ট্রাক্টরকে তাড়িয়ে দিয়েছি। অত আস্তে কাজ করলে আমাদের বাচ্চা জন্মে বড় হয়ে যাবে, নার্সারি আর হবে না।"

গোগোল দেখল, ডোনাল্ড ঝিনুকগুলো ঘষে পরিষ্কার করছে, তারপর উনুনের উপরে রান্নার পাত্রে ফেলে দিচ্ছে। দূর থেকে ফেলছে, টিপ করে। রান্নার পাত্রে তখন ফেনা দেখা যাচ্ছে।

"তোমরা এদিকে কবে বাড়ি কিনছ, তা হলে?" ডোনাল্ড কাজ করতে করতে বলল। গোগোল উত্তর না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। ব্রুকলিনে উঠে আসার তার মোটেও ইচ্ছে নেই। ডোনাল্ড আর অ্যাস্ট্রিডের কাছাকাছি সে মোটেও থাকতে চায় না। বলল, "আমি তো সেভাবে কিছু ভাবিনি। আমার পছন্দ ম্যানহ্যাটান। মৌসুমিরও।" ডোনাল্ড মাথা নাড়ে। বলে, "তুমি ভুল জানো। মৌসুমি ব্রুকলিন ভীষণ ভালবাসে। গ্রাহামের সঙ্গে গন্ডগোল হওয়ার পর ওকে এখান থেকে জোর করে বের করেছিলাম আমরা।"

গ্রাহামের নামের উল্লেখ গোগোলকে কাঁটার মতো বিঁধল। বেলুনের মতো চুপসে গেল মনটা।

"ও এই বাড়িতে তোমাদের সঙ্গে থাকত?"

"একদম ঠিক। ওই হলটার পাশের ঘরে থাকত। দু'মাস ছিল। কী ভেঙে পড়েছিল মেয়েটা। সম্পর্ক ভেঙে যাওয়াতে অত কষ্ট পেতে আমি কাউকে দেখিনি।"

গোগোল মাথা নাড়ল। একথা মৌসুমি তো কখনও বলেনি। কেন? হঠাৎ এই বাড়িটাকে ঘেন্না করতে লাগল সে। এখানেই জীবনের সবচেয়ে দুঃখের সময়টা কাটিয়েছে মৌসুমি! কিন্তু সে দুঃখ তো অন্য এক পুরুষের জন্য।

"কিন্তু ওর পক্ষে তুমি গ্রাহামের চেয়ে ভাল," ডোনাল্ডের কথায় অবাক হল গোগোল।

"গ্রাহাম ভাল ছেলে, কিন্তু ওরা দু'জনে মানসিকতায় বড্ড একরকম। ভীষণ একাত্ম হয়ে পড়েছিল ওরা।"

গোগোলের মন এই মন্তব্যে আরও খারাপ হয়ে গেল। পার্সলে পাতা ছেঁড়া শেষ করে সে দেখল, ডোনাল্ড ধারালো ছুরি দিয়ে অভ্যস্ত হাতে পাতাগুলো কুচিকুচি করে কাটছে। তার একটা হাত ছুরির ফলার উপর রাখা।

গোগোলের হঠাৎ মনে হল রাঁধুনি হিসেবে সে ব্যর্থ। বলল, "কী করে করতে হয় এটা? আমি কিছুতেই পারি না।"

"একটা ভাল, ধারালো ছুরি চাই। ব্যাস, তা হলেই তুমি পারবে।"

গোগোলকে এর পর প্লেট, ছুরি, কাঁটা দিয়ে নীচে পাঠাল ডোনাল্ড। নীচে যাওয়ার পথে হলঘরের পাশের ঘরটায় উঁকি দিল সে, এই ঘরেই মৌসুমি থাকত। ঘরটা এখন খালি। মেঝেতে কতকগুলো বাজে কাপড় পড়ে আছে। ছাত থেকে বেরিয়ে আছে ইলেকট্রিকের তার। গোগোল কল্পনা করল, এই ঘরের কোনায় একটা খাট। শোকার্ত, বিমর্ষ মৌসুমি বসে আছে, মাথার উপর মেঘের মতো সিগারেটের ধোঁয়া জমে আছে। নীচে গিয়ে মৌসুমির পাশে বসল গোগোল। কানের লতিতে চুমু খেল।

মৌসুমি বলল, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

"ডোনাল্ডের সঙ্গে ছিলাম।"

নাম নিয়ে আলোচনা এখনও পুরোদমে চলছে। কলিন বলছে, নাম হওয়া উচিত বিশেষ কোনও গুণ অনুসারে। যেমন, পেশেন্স বা ফেথ বা চেস্টিটি। বলছে, ওর প্রপিতামহীর নাম ছিল সাইলেন্স। কেউ সে কথা বিশ্বাস করল না।

ডোনাল্ড বলল, "প্রুডেন্স হলে কেমন হয়? প্রুডেন্স একটা গুণের নাম না?" সে এইমাত্র স্প্যাগেটির পাত্র নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমেছে। খাবারটা দেখে চারদিকে আনন্দের চিৎকার শোনা গেল। প্লেটে তুলে সকলকে খাবার দেওয়া হল।

অ্যাস্ট্রিড বলল, "বাচ্চার নাম দেওয়া দায়িত্বের ব্যাপার। বড় হয়ে যদি তার ওই নাম পছন্দ না হয়?"

লুইস বলল, "পছন্দ না হলে পালটে নেবে। কলেজের জো চ্যাপম্যানকে মনে আছে? সে এখন জোয়ানা নাম নিয়েছে।"

এডিথ বলল, "আমি কখনও নাম পালটাবার কথা ভাবব না। এটা আমার ঠাকুমার নাম।"

হঠাৎ মৌসুমির গলা শোনা গেল, "নিখিল কিন্তু নিজের নাম পালটেছে।"

সেই সন্ধ্যায় প্রথমবার ঘর নিস্তব্ধ হল। পিন পড়লে শব্দ শোনা যায়।

গোগোল মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে মৌসুমির দিকে তাকিয়ে। সে কোনওদিন মৌসুমিকে বলেনি বটে তার এই নাম পালটাবার ব্যাপারটা কাউকে না বলতে। কিন্তু তার বিশ্বাস ছিল এমন একটা ব্যক্তিগত বিষয় মৌসুমি কাউকে বলবে না। গোগোলের ব্যথিত নীরবতা মৌসুমিকে স্পর্শ করে না। সে হাসিমুখে গোগোলের দিকে তাকায়। বুঝতেও পারে না কী করে ফেলেছে। অন্য বন্ধুরা কী করবে বুঝতে না পেরে মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় গোগোলের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাদের অনেকেই থ হয়ে গেছে।

ব্লেক আস্তে আস্তে বলল, "কোন নাম বদলেছিল?"

মৌসুমি হেসে বলল, "নিখিল নাম নিয়ে ওর জন্ম হয়নি। ছোটবেলায় যখন ওকে চিনতাম, ওর অন্য একটা নাম ছিল।" বলে অনায়াসে প্লেট থেকে খাবার তুলে মুখে পুরে দিল।

অ্যাস্ট্রিড সন্দেহে চোখ সরু করে, ভুরুতে ভাঁজ ফেলে জিজ্ঞেস করল, "কী নাম নিয়ে জন্মেছিলে তুমি?"

কয়েক সেকেন্ড গোগোল চুপ করে রইল। তারপর বলল, "গোগোল।"

বেশ কয়েকবছর পরিবারের লোকজন বা খুব কাছের বন্ধু ছাড়া কেউ তাকে গোগোল বলে ডাকেনি। এখন নিজের কানেই নামটা অসম্ভব ঠেকে। নাম বলে গোগোল মৌসুমির দিকে রাগ করে তাকাল, কিন্তু মৌসুমি এ-সব সূক্ষ্মতা ধরার জায়গায় নেই। নেশায় আচ্ছন্ন।

"দ্য ওভারকোটের গোগোল?" স্যালি জিজ্ঞেস করল।

"আমি বুঝেছি। নিকোলাই গোগোল," অলিভার বলল।

"তুমি এটা এতদিন চেপে রেখেছিলে নিক?" অ্যাস্ট্রিড ছদ্ম-অভিমানের ভঙ্গিতে বলে।

ডোনাল্ড বলল, "তোমার বাবা-মা এই নামটা বাছলেন কেন? আর কোনও নাম ছিল না?"

গোগোল নামের ইতিহাসের কথা ভাবল। এদের সে কী করে সে-সব বলবে! একাধারে উজ্জ্বল আবার ভীষণ গোপন সেই ইতিহাস। মাঝরাতের উলটে যাওয়া ট্রেন, ট্রেনের জানালা দিয়ে বেরিয়ে থাকা তার বাবার হাত, মুঠোয় ধরা একটা বইয়ের পাতা। মৌসুমিকে দেখা হওয়ার কয়েকমাস পরে সে এ-সব বলেছে। অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলেছে, বাবা পেম্বারটন রোডে তাকে

কীভাবে বলেছিল, তাও বলেছে। স্বীকার করেছে, নাম পরিবর্তন করে অনেক সময় অপরাধবোধ হয় তার। বিশেষ করে বাবা মারা যাওয়ার পর। মৌসুমিও বলেছিল, সে বুঝেছে। বলেছিল গোগোলের জায়গায় অন্য কেউ হলেও এমনই করত। কিন্তু এখন এ-সব মৌসুমির কাছে শুধুই ঠাট্টা, বন্ধুদের গল্প করার জিনিস! হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল গোগোলের। কেন বলতে গিয়েছিল এ-সব মৌসুমিকে? ও কি এখন বাবার ট্রেন দুর্ঘটনার ব্যাপারটাও এখানে বলবে? হয়তো টেবিল ঘিরে বসে থাকা এই সব নারী-পুরুষ কাল সকালের মধ্যেই তা ভুলে যাবে। যদি মনে থাকে, তা থাকবে গল্প হিসেবে। পরবর্তী কোনও ডিনারপার্টিতে মজা করে বলার জন্য। সবচেয়ে দুঃখ হল একথা ভেবে।

"আমার বাবা গোগোলের ফ্যান ছিলেন," শেষ পর্যন্ত এটাই বলল গোগোল।

"তা হলে আমাদের বাচ্চার নাম হওয়া উচিত ভ্যারদি," ডোনাল্ড অপেরা শুনতে শুনতে বলল। সেই মুহূর্তে অপেরার শেষ অংশটা জোরে বেজে উঠল। তারপর টেপ শেষ হয়ে গেল। ছোট্ট ক্লিক, তারপর নীরবতা।

অ্যাস্ট্রিড ডোনাল্ডের নাকে চুমু খেয়ে বলল, "কী যা-তা বলছ!"

গোগোল ওদের দেখছিল। সে জানে, এ-সবই মজা করে বলা। এরা তার মা-বাবার মতো সেন্টিমেন্টাল বা বোকা নয়।

এডিথ বলল, "এত ভেবো না। ঠিক সময়ে ঠিক নাম পেয়ে যাবে।"

সকলকে অবাক করে দিয়ে গোগোল হঠাৎ বলে উঠল, "ঠিক নাম বলে কিছু হয় না। আমার মনে হয় প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের নাম নিজে রাখার অধিকার দেওয়া উচিত। আঠারো বছর বয়স হলে নাম সে নিজে ঠিক করবে। তার আগে অবধি সর্বনামই চলুক।"

কেউ কিছু বলল না। মাথা নাড়ল। মৌসুমির জ্বলন্ত দৃষ্টি পাত্তা দিল না গোগোল। ইতিমধ্যে স্যালাড দেওয়া হয়েছে। আলোচনা অন্য মোড় নিল। গোগোলকে বাদ দিয়েই কথাবার্তা চলতে লাগল। গোগোলের মনে পড়ল একবার মৌসুমির বইয়ের টেবিল থেকে সে একটা ফরাসি বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ তুলে নিয়ে পড়েছিল। তাতে প্রায় একশো পাতা ধরে প্রধান দুটি চরিত্রকে 'হি' ও 'শি' বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। বইটা পড়তে পড়তে অদ্ভুত তৃপ্তি হচ্ছিল গোগোলের। চরিত্র দুটির নাম খুলে বলা হচ্ছে না বলে আনন্দ হচ্ছিল। বইটা আসলে একটা বিয়োগান্তক প্রেমের উপন্যাস। আহা, জীবন যদি উপন্যাসের মতো সরল হত।

দশ

১৯৯৯

প্রথম বিবাহবার্ষিকীর ভোরবেলায় মৌসুমির বাবা-মা ফোন করে দুজনকে ঘুম থেকে তুলে দিলেন। গোগোল আর মৌসুমি পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানানোর আগেই ফোন বেজে উঠেছিল। বিবাহবার্ষিকী ছাড়াও আনন্দের আরও একটা কারণ: মৌসুমি পরীক্ষায় ভালভাবে পাস করেছে। তৃতীয় আর একটা কারণ আছে বটে, সেটা সহজে বলতে চাইছিল না মৌসুমি। সে একটা রিসার্চ ফেলোশিপ পেয়েছে। গবেষণার কাজে একবছর ফ্রান্সে থাকতে পারবে। বিয়ের আগেই কাউকে না বলে ফেলোশিপের জন্য আবেদন করেছিল, জানতে চাইছিল সে যোগ্য কি না। এ-রকম প্রতিযোগিতার মধ্যে থাকা নাকি খুব ভাল। দু'বছর আগে ফ্রান্সে যাওয়া খুবই সোজা ছিল। কিন্তু এখন তার স্বামী আছে, সংসার আছে, একবছরের জন্য বিবাহিত জীবন ছেড়ে ফ্রান্সে থাকাটা অত সহজ নয়। ভাবনাচিন্তা করতে হবে। সুতরাং সুখবর আসার পর সে আর এটা নিয়ে কথা তোলেনি। চিঠিটা ফাইলে ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছিল।

সন্ধ্যায় কী হবে না হবে, মৌসুমি তার দায়িত্ব নিয়েছে। একটা ভাল রেস্টুরেন্টে রিজার্ভেশন করেছে। ডোনাল্ড আর অ্যাস্ট্রিড সেই রেস্টুরেন্টের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গত কয়েকমাস প্রচুর পড়াশোনা করে সে গোগোলকে একেবারে সময় দিতে পারেনি। তাই নিয়ে অপরাধবোধও রয়েছে। এমন রাত গিয়েছে যখন সে গোগোলকে বলেছে যে, সে লাইব্রেরিতে। কিন্তু আদতে সে-সময় অ্যাস্ট্রিড আর তার বাচ্চা এসমির সঙ্গে ছিল মৌসুমি বা একা-একা শহরের রাস্তায় হাঁটছিল। হয়তো বা একা কোনও বারে বা রেস্তোরাঁয় বসে সুশি, স্যান্ডউইচ বা ওয়াইনের অর্ডার দিচ্ছিল। নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছিল যে, সে, একা এখনও থাকতে পারে। এই একা থাকা তার কাছে জরুরি। বিয়ের সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণের সময়ও সে নিজেকে

বলেছিল, স্বামীর উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল কখনও হবে না। যেমন তার মা হয়েছে। বত্রিশ বছর বিদেশে থাকার পরেও মা গাড়ি চালাতে জানে না, চাকরি করেনি, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আর সেভিংস অ্যাকাউন্টের তফাত বোঝে না। অথচ তার মা অশিক্ষিত বা অজ্ঞ নয়। বাইশ বছর বয়সে বিয়ে হওয়ার আগে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স পড়েছে।

তারা দু'জনেই অনুষ্ঠানের জন্য সাজগোজ করল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে মৌসুমি দেখল, গোগোল তারই উপহার দেওয়া গাঢ় সবুজ ভেলভেটের নেহরু কলার লাগানো শ্যাওলা রঙের শার্টটা পরেছে। সেল্‌সম্যান সেটা প্যাক করে দেওয়ার পরই মৌসুমির মনে পড়েছিল নিয়মটা। প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে নাকি কাগজ দিতে হয়। ভেবেছিল শার্টটা বড়দিনের জন্য রেখে দেবে। পরিবর্তে রিজোলিতে গিয়ে গোগোলকে কিনে দেবে একটা আর্কিটেকচারের বই। কিন্তু হাতে তখন একদম সময় ছিল না। মৌসুমি নিজে পরে আছে সেই কালো পোশাকটা, যেটা সে পরেছিল গোগোল প্রথম তার বাড়িতে ডিনারে আসার দিন। সেদিনই, প্রথম তারা শারীরিকভাবে মিলিত হয়েছিল। তার উপর সে জড়িয়েছে একটা লাইল্যাক রঙের পশমিনা শাল, এটা প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে মৌসুমিকে দেওয়া নিখিলের উপহার। প্রথম দেখা হওয়ার দিনটা এখনও পরিষ্কার মনে আছে মৌসুমির। গোগোলের অগোছালো চুল ভারী ভাল লেগেছিল তার। সেই ছোট্ট বারটায় গোগোল ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এসেছিল। গালে না-কামানো দাড়ির ধ্বংসাবশেষ, সবুজ আর ল্যাভেন্ডার রঙের স্ট্রাইপ দেওয়া যে-শার্টটা গোগোল পরে ছিল, সেটার কলার বহুব্যবহারে জীর্ণ। মনে আছে, গোগোলকে দেখামাত্র কীভাবে হৃৎপিণ্ড আটকে গিয়েছিল গলার কাছে। মৌসুমি টের পেয়েছিল সেই অমোঘ আকর্ষণ। আসলে সে ভেবেছিল, কর্ডুরয় জিন্‌স আর সোয়েটশার্ট পরা, চিবুকে ব্রনওয়ালা, মুখচোরা যে টিনএজার ছেলেটিকে তার মনে আছে, তারই একটু বয়স্ক রূপান্তর দেখতে পাবে। সেই প্রথম ডেটের আগের দিন সে অ্যাস্ট্রিডের সঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছিল। অ্যাস্ট্রিড স্যালাড খেতে খেতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভঙ্গিতে বলেছিল, "তোর সঙ্গে কোনও ভারতীয় ছেলেকে মোটেই মানাবে না।" সেই সময় মৌসুমি প্রতিবাদ করেনি। ভেবেছিল, একবার মোটে দেখা করার তো ব্যাপার! মৌসুমি নিজেও কি বুঝতে পেরেছিল এমনটা হবে? শশী কাপুর আর কলকাতার এক কাজিন ছাড়া আর কোনও ভারতীয় পুরুষকে সেদিন পর্যন্ত তার বিন্দুমাত্র ভাল লাগেনি। কিন্তু নিখিলের সঙ্গে

দেখা হওয়ার পরই সব বদলে গেল। মৌসুমি নিখিলকে সত্যি সত্যি পছন্দ করেছিল। বিশেষ করে নিখিল যে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার নয়, এটাই তার ভাল লেগেছিল। গোগোল থেকে নাম পালটে নিখিল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও খুব ভাল লেগেছিল মৌসুমির। যেন ছোটবেলার চেনা ছেলেটি নতুন রূপে তার কাছে এসে পৌঁছেছে। মা যার কথা বলেছিল, যার সঙ্গে মৌসুমিকে আলাপ করার জন্য জোর করেছিল, এ মোটেই সেই লোকটি নয়।

দু'জনে ঠিক করল, রেস্তোরাঁয় যাবে হেঁটে। হাঁটা-রাস্তা অনেকটাই। অন্ধকার হয়ে এলেও সন্ধ্যার উত্তাপ মিলিয়ে যায়নি। মৌসুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আতান্তরে পড়ে গেল। এমন উষ্ণ সন্ধ্যায় পশমিনার দরকার আছে কি? কিন্তু এখন ওটা কোথায় রাখবে? ব্যাগটা বেশ ছোট। সে শালটা কাঁধ থেকে আলগা করে ঝুলিয়ে দিল।

"এটা কি উপরে রেখে আসব?"

গোগোল বলল, "যদি ফেরার পথেও হেঁটে আসি আমরা? তখন হয়তো দরকার হবে?"

"তা হতে পারে।"

"তোমাকে ওটা খুব মানাচ্ছে।"

"এই পোশাকটার কথা মনে আছে তোমার?"

গোগোল শুধু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। মৌসুমি হতাশ হল বটে, তবে অবাক হল না। সে জানে, আর্কিটেক্টের মন নিয়ে রোজকার জীবনের ছোটখাটো জিনিসে কোনও আগ্রহ পায় না গোগোল। যেমন, পশমিনা শালটা কিনে সে ক্যাশমেমো আর ফেরত খুচরোটা লুকিয়ে রাখার কোনও চেষ্টা করেনি। ওদের উপরের ড্রয়ারে মৌসুমির চোখের সামনে রেখে দিয়েছিল। তবে এই জামাটা চিনতে না পারার জন্য সে স্বামীকে দোষী করে না। তার নিজেরই সেদিনের তারিখটা মনে নেই। নভেম্বর মাসের কোনও এক শনিবার ছিল সেটা। কিন্তু এখন, বছরদুয়েক পরে, ওদের দেখা হওয়ার প্রথমদিকের খুঁটিনাটি স্মৃতি থেকে হারিয়ে গিয়েছে, তবে আজকের এই বিশেষ দিনটা তো এসেছে ওদের জীবনে।

দু'জনে ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটতে থাকল। প্রাচ্যের কার্পেট বিক্রি করার বড় দোকানগুলোর পাশ দিয়ে, আলোকিত শো-উইন্ডোর ধার ঘেঁষে। পাবলিক লাইব্রেরি পিছনে ফেলে। সোজা রেস্তোরাঁয় না গিয়ে ওরা ফুটপাথ

ধরে কিছুক্ষণ হাঁটবে ঠিক করল। রিজার্ভেশনের সময় আরও মিনিট কুড়ি পরে। ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউ বেশ অশিক্ষিত জায়গা। কয়েকটা ট্যাক্সি আর জিনিস কিনতে আসা পর্যটকদের ভিড়। এখানে বিশেষ আসে না মৌসুমি। বেনডেলে মেকআপ কিনতে বা প্যারিসে পুরনো সিনেমা দেখতে আসে মাঝে মাঝে। একবার গ্রাহাম, গ্রাহামের বাবা আর সৎমায়ের সঙ্গে প্লাজায় এসেছিল। একটা দোকানে ফিরোজা রঙের একপাটি চটি দেখে মৌসুমি থামল। উঁচু পেডাস্টালের উপর আলোকবৃত্তের মাঝখানে চকচক করছে সেগুলো। চটিটার গ্ল্যাডিয়েটার স্টাইল স্ট্র্যাপে ঝকমকে পাথর বসানো।

"সুন্দর না কুৎসিত?" মৌসুমি গোগোলকে জিজ্ঞেস করে।

এই প্রশ্নটা প্রায়ই করে মৌসুমি। আর্কিটেকচারাল ডাইজেস্ট বা টাইমস-এর ডিজ়াইন বিভাগে ছবি দেখতে দেখতে। অনেক সময় গোগোলের উত্তর তাকে অবাক করে দেয়। যেটাকে এতক্ষণ খারাপ ভাবছিল, সেটাকে প্রশংসা করতে বাধ্য করে।

"নিশ্চিতভাবে কুৎসিত। কিন্তু পায়ে না পরলে বলা মুশকিল।"

"আমি একমত। কত দাম হতে পারে বলো তো।"

"দুশো ডলার।"

"পাঁচশো। ভাবতে পারো? আমি *ভোগ* ম্যাগাজ়িনে ছবি দেখেছি।"

মৌসুমি এগিয়ে যায়। কয়েক-পা এগিয়ে গিয়ে সে ফিরে আসে। গোগোল তখনও শোকেসের সামনে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছে, চটিতে দামের ট্যাগ লাগানো আছে কি না। ঝুঁকে দাঁড়ানো সেই চেহারাটা একাধারে নিষ্পাপ আর বিপ্লবী ধরনের। মৌসুমি নতুন করে অনুভব করল, সে এই পুরুষটিকে কেন ভালবাসে। ভেঙে যাওয়া জীবনে গোগোল ফিরে আসায় কৃতজ্ঞ হয়েছিল সে। ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে মৌসুমি ভাবতে শুরু করেছিল যে, সে প্যারিসে যাওয়ার আগেকার সেই সাদামাঠা জীবনে আবার ঢুকে যাবে। একাকী থাকার জীবনে, বই মুখে করে বসে থাকার জীবনে, পুরুষের স্পর্শহীন জীবনে। আতঙ্ক হতে শুরু করেছিল তার। সব বন্ধুদেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এমনকী, একসময় ব্যক্তিগত কলামে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথাও ভাবছিল সে। কিন্তু গোগোল তাকে গ্রহণ করেছিল, পুরনো জীবনের অপমান থেকে মুক্তি দিয়েছিল। মৌসুমির বিশ্বাস, গ্রাহামের মতো করে গোগোল তাকে কখনও দুঃখ দিতে পারবে না। বেশ কয়েকবছর ধরে লুকিয়ে সম্পর্ক তৈরি করার পরে এই নতুন সম্পর্ক ভাল লাগছিল তার। ছোট্ট মাছের

বয়ামে প্রেম করার মতো সকলের চোখের সামনে প্রেম করা। প্রথম থেকেই বাবা আর মার সম্মতি সঙ্গে ছিল, প্রশ্নাতীতভাবে নিশ্চিত ভবিষ্যৎ চোখের সামনে, বিয়ের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া ছাড়া অন্যদিকে যাবে না এই সম্পর্ক। কিন্তু এই চেনা জীবনের আশ্বাসই আবার তাকে গোগোলের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যেন মৌসুমির মনে আলোড়ন হয়। যে জীবনটা থেকে নিজেকে পুরোপুরি আলাদা করে নেওয়ার জন্য সে পালিয়ে বেড়িয়েছে, আজ গোগোলের উপস্থিতি তাকে সেই জীবনেই বেঁধে রাখতে চায়। গোগোল তাকে সেই পুরনো জীবনচর্যার কথাই মেন করিয়ে দেয়। এতে গোগোলের কোনও দোষ নেই, মৌসুমি জানে। তবে যে-পুরুষটির সঙ্গে নিজেকে কল্পনা করেছে সে, গোগোল সেই পুরুষ নয়। কোনওদিন ছিল না। হয়তো এই কারণেই প্রথমদিকে গোগোলের সঙ্গে দেখা হওয়া, প্রেমে পড়া, বাবা-মায়ের প্রত্যাশিত জীবনে ঢুকে যাওয়াই ভাল লাগছিল তার। নিজের চিরকালের ইচ্ছা থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে থাকাটাই ভীষণ উত্তেজক মনে হয়েছিল।

প্রথমবারের চেষ্টায় রেস্তোরাঁটা খুঁজে পেল না ওরা। ঠিকানাটা কাগজে লিখে মৌসুমি ব্যাগে পুরে এনেছিল, কিন্তু সেই ঠিকানা খুঁজে ওরা গিয়ে পৌঁছল একটা অফিসবাড়িতে। কলিং বেল টিপল। কাচের দরজা দিয়ে দেখতে পেল কার্পেট পাতা মস্ত একটা হলঘর। সিঁড়ির মুখে বিশাল ফুলদানিতে ফুল দিয়ে সাজানো।

"এই জায়গাটা হতে পারে না," মৌসুমি কাচের দরজায় মুখ লাগিয়ে দেখতে দেখতে বলল।

"তুমি ঠিক ঠিকানা লিখেছিলে তো?"

তারা সেখানে ফুটপাথ ধরে ঘুরে বেড়াল, রাস্তার অন্যদিকটাও দেখে নিল। আলোহীন জানালাগুলো দেখল, যদি কিছু চোখে পড়ে! হঠাৎ গোগোল দেখতে পেল বেসমেন্টের দিকে নেমে যাওয়া কয়েকধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে এক দম্পতি। "ওইটাই হবে," বলে উঠল সে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে হালকা আলোয় আলোকিত একটা দরজা। তার উপরে অলক্ষ্যে নাম লেখা যেন, 'আন্তোনিয়া'। বেশ কয়েকজন এগিয়ে এসে স্বাগত জানায়, সামনের পোডিয়ামে রাখা একটি রেজিস্টারে তাদের নামের পাশে দাগ দেওয়া হয়, একটা টেবিলে নিয়ে গিয়ে খাতির করে বসানো হয় তাদের। এত খাতিরের দরকার কী? ডাইনিং রুমে ঢুকে স্বাগত জানানোর কায়দাটা একটু

বেমানান ঠেকে। খুব গম্ভীর, নির্জন, বিমর্ষ ডাইনিং হল, ঠিক যেমন হেঁটে আসা রাস্তাগুলো। সিনেমা দেখে ফেরার পথে খেতে ঢুকেছে একটা পরিবার। দুটো ছোট মেয়ে বসে আছে। তাদের পরনে ফ্যান্সি ড্রেসের মতো চড়াদাগের পোশাক। সুটপরা মধ্যবয়স্ক বড়লোক দম্পতিরা বসে আছেন কোনও কোনও টেবিলে। মৌসুমির অবাক লাগল, এত টেবিল খালি কেন? নেপথ্যে সংগীত বাজছে না কেন? এমন ঠান্ডা ঘর নয়, সে চেয়েছিল উষ্ণ, জমজমাট কিছু। মাটির নীচের ঘর হলেও হলটার ছাত বেশ উঁচু। এয়ার কন্ডিশনারের কল্যাণে শীত করছে। মৌসুমির খালি হাত আর পা জমে যাচ্ছে। সে পশমিনা শালটা নিবিড় করে নিজের শরীরে জড়িয়ে নিল।

"জমে যাচ্ছি যে! অনুরোধ করলে এসি বন্ধ করে দেবে?"

"মনে হয় না। তুমি আমার জ্যাকেটটা নিতে পারো," নিখিল বলল।

"না, তার দরকার নেই," মৌসুমি মিষ্টি করে হাসল। কিন্তু তার মনের মধ্যে এই চাপা হতাশার ভাবটা যাচ্ছে না। ওদের টেবিলে সার্ভ করছে দু'জন বাংলাদেশি ছেলে। তারা ওয়েস্টকোট আর কালো প্যান্ট পরে রুপোর চিমটে দিয়ে প্লেটে গরম রুটি তুলে দিচ্ছে। এই ছেলে দু'টোকে দেখেও বিরক্ত লাগছে মৌসুমির। বিরক্ত লাগছে কারণ ওয়েটাররা অর্ডার নেওয়ার সময় চোখের দিকে না তাকিয়ে টেবিলে রাখা মিনারেল ওয়াটারের বোতলটার দিকে তাকিয়ে কথা বলে। এখন টেবিল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। অর্ডার দিয়ে দেওয়ার পরও মৌসুমির মনের একটা ঘ্যানঘেনে অংশ যেন তাকে বলে চলেছে, এখানে আর না বসলেই ভাল হয়। কয়েকসপ্তাহ আগে একটা চুলকাটার দোকানে ঠিক এটাই করেছিল সে। দামি হেয়ার স্টাইলিং সালোঁর গদিওয়ালা চেয়ারে বসে অ্যাপ্রন বাঁধা হয়ে যাওয়ার পর সে সটান উঠে বেরিয়ে গিয়েছিল। কারণ হেয়ার স্টাইলিস্টের হাইতোলা আর চুলে হাত দিয়ে দেখার সময় বিরক্ত মুখভঙ্গি তার সহ্য হয়নি। ডোনাল্ড আর অ্যাস্ট্রিডের এই জায়গাটা পছন্দ হল কেন? হয়তো খাবারটা ভাল, মৌসুমি নিজেকে প্রবোধ দেয়। কিন্তু টেবিলে খাবার এসে পৌঁছোলে সেটাও ভাল লাগে না তার। পরিমাণ বেশ কম কিন্তু সাজানোর ঘটা অনেক বেশি। সাদা চৌকো প্লেটে খাবার দিয়ে গিয়েছে। সাধারণত খেতে খেতে মাঝপথে ওরা দু'জনে প্লেট বদলাবদলি করে নেয়, কিন্তু আজ মৌসুমি তা করল না। নিখিলের খাবারের স্বাদ তার মোটেই পছন্দ হয়নি। সে নিজের খাবার তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলল। তারপর, মনে হয় অনেকক্ষণ ধরে, নিখিলের

খাওয়া শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকল।

ভুরু কুঁচকে হঠাৎ বলল, "এখানে আসা ঠিক হয়নি।"

"কেন? বেশ জায়গা।"

"জানি না। আমি যা ভেবেছিলাম, তা মোটেই নয়।"

"তাতে কী? আমরা নিজেদের এনজয় করি।"

কিন্তু মৌসুমি কোনও মজাই পায় না। খাওয়া শেষ হয়ে আসে কিন্তু তার পেট ভরেনি, দুটো ককটেল আর এক বোতল ওয়াইনেও মৃদুতম নেশাও হয়নি। নিখিলের প্লেটে সরু পাখির হাড়গুলো দেখে তার ঘেন্না করছিল। খাবার শেষ করতে আর কতক্ষণ লাগবে নিখিলের? শেষ হলে মৌসুমি সিগারেট ধরাতে পারে।

"ম্যাডাম, আপনার শাল," মৌসুমির দিকে পশমিনাটা বাড়িয়ে ধরে আছে একটা বাংলাদেশি ছেলে। শালটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।

"সরি," মৌসুমি বলে। এত অগোছালো হয়ে পড়ল সে? তারপর লক্ষ করল তার কালো জামাটা লাইল্যাক রঙের সুতোয় ভরে গেছে। ওগুলোকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল, কিন্তু বিড়ালের রোমের মতো পোশাকে আটকে থাকল সুতোগুলো।

"কী হল?" প্লেট থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল নিখিল।

"কিছু না," বলল মৌসুমি। নিখিলের দেওয়া দামি উপহারের খুঁত বের করে তাকে কষ্ট দিতে চায় না সে।

ডিনার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। যা ভাবা গিয়েছিল, রেস্তোরাঁটা তার চেয়ে অনেক বেশি খরচসাপেক্ষ। ক্রেডিট কার্ড বের করা হল। সে দেখল, নিখিল বিলে সই করছে। বিলের সঙ্গে মানিয়ে টিপ্‌স যা দিতে হচ্ছে, তার পরিমাণ অনেকটাই। নিখিলকে তা দিতে দেখে হঠাৎই নিজেকে খুব ছোট মনে হল তার, কেন এত খরচ করতে হবে তাদের? কিন্তু এও সত্যি যে, ওয়েটারের কাজে কোনও ভুল সে খুঁজে পায়নি। অনেকগুলো টেবিল এর মধ্যেই পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে, চেয়ারগুলোকেও টেবিলের উপর উলটে রাখা।

মৌসুমি বলল, "আমি ভাবতেই পারছি না, ওরা এর মধ্যেই বন্ধ করার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।"

গোগোল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "রাত হয়েছে। ওরা হয়তো রবিবার তাড়াতাড়ি বন্ধ করে।"

"আমাদের চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারত," মৌসুমির গলায়

দলাপাকানো কান্না আটকে আছে, চোখ দুটো ভরে যাচ্ছে জলে।

"কী হয়েছে মৌসুমি? তুমি কি কিছু বলতে চাও?"

মৌসুমি মাথা নাড়ল। কোনও কিছু ব্যাখ্যা করার মতো অবস্থায় নেই সে। তার মনে হল আজকের দিনটা পিছনে ফেলে রেখে বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়ে। বাইরে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। তাই আগের পরিকল্পনামাফিক হাঁটার বদলে ট্যাক্সি নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাওয়াই ঠিক হল।

"সত্যিই কি তোমার কিছু হয়নি?" গোগোল ফেরার পথে মৌসুমিকে জিজ্ঞেস করল। মৌসুমি কিছু বলছে না দেখে সে ক্রমশই ধৈর্য হারাচ্ছিল। যে-সব রেস্তোরাঁ এখনও বন্ধ হয়নি, সেগুলোর আলোকিত জানালার দিকে তাকিয়ে মৌসুমি বলল, "আমার পেট ভরেনি।" রেস্তোরাঁগুলো খুবই সাধারণ, আঁকিবুকি কাটা কাগজের প্লেটে খেতে দেওয়া হয়। ভিতরে কাঠের গুঁড়ো রঙের মেঝে। তবে হঠাৎ দেখলে খুব আকর্ষণীয় মনে হয় বটে। এমনিতে এমন রেস্তোরাঁয় মৌসুমি কখনও ঢোকে না। কিন্তু আজ সে বলল, "আমি একটা পিৎজ়া খেতে পারি।"

দু'দিন পরে নতুন সেমেস্টার শুরু হয়ে গেল। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি মৌসুমির অষ্টম সেমেস্টার। এবার থেকে ক্লাসরুমের পড়া শেষ হয়ে গেল তার। পরীক্ষার পাটও শেষ। এতে মৌসুমি খুব খুশি, লম্বা ছাত্রজীবন থেকে মুক্তি পাচ্ছে বলে। যদিও থিসিস লেখা এখনও বাকি এবং পরামর্শদাতার কাছে কাজ এগোনোর খতিয়ান দিয়ে যেতে হবে, তবু সারা জীবনের গতেবাঁধা রুটিন থেকে এ একধরনের মুক্তি বই কী। তাকে একটি ক্লাস নিতে হয়। সপ্তাহে তিনদিন সোম-বুধ-শুক্র, সব মিলিয়ে তিন ঘণ্টা। এখন মৌসুমির কাছে সবচেয়ে বড় কাজ, ছাত্রদের নাম মনে রাখা। তার ছাত্ররা যখন ভাবে যে, সে আসলে ফরাসি বা আধা-ফরাসি, তখন ভারী ভাল লাগে। সে যে নিউ জার্সি থেকে এসেছে আর তার বাবা-মা বাঙালি, তা বললে ছাত্রদের মুখে যে অবিশ্বাসের ভাব ফুটে ওঠে, তা দেখতেও বেশ আহ্লাদ হয় তার।

মৌসুমিকে সকাল আটটার ক্লাস পড়াতে বলা হয়েছে। প্রথমে এতে বিরক্ত হয়েছিল সে, কিন্তু এই ভোরবেলায় স্নান সেরে, সেজেগুজে কাগজের কাপে সাদা কফি খেতে খেতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে বেশ ঝরঝরে লাগছে। এত সকালে উঠে বেরোতে পারাটাই তো একধরনের সাফল্য। সে যখন

ঘুমিয়েছে, নিখিল তখন ঘুমিয়ে। অ্যালার্ম ঘড়ির শব্দেও ঘুম ভাঙেনি। আগের দিন রাতেই মৌসুমি পোশাক আর কাগজপত্র ঠিকঠাক করে রেখেছিল। স্কুল থেকে বেরোনোর পর এই প্রথমবার। আধা-অন্ধকারে আসন্ন দিনটার প্রত্যাশা নিয়ে ঘুম থেকে উঠতেও ভাল লেগেছিল আর এই ভোরে রাস্তা দিয়ে হাঁটাও ভাল লাগছে। তাদের নিত্যদিনের রুটিন থেকে অন্যরকম আজকের এই দিন। অন্যদিন নিখিল যখন স্নান করে, সুট পরে দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরোয়, তখন মৌসুমি দিনের প্রথম কফির কাপটা নিয়ে সবে চুমুক দিয়েছে। আজ শোবার ঘরের কোনায় কাজ করার টেবিলে বসতে হয়নি সকালে, মৌসুমির আনন্দের এটাও একটা কারণ। এমনিতেই টেবিলটার চারপাশে ময়লা কাপড়জামা ঠাসা ব্যাগ পড়ে আছে। অনেকদিন ধরেই ভাবা হচ্ছে, সেগুলো লন্ড্রিতে দিতে হবে। কিন্তু হয়ে উঠছে না। আসলে যতদিন নতুন মোজা বা অন্তর্বাস কেনার দরকার নিতান্ত জরুরি না হয়ে উঠছে, ততদিন এমন গাফিলতি হয়েই থাকে ওদের। কে জানে বিবাহিতা মহিলা হয়েও কতদিন মৌসুমিকে এমন ছাত্রদের মতো জীবন কাটাতে হবে! তার পড়াও তো অনেকটা এগিয়েছে আর নিখিলও নেহাত মন্দ চাকরি করে না। অবশ্য গ্রাহামের কথা আলাদা। সে যা রোজগার করত তাতে ওদের দু'জনেরই হেসেখেলে চলে যেত! তবে তাতেও মৌসুমি পুরোপুরি স্বস্তিবোধ করেনি। ওর নিজের রিসার্চের কাজটা তা হলে নেহাতই অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠত। একবার ভাল চাকরি করতে শুরু করলে আর এভাবে কাটবে না, মৌসুমি নিজেকেই প্রবোধ দেয়। কোথায় প্রথম চাকরিটা পাবে সে? হয়তো এখান থেকে অনেক দূরে তেপান্তরের মাঠের পারে! সে নিখিলের সঙ্গে এই নিয়ে রসিকতা করে। বলে, হয়তো বছরখানেকের মধ্যে এখানকার পাট তুলে তাদের আইওয়া বা কালামাজুতে চলে যেতে হবে। অবশ্য দু'জনেই মনে-মনে জানে, নিখিল নিউ ইয়র্ক ছেড়ে যেতে পারবে না। মৌসুমিকেই দূরের সেই জায়গা থেকে সপ্তাহান্তে উড়ে আসতে হবে, আবার ফিরে যেতে হবে। তবু, এ ব্যাপারটা ভাবতে তার ভালই লাগে: এমন একটা জায়গায় গিয়ে জীবন শুরু করা, যেখানে কেউ তাকে চেনে না, যেমনটি প্যারিসে করা গিয়েছিল। মৌসুমি নিজের বাবা-মায়ের জীবনের একমাত্র এই দিকটাই শ্রদ্ধা করে, এই সম্পূর্ণ নতুন দেশে গিয়ে বসবাস করা আর মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা।

ডিপার্টমেন্টের কাছে পৌঁছে মৌসুমি দেখল, কিছু একটা ঘটেছে।

ফুটপাথে একটা অ্যাম্বুল্যান্স দাঁড়িয়ে, সেটার পিছনের দরজাগুলো খোলা। কাছেই সাদা পোশাক পরা হাসপাতালের লোক ওয়াকিটকিতে কথা বলে যাচ্ছে। রাস্তা পেরোনোর সময় মৌসুমি উঁকি মেরে অ্যাম্বুল্যান্সের ভিতরটা দেখল। কেউ নেই। সাদা বিছানাটা পড়ে আছে। শিউরে উঠল সে। দোতলার হলওয়ে লোকে লোকারণ্য। কে আহত হল? ছাত্র না অধ্যাপক? কাউকে চিনতে পারল না মৌসুমি, শুধু কয়েকজন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। "কে যেন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে," তারা বলছিল, "আমরা জানি না কে।" একটা দরজা খুলে গেল। ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্রদের হটিয়ে একটা স্ট্রেচার বের করে আনা হল। মৌসুমি ভেবেছিল, হুইল চেয়ারে বসা কাউকে দেখতে পাবে। কিন্তু স্ট্রেচারের উপর সাদা চাদরে ঢাকা শরীরটা দেখে গলা শুকিয়ে কাঠ। পাশে দাঁড়িয়ে কেউ-কেউ আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠছে। মৌসুমির হাত নিজের অজান্তেই মুখের উপর চলে এসেছে। অনেকেই মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে, মাথা নাড়ছে। স্ট্রেচারের একটা দিক দিয়ে ঘিয়ে রঙের হিলছাড়া চটিপরা পা বেরিয়ে আছে। বোঝা যায়, শরীরটা কোনও ভদ্রমহিলার। একজন অধ্যাপকের কাছ থেকে মৌসুমি শুনল, অ্যালিস নামে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট চিঠিপত্র বেছে আলাদা করে রাখার সময় হঠাৎই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। হাসপাতালের লোকজন আসার আগেই সে মারা যায়। অ্যালিসের বয়স হবে তিরিশ। অবিবাহিত ছিল, সারাদিন ভেষজ চায়ের কাপে চুমুক দিত। মৌসুমির সঙ্গে তার তেমন কথাবার্তা হয়নি। অল্পবয়সেই কেমন যেন বুড়োটে আচরণ ছিল তার।

মৌসুমির গা গুলিয়ে উঠল। তার জীবনের সীমান্তরেখার কাছাকাছি অথচ কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান ছিল অ্যালিসের। রোজকার জীবনে দেখা হলেও কোনও আত্মিক যোগাযোগ ছিল না। তবু অ্যালিসের মৃত্যু নাড়িয়ে দিয়ে গেল মৌসুমিকে। টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টদের ফাঁকা ঘরটায় ঢুকে বাড়িতে নিখিলকে একটা ফোন করল। কেউ ফোন না ধরায় অফিসেও করল। সেখানেও কোনও উত্তর নেই। ঘড়ি দেখে মৌসুমি বুঝতে পারল নিখিল সম্ভবত পাতালরেলে রয়েছে, অফিসে যাচ্ছে। হঠাৎ নিখিলকে না পেয়ে ভালই লাগল মৌসুমির। অ্যালিসের মৃত্যুর খবরটা ওকে বললে ওর নিশ্চয়ই নিজের বাবার আকস্মিক মৃত্যুর কথা মনে পড়ে যেত। মৌসুমির ইচ্ছে হল, তখনই বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যে একটা ক্লাস নিতে হবে। নিজেকে সামলে জ়েরক্স রুমে ঢুকে পড়ল সে। সিলেবাসের একটা কপি করতে হবে।

ফ্লবেয়ারের লেখা একটা ছোট গদ্যাংশ জেরক্স করে ক্লাসে অনুবাদের জন্য নিয়ে যেতে হবে। জেরক্স করা হলে তার খেয়াল হল, স্টেপলার নেই। অভ্যাসবশত অ্যালিসের ডেস্কের দিকেই এগোল মৌসুমি। ডেস্কে তখন ফোন বাজছে। অ্যালিসের কার্ডিগানটা চেয়ারের উপর রাখা। একটু ভয়ে-ভয়েই ডেস্কের ড্রয়ারটা খুলল মৌসুমি। কিছু কাগজ আটকানোর ক্লিপ আর স্যাকারিনের প্যাকেটের নীচে স্টেপলার রাখা আছে। সেটার গায়ে কাগজ সেঁটে লেখা, অ্যালিস। ডেস্কের উপর সেদিন আসা চিঠিগুলো ঢিপি করে রাখা। ঝেড়েবেছে অধ্যাপক বা অন্যদের নিজস্ব চিঠির বাক্সে ঢোকানো হয়নি।

মৌসুমি নিজের বাক্সে ক্লাসের রোস্টার খুঁজতে গেল। বাক্সটা খালি। চিঠির স্তূপ থেকে নিজের চিঠিগুলো বেছে নিতে হবে। মৌসুমি একটা চিঠি তুলে উপরের নামটা দেখল। তারপর কী ভেবে চিঠিটা ঠিক লোকের বাক্স ঢুকিয়ে দিল। তারপর আর একটা, আরও একটা। নিজের রোস্টার পেয়ে গিয়েও সে থামল না। প্রত্যেকটা চিঠি তার ঠিক মালিকের মেলবক্সে রাখতে লাগল। অ্যালিসের অসম্পূর্ণ কাজ পুরো করার দায়িত্ব যেন সে নিজেই নিয়েছে। এই মননহীন কাজে মিশে যেতে যেতে মৌসুমির মন অনেকটা শান্ত হয়ে এল। ছোটবেলা থেকেই জিনিসপত্র গোছানোর প্রতি মৌসুমির সহজাত আগ্রহ আছে। বাড়ির সব আলমারি বা ড্রয়ার গোছানোর দায়িত্ব সে চিরকাল নিজেই নিয়ে নিত। ফ্রিজ পরিষ্কার করা বা কাঁটাচামচ রাখার ড্রয়ার গোছানোর কাজও ছিল তারই। গরমের ছুটির লম্বা দিনগুলো এই স্বতঃপ্রবৃত্ত কাজেই কাটত মৌসুমির। তার মা ফ্যানের পাশে বসে তরমুজের শরবত খেতেন আর মেয়ের ঘরগোছানো দেখতেন। এখন মৌসুমি সব চিঠিই গুছিয়ে ফেলেছে প্রায়। মোটে কয়েকটা পড়ে আছে। সে মুঠোয় করে শেষ চিঠিগুলো তুলে নিল। হঠাৎ তার মধ্যে একটা খয়েরি খামের উপর লেখা প্রেরকের নামে চোখ আটকে গেল তার।

স্টেপলার, নিজের চিঠি আর ওই খামটা নিয়ে সে নিজের বসার ঘরে ফিরল। শেষ খামটা পাঠানো হয়েছে তুলনামূলক সাহিত্যের এক প্রোফেসরের নামে। তিনি জার্মান ও ফরাসি, দু'টি ভাষাই পড়ান। মৌসুমি খামটা খুলে ফেলল। ভিতরে একটা চিঠি, তার সঙ্গে লাগানো বায়োডেটা। এক মিনিট সুন্দর লেসার প্রিন্ট করা বায়োডেটার উপরে লেখা নামটা থেকে চোখ ফেরাতে পারল না সে। নামটা মনে আছে। প্রথম শোনার পর সে

নামটারই প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। দিমিত্রি দেসজারদিনস। নামটার মালিক নিজের পদবিটিকে ফরাসি উচ্চারণে দেজারদ্যাঁ না বলে ইংরেজি উচ্চারণে দেসজারদিনস বলত। এতদিন ধরে ফরাসি নিয়ে চর্চা করেও মৌসুমি সেই ইংরেজি উচ্চারণেই নামটাকে ভাবে। নামের নীচে ঠিকানা লেখা: ওয়েস্ট ১৬৪র্থ স্ট্রিট। বায়োডেটার মালিক জার্মান পড়ানোর জন্য একটা চাকরি খুঁজছে। লেখা আছে, গত দশ বছরে সে কী কী করেছে, কোথায় কোথায় থেকেছে। মৌসুমি পড়ে যায়। ইউরোপ ভ্রমণ। বি বি সি-তে চাকরি। জার্মান আর ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশিত লেখা। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জার্মান সাহিত্যে ডক্টরেট।

দিমিত্রির সঙ্গে মৌসুমির দেখা হয়েছিল বহুদিন আগে। হাইস্কুলের শেষ দিনগুলোয়। সে এক অদ্ভুত সময়। মৌসুমি আর তার দুই বন্ধুর কলেজ ছাত্র হওয়ার ভারী শখ হয়েছিল। সমবয়সি কোনও ছেলে তাদের পাত্তা দিত না, ডেটিংও করত না। তাই তারা তিনজনে প্রিন্সটনে চলে যেত। ক্যাম্পাসে ঘুরত, বইয়ের দোকানে বই ঘাঁটত, যে-সব বিল্ডিঙে আইডেন্টিটি কার্ড ছাড়া ঢোকা যায়, সেখানে ঢুকে হোমওয়ার্ক করত। বাবা-মায়েদের এ নিয়ে কোনও আপত্তি ছিল না। তাঁরা ভাবতেন, মেয়ে লাইব্রেরিতে বা লেকচার শুনতে যাচ্ছে। মৌসুমির বাবা-মার বিশ্বাস ছিল, মেয়ে প্রিন্সটনেই পড়বে আর বাড়ি থেকে যাতায়াত করবে। একদিন মৌসুমি দুই বন্ধুর সঙ্গে ঘাসে বসেছিল। এমন সময় বেশ কিছু ছাত্র এসে তাদের অনুরোধ করে বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদে আয়োজিত এক মিছিলে যোগ দিতে। মিছিল হবে ওয়াশিংটনে।

পরদিন খুব ভোরে ওয়াশিংটনে পৌঁছোতে হবে, তাই মৌসুমিরা রাতের বাসে রওনা হয়েছিল। এর জন্য বাড়িতে তিনজনকেই মিথ্যে বলতে হয়েছিল। ওরা বলেছিল, রাতে একে অপরের বাড়িতে থাকছে। বাসে সকলেই গাঁজায় দম দিচ্ছিল আর একই গান ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাজাচ্ছিল। মৌসুমির বন্ধুরা তার দুই সারি পিছনে জায়গা পেল। দিমিত্রি বসেছিল মৌসুমির পাশের সিটে। দিমিত্রির বাসের কোনও কিছুতেই আগ্রহ দেখা গেল না, মিছিলের সদস্য হয়েও সে যেন সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন। রোগাটে গড়ন, লম্বাতেও তেমন কিছু নয়, সরু চোখ, আর সব মিলিয়ে অদ্ভুত আকর্ষক চেহারা যাকে কোনও অর্থেই সুন্দর বলা চলে না। কোঁকড়া সোনালি চুল, কিন্তু তখনই টাক পড়তে আরম্ভ করেছে। দাড়ি কামানো হয়নি, নখও কাটা হয়নি অনেকদিন ধরে। পরেছিল সাদা শার্ট, হাঁটুর কাছে সুতো ফেঁসে যাওয়া

জিনস আর সরু সোনালি ফ্রেমের চশমা। হঠাৎই মৌসুমির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিল সে। নিজের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করেনি। তার বয়স তখন সাতাশ, উইলিয়াম্‌স কলেজে ইয়োরোপিয়ান ইতিহাসের ছাত্র ছিল। সে সময় প্রিন্সটনে জার্মান পড়ছিল দিমিত্রি। তার বাবা-মা দু'জনেই প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান, তাঁদের সঙ্গেই থাকছিল সে। কিন্তু দমবন্ধ হয়ে আসছিল তার। কলেজ শেষ করে সে নাকি এশিয়া আর ল্যাটিন আমেরিকায় বহু জায়গায় ঘুরেছে। বলেছিল, কোনও সময় পি এইচ ডি করতে চায় সে। দিমিত্রিকে দারুণ লেগেছিল মৌসুমির। নাম জিজ্ঞেস করেছিল দিমিত্রি। মৌসুমি নাম বলতে সে কানটা মুঠো পাকিয়ে মৌসুমির দিকে এগিয়ে এনেছিল। বলেছিল, "এই নাম বানান করো কী করে?" মৌসুমি জানত নামের উচ্চারণ পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে সে। কিন্তু অন্য অনেকের মতো দিমিত্রিকে নিজের নামটা সাবধানে উচ্চারণ করতে শিখিয়েছিল। 'মৌ' ইংরেজি Toe-এর মতো করে বলতে হবে। কিন্তু দিমিত্রি মাথা নেড়ে বলেছিল, "আমি তোমাকে মাউস বলে ডাকব।"

নতুন ডাকনাম বেশ পছন্দ হয়েছিল মৌসুমির, আবার বিরক্তও লেগেছিল। বোকা-বোকা নামটা। কিন্তু নতুন নাম দিয়ে যেন মৌসুমিকে নবজন্ম দিয়েছিল দিমিত্রি। দাবি প্রতিষ্ঠা করেছিল। ধীরে ধীরে রাত বাড়ল, বাসের ভিতর সকলে ঘুমিয়ে পড়ল। দিমিত্রি মৌসুমির কাঁধে মাথা রাখল, মৌসুমি কিছুই বলল না। ভাবল, হয়তো দিমিত্রি ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তাই সে নিজেও ঘুমোবার ভান করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে মৌসুমি টের পেল, দিমিত্রি তার সাদা ডেনিমের স্কার্ট পরা পায়ের উপর হাত রেখেছে। ধীরে-ধীরে সেই হাত খুলতে লাগল স্কার্টের বোতাম। চোখ বোজা অবস্থায় একটা বোতাম খুলে পরের বোতামে পৌঁছোতে বেশ সময় লাগছিল, এদিকে বাস তখন ফাঁকা অন্ধকার হাইওয়ে দিয়ে তীব্র বেগে ছুটে চলেছে। দিমিত্রির মাথা মৌসুমির কাঁধে অনড়। সেই প্রথম শরীরে কোনও পুরুষের স্পর্শ অনুভব করল মৌসুমি। সে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে বসে রইল। ভীষণ ইচ্ছে করছিল, হাত বাড়িয়ে পাশের সেই পুরুষকে সে নিজেও স্পর্শ করে, কিন্তু ভয়ে পারেনি। শেষ পর্যন্ত দিমিত্রি চোখ খুলল। মৌসুমির কানের কাছে তার ঠোঁট। সতেরো বছর বয়সে প্রথমবার চুম্বনের স্বাদ পাওয়ার আকুলতা নিয়ে মৌসুমি মুখ ফেরাল। কিন্তু দিমিত্রি তাকে চুম্বন করল না। তার দিকে অপলকে তাকিয়ে শুধু বলল, "জেনে রাখো, তুমি অনেককে কষ্ট দেবে।" তারপর সে

নিজের সিটের দিকে সরে গিয়ে আবার চোখ বুজেছিল, হাত সরিয়ে নিয়েছিল মৌসুমির কোল থেকে। মৌসুমি রাগে লাল হয়ে এই পুরুষটির দিকে তাকিয়েছিল, এই সতেরো বছর বয়সে সে এখনও কাউকে কষ্ট দিতে পারেনি তা বুঝে ফেলার জন্য রাগ। সঙ্গে সঙ্গে এই অদ্ভুত মন্তব্যে খুশি না হয়েও পারেনি। বাকি সময়টা সে স্কার্টের বোতাম খুলেই রাখল যদি দিমিত্রির হাত ফিরে আসে। কিন্তু আর তাকে ছোঁয়নি দিমিত্রি। রাতে কী হয়েছিল, তার স্মৃতিটুকুও যে দিমিত্রির মনে আছে, তা মনে হয়নি। মিছিল চলাকালীন সে মৌসুমির থেকে দূরে রইল। ফেরার পথে বাসেও কাছাকাছি এল না।

তারপরে যতবারই বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছে, দিমিত্রিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে। কয়েকসপ্তাহ পর একদিন দেখা গেল, দিমিত্রি কয়েকটা বই নিয়ে একা-একা হেঁটে ফিরছে। তারা ক্যাম্পাসের বেঞ্চে বসে একসঙ্গে কফি খেল। গোদারের আলফাভিল দেখতে যেতে এবং চিনে খাবার খেতে অনুরোধও করল দিমিত্রি। সেদিন যা পরেছিল, তা ভাবলে আজও মৌসুমির লজ্জা করে। জিন্‌সের উপর বাবার একটা পুরনো ব্লেজার, সেটার হাতা আবার শার্টের মতো গুটিয়ে পরা, তলার লাইনিং দেখা যাচ্ছে। সেটাই তার জীবনের প্রথম ডেট। বাবা-মা পার্টিতে গেছেন এমন একটা দিন কায়দামতো বেছে নিয়েছিল সে। সিনেমাটার মাথামুণ্ডু কিছুই দেখেনি সে, রেস্তোরাঁয় গিয়েও কিছুই খায়নি। চিনে খাবারের পর ওরা ফরচুন কুকি দিয়ে গিয়েছিল। দিমিত্রি ভবিষ্যদ্‌বাণী না পড়েই কুকিদুটো খেয়ে নিল। আর তখনই মৌসুমি ভুলটা করেছিল। স্কুলের শেষ বছরের নাচের অনুষ্ঠানে ওর জুড়ি হয়ে যাওয়ার জন্য দিমিত্রিকে অনুরোধ করেছিল। শান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করল দিমিত্রি। তারপর ওকে গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল, বাড়িতে নামিয়ে দেওয়ার আগে গালে আলতো করে চুমুও খেয়েছিল। কিন্তু আর কোনওদিন ফোন করেনি। সেই সন্ধ্যায় মৌসুমির সঙ্গে বাচ্চা মেয়ের মতো ব্যবহার করেছিল সে। সে অপমান মৌসুমি ভুলতে পারেনি। সেই বছরই গ্রীষ্মের সময় দিমিত্রির সঙ্গে সিনেমাহলে দেখা হয়েছিল একবার। তার সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল। লম্বা, কোমর পর্যন্ত চুল, গালে লাল দাগ। মৌসুমি পালাতে চেয়েছিল, কিন্তু দিমিত্রি জোর করে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়, "এ হল মৌসুমি।" যেন অনেকদিন ধরে মৌসুমির নামটি উচ্চারণ করার জন্যই সে অপেক্ষা করছিল। বলেছিল, সে কিছুদিনের জন্য ইউরোপ যাচ্ছে। পাশের মেয়েটির মুখের ভাব দেখে মৌসুমি বুঝেছিল, সঙ্গে সে মেয়েটিও

যাচ্ছে। মৌসুমি বলল যে, সে ব্রাউনে ভরতি হতে চলেছে। মেয়েটি অন্যমনস্ক থাকার সময় দিমিত্রি মৌসুমিকে বলেছিল, "তোমায় দারুণ দেখাচ্ছে।"

ব্রাউনে পড়ার সময় নানা দেশ থেকে দিমিত্রির পাঠানো পোস্টকার্ড পেত মৌসুমি। রংবেরঙের ডাকটিকিট সাঁটা খামের চিঠিও। ওর হাতের লেখা বেশ খারাপ, ছোট্ট-ছোট্ট। চোখ কুঁচকে পড়তে হয়। ফেরত ঠিকানা থাকত না কখনও। অনেকদিন পর্যন্ত মৌসুমি সে-সব চিঠি বইয়ের ব্যাগে, ডায়েরির ফাঁকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। ডায়েরিটা কী পেটমোটা হয়ে গিয়েছিল তখন! মাঝে মাঝে মৌসুমির পছন্দ হতে পারে অমন বইও পাঠাত দিমিত্রি। কয়েকবার গভীর রাতে ফোনও করেছে। রাতের অন্ধকারে ডর্মিটারির বিছানায় শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলত মৌসুমি। প্রায় সারারাত। সকালের ক্লাসে যেতে পারত না পরদিন। একটা ফোন বেশ কয়েকসপ্তাহ জিইয়ে রাখত মৌসুমিকে। দিমিত্রি বলত, "আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব। তোমাকে ডিনারে নিয়ে যাব।" কিন্তু সত্যি কোনওদিন এল না সে। শেষদিকে চিঠির তোড় কমে এল। শেষবার গ্রিস আর টার্কি থেকে লেখা কত গুলো চিঠি একই সঙ্গে পেয়েছিল মৌসুমি। সময়মতো পোস্ট করা হয়নি, তাই একবারে পাঠানো। আর কিছু বইও পাঠিয়েছিল বটে। তারপর মৌসুমি প্যারিসে চলে গেল।

মৌসুমি আর একবার দিমিত্রির বায়োডেটা পড়ল, তারপর সঙ্গের চিঠিটাও। চিঠিতে অবশ্য লেখাপড়া সংক্রান্ত তথ্য ছাড়া আর কিছু নেই। লেখা আছে, কয়েকবছর আগে দিমিত্রি আর এই চিঠির প্রাপক অধ্যাপকের সঙ্গে এক সেমিনারে দেখা হয়েছিল। তৃতীয় লাইনে একটা ফুলস্টপ বাদ গিয়েছে। মৌসুমি সরু পেন দিয়ে সাবধানে সেটা বসিয়ে দিল। ঠিকানাটা টুকে নিতে কলম সরছিল না মৌসুমির, কিন্তু সেটা ভুলে যাওয়াও সম্ভব নয়। বায়োডেটার কাগজটা জেরক্স করে নিল ব্যাগের তলায় ঢুকিয়ে নিল সে। তারপর একটা নতুন খামে অধ্যাপকের নামঠিকানা টাইপ করে চিঠি আর বায়োডেটা তার মধ্যে ঢুকিয়ে অধ্যাপকের মেলবক্সে ফেলে দিল। খামে কোনও স্ট্যাম্প বা ডাকটিকিট রইল না। তাতে কি কারও সন্দেহ হবে? মৌসুমি নিজেকে প্রবোধ দিল, দিমিত্রি নিজে হাতেও খামটা দিয়ে যেতে পারত। কেউ সন্দেহ করবে না। ভাবতেই কল্পনার ছবিতে হারিয়ে গেল সে। ঠিক এইখানে, এই ডিপার্টমেন্টে দিমিত্রি দাঁড়িয়ে আছে, এই চিন্তাটা তাকে

একাধারে আকুল আর শরীরী মোহে বিভোর করে তুলল। দিমিত্রির জন্য মৌসুমি চিরকালই এমন করে ব্যাকুল হয়েছে।

কোথায় দিমিত্রির ফোন নম্বর লিখবে মৌসুমি? এইটাই সবচেয়ে কঠিন। ডায়েরির ঠিক কোন পাতাটায়? কোনও গুপ্ত সংকেত থাকলে ভাল হত। প্যারিসে এক ইরানি অধ্যাপকের সঙ্গে স্বল্পকালীন যৌনসংসর্গে জড়িয়ে পড়েছিল সে, যিনি পারসিক ভাষায় ছাত্রদের নাম ইনডেক্স কার্ডের পিছনে লিখে রাখতে পারতেন। সঙ্গে সেই ছাত্রকে চেনবার জন্য কোনও নিষ্ঠুর শারীরিক বর্ণনা। একবার পড়েও শুনিয়েছিলেন। কারও নামের পাশে লেখা ছিল: খারাপ ত্বক, কারও নামের পাশে: নোংরা নখ। মৌসুমির পক্ষে তা সম্ভব নয়, সে বাংলা লিখতে জানে না। ঠাকুমা একবার বাংলায় নাম লিখতে শিখিয়েছিল বটে, কিন্তু মৌসুমির তা মোটেও মনে নেই। শেষ পর্যন্ত ডায়েরির 'ডি' পাতায় সে শুধু ফোন নম্বরটা লিখে রাখল। সঙ্গে নামটা লিখল না। শুধু নম্বর লেখাটা ঠিক বিশ্বাসঘাতকতা নয় বলে মনে হল তার। নাম ছাড়া নম্বরের কোনও মালিকানা থাকে না, যে কারও নম্বর হতে পারে। নিজের বসার জায়গায় বসে মৌসুমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। তার পেটের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠছে। ভারটিগো নয়, এ তার বিপরীত। তীব্র বেগে আকাশের দিকে উঠে যাওয়ার সময় নাভিতে যে-টান লাগে, এ ঠিক তেমনই।

সেদিন রাতে বাড়িতে ফিরে বইয়ের তাকে কী যেন খুঁজছিল মৌসুমি। বিয়ের পর থেকে তাদের দুজনের বই মিশে গিয়েছে। নিখিলই এবাড়িতে আসার পর বইগুলো গুছিয়ে রেখেছিল। তাই এখন মৌসুমি কিছুই খুঁজে পায় না। যেদিকে তাকায়, নিখিলেরই বই। ডিজ়াইনিং ম্যাগাজ়িন বা গ্রোপিয়াস বা ল্য করবুজ়িয়্যারের উপর মোটা মোটা বই। নিখিল ডাইনিং টেবিলে উপুড় হয়ে ব্লুপ্রিন্ট দেখছিল। জিজ্ঞেস করল, "কী খুঁজছ?"

"স্তাঁদাল," মৌসুমির উত্তর ঠিক করাই ছিল। অবশ্য কথাটা মিথ্যেও নয়। *দ্য রেড অ্যান্ড দ্য ব্ল্যাক*-এর একটা পুরনো সংস্করণ। ফরাসি নয়, ইংরেজি অনুবাদে। সেটা মাউসকে দিমিত্রির উপহার দেওয়া একটা বই। সেই সময়ে ওই বইটাই মৌসুমির কাছে প্রেমপত্রের মতো ছিল, রোজ রাতে ওটা বালিশের তলায় রেখে ঘুমোত। পরে গদির নীচে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। অনেকদিন ধরে বইটা তার কাছে যত্নে ছিল। প্যারিস থেকে নিউ ইয়র্ক— সব

জায়গায়। বইয়ের তাকে সেটার দিকে নজর পড়লেই মৌসুমির বুক কেঁপে উঠত। প্রথমদিকে দিমিত্রির অদ্ভুত আকর্ষণ আর তার প্রতি লোকটার আগ্রহের কথা ভেবে, পরের দিকে দিমিত্রি কোথায় আছে, কী করছে, তা ভেবে। কিন্তু এখন বইটা একেবারেই দেখতে পাচ্ছে না। কোথায় গেল? অনেকদিন চোখেও পড়েনি। গ্রাহামের বইপত্রের সঙ্গে ভুল করে চলে গিয়েছে? নাকি গতবছর যখন কিছু বই প্যাকিং বাক্সে ভরে বাবা-মায়ের বাড়ির বেসমেন্টে রেখে আসার সময় সেই বাক্সেই ভরে ফেলেছে? এই অ্যাপার্টমেন্টে বইটা কি তা হলে নেই? পুরনো অ্যাপার্টমেন্টে বইটা প্যাক করার কথা মনে পড়ছে না, এখানে এসে প্যাকিং কেস থেকে বইটা বের করার কথাও তো মনে পড়ছে না। নিখিলকে জিজ্ঞেস করতে চায় না সে। সবুজ কাপড়ে বাঁধানো ছোট বই, উপরের ডাস্ট জ্যাকেটটা নেই। স্পাইনে কালো চতুর্ভুজের উপর নামটা লাল দিয়ে লেখা। হঠাৎই সেটা চোখে পড়ে গেল মৌসুমির। আশ্চর্য ব্যাপার। এই তাকটা তো একটু আগেই দেখেছে সে। মৌসুমি বইটা নিয়ে প্রথম পাতাটা খুলল। প্রথমেই প্রকাশকের লোগো। একটি নগ্ন মানুষ মশাল নিয়ে ছুটে চলেছে। তার নীচে দিমিত্রির লেখা। বল-পয়েন্ট পেনের জোর কাগজের অন্যদিকেও ফুটে বেরিয়েছে। দুটো পরিচ্ছেদ পড়ে উপন্যাসটা রেখে দিয়েছিল মৌসুমি, আর পড়া হয়নি। সেই পাতাটায় এখনও বুকমার্ক হিসেবে শ্যাম্পু কেনার হলদেটে একটা রসিদ রয়ে গিয়েছে। এই বইটা সে ফরাসিতে তিনবার পড়েছে। মৌসুমি এবার এই ইংরেজি অনুবাদটাও পড়ে ফেলল, অফিসে নিজের ডেস্কে বসে পড়তে সময় লাগল কয়েকদিন। সন্ধ্যাবেলা বাড়িতেও বিছানায় শুয়ে পড়ত, যতক্ষণ না নিখিল এসে তার পাশের জায়গাটা দখল করে।

পরের সপ্তাহে দিমিত্রিকে ফোন করল মৌসুমি। ততদিনে সে পুরনো চিঠিগুলোও খুঁজে বের করে ফেলেছে। একটা সাদামাঠা খয়েরি খামে ছিল সেগুলো, মৌসুমির ট্যাক্স রিটার্নের সঙ্গে। বারবার এ-ক'দিনে চিঠিগুলো পড়েছে সে, এতদিন পরেও দিমিত্রির শব্দচয়ন আর হাতের লেখা তাকে আকুল করে তুলছে। ফোন করার আগে বারবার নিজেকে বুঝিয়েছে, পুরনো বন্ধুকে ফোন করছে বই তো নয়। এভাবে হঠাৎ পুরনো পরিচিত কারও হদিশ পেলে সকলেই এভাবে ফোন করত। হয়তো সে এতদিনে বিবাহিত, ঠিক মৌসুমিরই মতো। তারা চারজনে একসঙ্গে ডিনার করবে, বন্ধু হয়ে উঠবে,

এমনও হতে পারে। কিন্তু সে নিখিলকে এ-সব কিছুই জানায় না। এক রাতে, সকলে বাড়ি চলে যাওয়ার পর, যখন একজন মোটে দারোয়ান পাহারা দিচ্ছে, তখন ড্রয়ারের পিছনে ঠেলে রাখা মদের বোতল থেকে কয়েকঢোঁক খেয়ে মৌসুমি ফোন করল। এমন এক রাতে যখন নিখিল ভাবছে সে ছাপতে দেওয়ার আগে একটা প্রবন্ধ শেষবার ঠিকঠাক করে নিচ্ছে।

মৌসুমি ডায়াল করল, শুনল ফোনটা বাজছে। চারবার। দিমিত্রি কি ওকে চিনতে পারবে? বুক দুরদুর করছে। যদি দরকার হয়, সে ফোন কেটে দেবে বলে তৈরি।

"হ্যালো!"

এ তো তারই কণ্ঠস্বর। "হাই দিমিত্রি।"

"বলছি। কে?"

মৌসুমি চুপ করে রইল। ইচ্ছে করলে এখনও ফোন কেটে দেওয়া যায়। "আমি মাউস।"

সোমবার আর বুধবার দেখা করতে লাগল ওরা। ক্লাস নেওয়া হয়ে গেলে মৌসুমি পাতালরেল ধরে সোজা শহরের বুকে দিমিত্রির অ্যাপার্টমেন্টে চলে যায়। সেখানে একসঙ্গে দুপুরের খাবার খায়। রান্নাগুলো বেশ উঁচুমানের। পোচ করা মাছ, ক্রিম দেওয়া আলু, সোনালি চিকেন। যে টেবিলে বসে ওরা খায়, সেটার একদিকে দিমিত্রির বই, কাগজ আর ল্যাপটপ ঠেলে সরিয়ে রাখা থাকে। খাওয়া হয়ে গেলে একসঙ্গে কনিয়াক আর সিগারেট খায় দু'জনে। এ-সব হয়ে গেলে দিমিত্রি মৌসুমিকে আদর করে। অ্যাপার্টমেন্টটা বড় হলেও জানালাগুলো বেশ ময়লা। ময়লা শার্শি দিয়ে রোদ এসে ঘর ভরিয়ে দেয়। দু'টো বড় ঘর আছে, সেগুলোর দেওয়াল থেকে রং উঠে আসছে, খালি কাঠের মেঝে আর অনেক প্যাকিং বাক্স। সেগুলো খোলা হয়নি। বিছানাটা নতুন, কিন্তু তার উপরে কখনওই চাদর পাতা থাকে না। উত্তাল শারীরিক মিলন শেষ হলে ওরা অবাক হয়ে দেখে, বিছানাটা জায়গা থেকে অনেকটা সরে গিয়েছে। দেওয়ালের গায়ে লেগে গিয়েছে বা টেবিলের গায়ে। দু'জনের শরীর যখন একত্রে লেপটে থাকে, তখন দিমিত্রি গভীর দৃষ্টিতে মৌসুমির দিকে তাকায়। যেন শিকারি পশু শিকার ধরতে তাড়া করেছে, উদ্দাম নিশ্বাস ফেলতে থাকে। ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ স্বস্তির আশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে তার মুখে। দিমিত্রির চুলে আর বুকের রোমে

পাক ধরেছে। ঠোঁট আর চোখের পাশে বলিরেখা। আগের থেকে মোটা হয়েছে সে। পেটে আর কোমরে লক্ষণীয় চর্বি লেগেছে। কিন্তু পা দুটো সরু হওয়ায় এখন নগ্ন অবস্থায় তাকে হাস্যকর দেখায়। সম্প্রতি উনচল্লিশ বছরে পড়েছে দিমিত্রি। বিয়ে করেনি, চাকরি করারও ইচ্ছে নেই তেমন। সারাদিন রান্না করে, বই পড়ে আর ক্ল্যাসিকাল সংগীত শুনে সময় কাটায়। সে সম্ভবত নিজের ঠাকুমার কাছে থেকে কিছু অর্থলাভ করেছে।

প্রথমবার তারা নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ছোট্ট, ভিড় ইতালিয়ান রেস্তোরাঁয় দেখা করেছিল। তারা পরস্পরের দিকে অপলকে তাকিয়ে ছিল সারাক্ষণ, কাকতালীয়ভাবে দেখা হওয়া নিয়ে কথা থামাতে পারছিল না। নিউ ইয়র্কে দিমিত্রি এসেছে মাত্র মাসখানেক আগে। এসেই নাকি মৌসুমিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ফোন নিখিলের নামে থাকায় তা পারেনি। তবে তাতে ক্ষতি কিছু হয়নি। এভাবে দেখা হওয়াই হয়তো ভাল। কিছুটা মদ পেটে পড়ার পর দু'জনে ঠিক করল একসঙ্গে ডিনার করেই বাড়ি ফিরবে। দিমিত্রির অর্ডার অদ্ভুত। স্যালাড, ল্যাম্ব টাং, পোচড ডিম আর পেসোরিনো চিজ়। মৌসুমি বলেছিল, চিজ়টা মোটেই খাবে না সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, বেশিটা তারই পেটে গিয়েছে। সেখান থেকে বেরিয়ে মৌসুমি পাস্তা আর রেডিমেড ভদকা সস কিনে বাড়ি ফিরেছিল। রাতে নিখিলের সঙ্গে সেগুলোই খেয়েছিল সে।

কেউ জানে না সে সোম আর বুধবার কোথায় যায়। দিমিত্রির বাড়ির কাছের মেট্রো স্টেশন থেকে বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় কোনও বাঙালি ফলওয়ালা বসে না। কোনও পরিচিত লোকও থাকে না ও-পাড়ায়। তাকে চিনে ফেলার কেউ নেই। এ যেন প্যারিসে কাটানো সময়ের মতো। দিমিত্রির সঙ্গে কাটানো সময়টুকুতে সে অনাম্নী, অচেনা। তার কাছে পৌঁছোনো অসম্ভব। দিমিত্রি নিখিলের নামটাও জিজ্ঞেস করে না কখনও। মৌসুমির স্বামীর ব্যাপারে কোনও আগ্রহই নেই তার। কোনও হিংসেও নেই। প্রথম দিন রেস্তোরাঁয় বসে সে যখন বলেছিল যে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, দিমিত্রি মুখের ভাব একবিন্দুও বদলায়নি। দিমিত্রি মনে করে, তাদের এভাবে একসঙ্গে থাকাটা ভাগ্যে ছিল, এমনকী অবশ্যম্ভাবীও ছিল। সত্যি, মৌসুমির মনে হয়, ব্যাপারটা কী সোজা! মৌসুমি ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিখিলকে 'আমার স্বামী' বলে। যেমন, 'আজ বিকেলে আমি আর আমার স্বামী ডিনারে বেরোব' বা 'আমার স্বামীর থেকে এই ঠান্ডা লেগেছে।'

নিখিল কিছুই সন্দেহ করে না। রোজকার মতো একসঙ্গে ডিনার খায়, সারাদিন কী হল তা নিয়ে আলোচনা করে। একসঙ্গে রান্নাঘর পরিষ্কার করে দু'জনে সোফায় বসে টিভি দেখে। মৌসুমি ছাত্রদের খাতা দেখে। এগারোটা নাগাদ খবর শেষ হলে দাঁত মাজে ওরা। বিছানায় গিয়ে সৌজন্যমূলক চুমু খায়। তারপর একে অন্যের দিকে পিঠ করে শোয়, আড়মোড়া ভেঙে ঘুমে তলিয়ে যায়। কিন্তু মৌসুমি আসলে ঘুমোয় না, ঘুমের ভান করে। প্রতি সোমবার আর বুধবার রাতে সে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে। যদি নিখিল ওর দিকে ফিরে ওকে জড়িয়ে ধরে, যদি টের পেয়ে যায় সবকিছু! আলো নিভিয়ে দেওয়ার অনেক পরেও সে জেগে থাকে, স্বামীকে দেওয়ার মতো উত্তর আর যুক্তি ঠিক করে মনে-মনে। স্বামীকে মিথ্যে বলার জন্য নিজেকে তৈরি করে। নিখিল জিজ্ঞেস করলে সে বলবে বাজার করতে গিয়েছিল। আসলে অবৈধ প্রেমের প্রথম দিনটায় তাই করেছিল সে। ফেরার পথে বিনা কারণে মাঝপথে মেট্রো থেকে নেমে একটা সম্পূর্ণ অচেনা দোকানে ঢুকে যাচ্ছেতাই একজোড়া কালো জুতো কিনে বাড়ি ফিরেছিল।

এক রাতে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল মৌসুমির। সেদিন তাদের রাস্তায় মেরামতির কাজ চলছে। বড় বড় গাড়ি ঢুকছে, রাবিশের ঢিবি ফেলা হচ্ছে, কংক্রিট গুঁড়ো করা হচ্ছে। কানফাটা আওয়াজ। অথচ এর মধ্যেই নিখিল ঘুমিয়ে রয়েছে। রাগে মাথার শিরা দপদপ করতে লাগল মৌসুমির। কী করবে? উঠে একটা পেগ বানিয়ে নেবে? স্নান করবে? কিন্তু শরীরের ক্লান্তি তাকে উঠে বসতেই দিল না। জানালার মধ্যে দিয়ে আসা আলোয় দেখা যাচ্ছে রাস্তার যানবাহনের ছায়া। দূরে একটা ট্রাক প্রাগৈতিহাসিক দৈত্যের মতো শব্দ করে এদিকেই তেড়ে আসছে। মৌসুমি ভাবল, নিশ্চয়ই আজ সূর্য ওঠা দেখতে পাবে সে। কিন্তু ঘুম এসেই গেল। ঘুম ভাঙল খুব ভোরে, জানালার শার্শিতে তোড়ে বৃষ্টির জল পড়ার শব্দে। এত জোরে বৃষ্টি পড়ছে, মৌসুমির মনে হল কাচ ভেঙে যাবে। এদিকে মাথাটা ব্যথায় ফেটে পড়ছে। বিছানা থেকে উঠে পরদা সরিয়ে বাইরে তাকাল মৌসুমি। তারপর ফিরে এসে নিখিলকে ঝাঁকিয়ে ডেকে তুলল। জানলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, “দেখো,” যেন বৃষ্টি হল পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। নিখিল ঘুমন্ত অবস্থাতেই স্ত্রীর কথায় উঠে বসল, চোখ খুলে বৃষ্টি দেখল। তারপর আবার শুয়ে পড়ল।

সাড়ে সাতটার সময় মৌসুমি বিছানা ছাড়ল সেদিন। বৃষ্টি ধরে গিয়েছে, আকাশ পরিষ্কার। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে মৌসুমি দেখল, বাথরুমে আর

লিভিং রুমের ছাত থেকে বৃষ্টির জল লিক করেছে। ছাতে বিভিন্ন জায়গায় হলুদ ছোপ আর মেঝেতে জল জমে আছে। একটা জানালার পাল্লা খোলা ছিল। সেখান দিয়ে জল ঢুকে কাছে রাখা বই, কাগজ, বিল সব ভিজিয়ে দিয়েছে। কান্না পেল মৌসুমির। তবে এবারে কাঁদার কারণ হিসেবে জোরালো একটা ঘটনা পাবে, এটা ভেবে আনন্দও হচ্ছিল।

নিখিল শোবার পোশাক পরে বেরিয়ে এসেছে ততক্ষণে, বলছে, "এ কী? কাঁদছ কেন?"

"ছাতে ফাটল আছে।"

নিখিল উপরদিকে তাকাল, "আমি সুপারভাইজ়ারকে খবর দিচ্ছি।"

"বৃষ্টির জল ওই ফাটল দিয়ে ঢুকেই সব ভিজিয়েছে।"

"বৃষ্টি?"

"মনে নেই? ভোরবেলা অবিশ্বাস্য রকম তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিল। তোমাকে ডেকে তুলে দেখালাম।"

কিন্তু নিখিলের কিছুই মনে পড়ল না।

একমাস ভরতি সোম আর বুধবার কেটে গেল। এখন মৌসুমি দিমিত্রির সঙ্গে শুক্রবারও দেখা করে। এক শুক্রবার মৌসুমি ঢোকামাত্র দিমিত্রি মাখন কিনতে বেরিয়ে গেল। ট্রাউট মাছের সসে লাগবে। মৌসুমি অ্যাপার্টমেন্টে একা। স্টিরিয়োতে বার্তোক বাজছে। জানালা দিয়ে সে দিমিত্রিকে দেখতে পেল: একজন বেকার, মধ্যবয়সি, বেঁটে, টাকমাথা লোক যে মৌসুমির বিয়ে ভেঙে দিতে চলেছে। আচ্ছা, মৌসুমির আগে কি তার পরিবারের কেউ বিয়ের বাইরে সম্পর্ক করেনি? কেউ কি ঠকায়নি নিজের স্বামীকে? সবচেয়ে অস্বস্তিকর ব্যাপারটা হল, এই অবৈধ প্রেম তাকে একধরনের শান্তিও দিয়েছে। দিনগুলোকে সহ্যের সীমায় নিয়ে গিয়েছে। দিমিত্রিকে প্রথমবার শরীর দেওয়ার পর নিজেকে বাথরুমে ধোয়ামোছা করতে করতে মৌসুমি হঠাৎ শিউরে উঠেছিল। এ কী করছে সে? দু'টো ঘর জুড়ে ছড়ানো তার জামাকাপড়! লজ্জায়, অস্বস্তিতে মৌসুমি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। ফেরার আগে বাথরুমের আয়না দেখে চুল আঁচড়ে নিয়েছিল সে। গোটা অ্যাপার্টমেন্টে আয়না বলতে ওই একটিই। সে মাথা নিচু করে রেখেছিল, শুধু শেষে একবার চোখ তুলে একঝলক দেখে নিয়েছিল নিজেকে। সেই এক

মুহূর্তে সে দেখেছিল, আয়নার কারসাজিতেই হোক বা আলোর দীপ্তিতে, তার মুখ আর ত্বক স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

দিমিত্রির দেওয়ালে কিছুই টাঙানো নেই। ওর জিনিসপত্র সবই দু'টো বড় ব্যাগের মধ্যে থাকে। শুধু রান্নাঘরের জিনিসপত্র, গান শোনার যন্ত্র ও সিডি এবং বইগুলো প্যাকিং খুলে বের করেছে দিমিত্রি। প্রতিবারই অবশ্য মৌসুমি গিয়ে দেখে, আরও কিছু জিনিস বেরিয়ে ঠিক জায়গায় সাজানো হয়েছে। তাকে সাজানো বইগুলো দেখতে লাগল মৌসুমি। দিমিত্রির কাছে কিছু জার্মান বই আছে। তা ছাড়া, ওদের দু'জনের বইয়ের সংগ্রহ একইরকম। সেই লেবু রঙের মলাটওয়ালা দ্য প্রিন্সটন এনসাইক্লোপিডিয়া অব পোয়েট্রি অ্যান্ড পোয়েটিকস। মাইমেসিস-এর একই সংস্করণ। একবাক্সভরা প্রুস্ত। অ্যাটগেটের তোলা একসেট বড় সাইজে ছাপা প্যারিসের ছবি। সে আরামকেদারায় বসে রইল। এটাই দিমিত্রির ঘরের একমাত্র আসবাব। প্রথমদিন এসে এটাতেই বসেছিল মৌসুমি। আর পিছনে দাঁড়িয়ে দিমিত্রি ম্যাসাজ করে দিচ্ছিল ওর ঘাড়ের একটি স্পর্শকাতর বিন্দু। আঙুলের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল মৌসুমির শরীর। তখন দু'জনে একসঙ্গে হেঁটে গিয়েছিল বিছানার দিকে।

প্যারিসের ছবিগুলো খুলে মৌসুমি বসে ছিল। বহু চেনা রাস্তা আর বিভিন্ন বিখ্যাত জায়গার ছবি। মৌসুমি ভাবছিল, তার প্যারিসের ফেলোশিপটা কীভাবে নষ্ট হয়েছে। পিছনের জানালা দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকছিল ঘরে। একটা আলোর চতুষ্কোণ বইটার রেশমি পাতায় বিছিয়ে রয়েছে, তার মধ্যে মৌসুমির মাথার কালো ছায়া, চুলগুলো অদ্ভুতভাবে ছায়া ফেলেছে। যেন আসল মৌসুমির চেয়ে এই ছায়ার মাথাটা বড়। সে মাথাটা হেলিয়ে চোখ বুজল। এক মুহূর্ত পর যখন চোখ খুলল, সূর্য সরে গিয়েছে। এখন সূর্যের ছোট্ট একটা ফালি পায়ের কাছে পড়ে আছে, যেমন পরদা টেনে দেওয়া হয় ধীরে ধীরে। বইয়ের ধবধবে সাদা পাতাগুলো ধূসর হয়ে উঠেছে। মৌসুমি সিঁড়িতে দিমিত্রির পায়ের শব্দ শুনতে পেল। একটু পরে বাইরে থেকে চাবি ঘোরানোর আওয়াজ। মৌসুমি উঠে তাকের নির্দিষ্ট ফাঁক খুঁজতে লাগল। বইটা তুলে রাখতে হবে।

এগারো

গোগোল রবিবারে ঘুম থেকে উঠল, একা। রাতে কী যেন একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছে, মনে করতে পারছে না। উঠেই বিছানায় মৌসুমির দিকটায় চোখ চলে যায়। পাশের টেবিলে বই আর ম্যাগাজিনের অগোছালো স্তূপ। এক বোতল ল্যাভেন্ডার রুম স্প্রে। মৌসুমি সেটা মাঝে মাঝে বালিশের উপর ছিটিয়ে দিতে ভালবাসে। একটা চিরুনি, তাতে মৌসুমির কয়েকটা চুল তখনও আটকে। আরেকটা কনফারেন্সে গিয়েছে মৌসুমি। পাম বিচে। আজ রাতে ফিরবে। মৌসুমি বলেছিল বটে, এ কনফারেন্সটার কথা তাকে মাসখানেক আগে বলেছে, কিন্তু গোগোলের মনে নেই। প্যাক করতে করতে মৌসুমি বলেছিল, "চিন্তা কোরো না। রোদে পোড়ার আগেই ফিরে আসব।" কিন্তু অন্য জামাকাপড়ের সঙ্গে সুটকেসে একটা স্নানের পোশাকও ভরেছিল মৌসুমি। তা দেখে গোগোলের বুকের ভিতর মেঘ ঘনিয়ে আসে। মৌসুমি কি হোটেলে সুইমিং পুলের ধারে শুয়ে আছে, চোখ বুজে, হাতে একটা বই নিয়ে? হঠাৎ শীত করল গোগোলের। দু'হাতে নিজেকে জড়িয়ে ধরে সে ভাবল, আমাদের মধ্যে অন্তত একজন তো গরমের মধ্যে আছে। গতকাল সন্ধে থেকে এই বিল্ডিঙের বয়লার খারাপ হয়ে গিয়েছে। ফলে অ্যাপার্টমেন্টটা বরফের মতো ঠান্ডা। কাল রাতে লিভিং রুমে উনুন জ্বালিয়ে থাকতে হয়েছিল। আজ একটা পুরনো টি-শার্ট, তার উপর সোয়েট শার্ট আর একটা সোয়েটার পরে আছে গোগোল। কাল রাতে উলের মোজা পরে ঘুমোতে হয়েছে। মাঝরাতে শীত বাড়লে মাফলার জড়াতে হয়েছিল, নিতে হয়েছিল একটা বাড়তি কম্বল। কম্বলটা প্রথমে খুঁজে পাচ্ছিল না গোগোল। ওই মাঝরাতে মৌসুমিকে হোটেলে ফোন করে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কম্বলটা কোথায়। কিন্তু তখন ঘড়িতে প্রায় ভোর তিনটে। তাই মৌসুমিকে বিরক্ত না করে নিজেই কম্বল খুঁজে নিয়েছিল। আলমারির একদম উপরের তাকে প্লাস্টিকের বাক্সে ছিল সেটা। বিয়েতে পাওয়া উপহার, তখনও খোলা হয়নি।

গোগোল কম্বলগুলো সরিয়ে উঠে বসল। বিছানা থেকে বেরিয়ে বরফঠান্ডা জলে দাঁত মাজল, কিন্তু ভয়ে দাড়ি কামাতে পারল না। জিন্‌স আর একটা বাড়তি সোয়েটার পরেও কুলোচ্ছিল না, গোগোল মৌসুমির একটা বাথরোব চড়িয়ে নিল। কেমন দেখাচ্ছে কে জানে! নিজের জন্য কফি, টোস্ট, মাখন আর জেলির ব্যবস্থা করে সদর দরজা খুলে কাগজটা ভিতরে নিয়ে এল সে। কিন্তু তখনই নীল মোড়কটা খুলল না। পরে পড়বে। এখন একটা ড্রয়িং শেষ করে ফেলতে হবে। শিকাগোর কোনও হাইস্কুলের অডিটোরিয়াম। ড্রয়িংটা কালই লাগবে। টিউব খুলে প্ল্যানটা বের করে ডাইনিং টেবিলে বিছিয়ে নিল সে। চারদিকে চারটে পেপারব্যাক বই চাপা দিল। পছন্দসই গান চালিয়ে ড্রয়িং শুরু করল, প্রধান ডিজ়াইনারের দেওয়া মাপজোকের সঙ্গে মাপজোক মেলাতে হবে। কিন্তু ঠান্ডায় আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গোগোল শেষ পর্যন্ত ড্রয়িংটা গুটিয়ে টিউবে পুরে ফেলল, মৌসুমির জন্য একটা চিঠি লিখে রান্নাঘরের কাউন্টারে রেখে অফিসের দিকে রওনা হয়ে গেল।

বাড়ি থেকে বেরোনোর একটা কারণ খুঁজে পেয়ে গোগোলের মন্দ লাগছে না। মৌসুমি বিকেলের দিকে ফিরবে। কিন্তু ওর জন্য অপেক্ষা করতে চায় না সে। একটা অজুহাত তো পাওয়া গিয়েছে! বাইরেটা যেন ঘরের চেয়ে কম ঠান্ডা। তবে হাওয়ায় একটা ভেজা ভাব রয়েছে। পাতালরেলে না গিয়ে প্রায় তিরিশ ব্লক হেঁটে গোগোল অফিসে পৌঁছোল। অফিসেও সে আজ একা। অন্ধকারমতো ড্রাফটিং রুমটায় ফাঁকা ডেস্কের মধ্যে কাজ করছিল সে। কোনও কোনও ডেস্ক সাজানো-গোছানো, কোনওটার উপর ড্রয়িং আর মডেল স্তূপ হয়ে আছে। নিজের টেবিলের উপর নিচু হয়ে কাজ করে গোগোল। ছাত থেকে নেমে আসা একটা আলোর ডুম থেকে গোল হয়ে আলো পড়ে টেবিলের উপর। টেবিলের পাশের দেওয়ালে একটা ক্যালেন্ডার আটকানো রয়েছে। এ-বছরটাও যেতে চলল। এ-সপ্তাহের শেষে বাবার মারা যাওয়ার চারবছর পূর্ণ হবে। ক্যালেন্ডারে গোগোলকে দেওয়া বিভিন্ন ডেডলাইন গোল দাগ দিয়ে মার্কা করা আছে। অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, সবধরনের ডেডলাইন। এ ছাড়াও মিটিং, সাইট ভিজ়িট আর কনফারেন্সের দিনগুলোতেও দাগ দেওয়া। চাকরি পেতে পারে এমন একটা নতুন ফার্মের সঙ্গে লাঞ্চের ডেটেও। গোগোল ভাবছে, এবার একটা ছোট ফার্মে যোগ দেবে। যারা ব্যক্তিগত বাড়ির কাজ করে, অল্প কিছু লোক নিয়ে।

ক্যালেন্ডারটার পাশে গোগোলের প্রিয় একটা পেন্টিঙের প্রিন্ট লাগানো আছে। চতুর্দিকে সাঁটানো হলুদ নোটের কাগজ। ফতেপুর সিক্রিতে মা আর সোনিয়ার সঙ্গে তার নিজের ছবি। এটা বাবার ক্লিভল্যান্ড অ্যাপার্টমেন্টের ফ্রিজ থেকে খুলে এনেছে। তার ঠিক পাশে মৌসুমির একটা পুরনো পাসপোর্ট সাইজ়ের ছবি। তখন ওর বয়স কুড়ি-একুশ হবে, খোলা চুল, চোখের পাতা নিচু হয়ে এসেছে, ক্যামেরার দিকে না তাকিয়ে একটা কোনায় তাকিয়ে আছে মৌসুমি। ওদের ডেটিং শুরু হওয়ার আগে তোলা ছবি। যে-সময় মৌসুমি গোগোলকে নিখিল নামে চিনত না। এটা অতীতের একটা টুকরো, তখন ভবিষ্যতের কোনও ছায়া মৌসুমির উপর পড়েনি। ওদের দু'জনের যে একদিন বিয়ে হবে তাও জানার কোনও উপায় ছিল না তখন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা-ই হয়েছে। অনেক অদ্ভুত সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে গোগোলকেই তো বিয়ে করেছে মৌসুমি। দু'জনে দু'জনের জীবন ভাগ করে নিয়েছে।

গত সপ্তাহের শনি-রবিবার ছিল থ্যাংকসগিভিং। মা আর সোনিয়া নিউ ইয়র্কে এসেছিল। সঙ্গে সোনিয়ার নতুন বয়ফ্রেন্ড বেন। মৌসুমির বাবা-মা আর ভাইও এসেছিল। সকলে মিলে নিউ ইয়র্কে ছুটি কাটিয়েছিল ওরা। গোগোল আর মৌসুমির ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে ভিড় করে ছিল। এই প্রথম গোগোল ছুটিতে বাড়ি কিংবা শ্বশুরবাড়ি, কোথাও যায়নি। নিজের বাড়িতে সকলকে আতিথ্য দেওয়া, দায়িত্ব নেওয়া, গোগোল এই প্রথম এ-সব করল। আগে থেকে তাজা টার্কি অর্ডার দিতে হয়েছিল, মেনু প্ল্যান করতে হয়েছিল। সবাই মিলে একসঙ্গে বসে খাওয়ার জন্য বাড়তি ফোল্ডিং চেয়ার আনার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। মৌসুমি বাজার থেকে একটা রোলিং পিন কিনে এনে জীবনে প্রথমবার অ্যাপেল পাই রান্না করেছিল। বেন ছিল বলে ইংরেজিতেই কথা বলতে হচ্ছিল ওদের। বেন অর্ধেক ইহুদি, অর্ধেক চিনা। সে গ্লোব পত্রিকার একজন সম্পাদক। সোনিয়ার সঙ্গে হঠাৎই দেখা হয় বেনের। নিউবেরি স্ট্রিটের একটা কফির দোকানে। খেতে বসে সাবধানে পরস্পরের হাত ধরছিল ওরা। সকলের চোখ এড়িয়ে কোথাও গিয়ে চুমু খাচ্ছিল। হিংসে হচ্ছিল গোগোলের। টার্কি আর মিষ্টি আলুর রোস্ট খাচ্ছিল ওরা, সঙ্গে গোগোলের মায়ের বানানো ক্রানবেরির চাটনি। বারবার মৌসুমির দিকে তাকাচ্ছিল গোগোল। কেন আর আগের মতো আচরণ করছে না মৌসুমি? তর্কাতর্কি হয়নি, শারীরিক সম্পর্কও আগের মতো আছে। তবু

কিছুই আগের মতো নেই। মৌসুমি কি গোগোলকে নিয়ে আর খুশি নয়? না, কোনও অভিযোগ তোলেনি মৌসুমি। কিন্তু গোগোল টের পায় দূরত্ব বাড়ছে, টের পায় মৌসুমির অসন্তুষ্টি, বিনা কারণে অন্যমনস্কতা। অবশ্য গতসপ্তাহে এই নিয়ে ভাবার অবকাশ ঘটেনি। ওদের যে-সব বন্ধুরা শহরে নেই তাদের অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গিয়ে পরিবারের লোকজনকে শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হয়েছে। থ্যাংকসগিভিংয়ের পরদিন ওরা জ্যাকসন হাইটসে গিয়েছিল। হালাল মাংসওয়ালার কাছে গিয়ে দুই মা প্রচুর পাঁঠার মাংস কিনলেন। তারপর দেরি করে ভারী ব্রেকফাস্ট করেছিল ওরা। শনিবার সন্ধেয় কলম্বিয়াতে ভারতীয় রাগসংগীতের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল। গোগোলের খুব ইচ্ছে করছিল, মৌসুমিকে দাঁড় করিয়ে বলে, "আমাকে বিয়ে করে তুমি খুশি তো?" কিন্তু মনের আরও গভীরে এই ধরনের প্রশ্ন করতে আতঙ্ক হয় তার।

ড্রয়িং শেষ করল গোগোল। টেবিলে পিন দিয়ে সকালের জন্য আটকে রাখল সেটা। কাজ শেষ হতে হতে দুপুরের খাবার সময় অনেকক্ষণ পেরিয়ে গিয়েছে। অফিসের বাইরে বেরিয়ে গোগোল দেখল ঠান্ডা খুব বেড়ে গিয়েছে। আলো দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। কাছের একটা মিশরীয় রেস্তোরাঁয় দাঁড়িয়ে এক কাপ কফি আর একটা ফালাফেল স্যান্ডউইচ কিনল সে। তারপর সেটা হাতে করেই দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করল। সামনে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টাওয়ার দু'টো আকাশের গায়ে ঝকঝক করছে। ফালাফেল রাংতায় জড়ানো হলেও হাতে লেগে যাচ্ছে, যদিও সেটা তখনও গরম। দোকানগুলোয় বেশ ভিড়। শোকেসগুলো ঝকঝকে সাজানো। ফুটপাথে লোকের ভিড়ে হাঁটা দায়। ক্রিসমাস আসছে। এই সাধারণ তথ্যটা গোগোলের বুকে যেন জোরে আঘাত করল। গতবছর বড়দিনে ওরা মৌসুমির বাড়িতে গিয়েছিল, এ-বছর পেম্বারটন রোডে যাবে। তবে বড়দিনের ছুটি নিয়ে গোগোলের আর কোনও আগ্রহ নেই। বরং কবে ছুটি শেষ হবে, এই নিয়েই তার চিন্তা। ছুটি শেষ হওয়া নিয়ে এই অধৈর্য চিন্তা কি প্রমাণ করছে যে, সে এখন সাবালক? ঘুরতে ঘুরতে একটা পারফিউমের দোকানে ঢুকে পড়ল গোগোল। বেরিয়েও এল। তারপর একটা জামাকাপড়ের দোকান, একটা ব্যাগের দোকান। মৌসুমিকে বড়দিনে কী দেওয়া যায়? অন্যান্যবার নানারকম সংকেত করে মৌসুমি নিজে। ক্যাটালগ দেখায়। দরকার বা পছন্দ খুলে বলে। কিন্তু এবার সেভাবে কথাই হয়নি। দস্তানা না ব্যাগ না নতুন রাতপোশাক? কী পেলে খুশি হবে সে? ইউনিয়ন

স্কোয়্যারে স্টলগুলো শাল, মোমবাতি বা হাতে তৈরি গয়নাগাটি বিক্রি করে। কিছুই পছন্দ হয় না গোগোলের।

স্কোয়্যারের উত্তরদিকে বার্ন অ্যান্ড নোবেলের বইয়ের দোকানে গোগোল ঢুকে পড়ল। বিশাল দেওয়াল জুড়ে হাজার হাজার বই। এর মধ্যে একটাও পড়েনি গোগোল। যা নিজে পড়েনি, তা কাউকে উপহার দেওয়া কি ঠিক? বেরোনোর দরজার পাশের টেবিলে একগাদা ট্র্যাভেল গাইড রাখা আছে। গোগোল ইতালির গাইড তুলে নিল। এখানকার অসাধারণ স্থাপত্যগুলোর শুধু ছবিই দেখেছে, ছাত্র হিসেবে মন দিয়ে পড়েছে কিন্তু নিজের চোখে দেখা হয়নি। গোগোলের রাগ হয়ে গেল। কিন্তু নিজেকে ছাড়া কাকেই বা দোষ দেবে? কেউ তাকে ইতালি যেতে মানা করেনি। সম্ভবত দু'জনে মিলে দূরের কোনও জায়গায় বেড়াতে গেলে ভাল হয়। মৌসুমি আর তার হয়তো এটাই দরকার। পুরো প্ল্যানিংটা গোগোল একাই করে ফেলতে পারে, কোথায়-কোথায় যাবে, কোন হোটেলে থাকবে। মৌসুমিকে এই বড়দিনের উপহারটা দিলে কেমন হয়? গাইডবইটার সঙ্গে দু'টো এরোপ্লেনের টিকিট? গোগোলের ছুটি পাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। সামনের বসন্তকালে ওরা অনায়াসে যেতে পারে। যত ভাবে, ব্যাপারটা তত ভাল লাগে গোগোলের। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে গাইডবইটা কিনে ফেলল সে।

পার্কের ভিতর দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার সময় গোগোল অস্থির পা ফেলে। বারবার বইয়ের পাতাগুলো উলটোয়। মৌসুমিকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। রাস্তায় একটা নতুন বেকারি পড়বে। সেখান থেকে মৌসুমির পছন্দসই কিছু খাবার কিনে নেবে। ও নিশ্চয়ই একপেট খিদে নিয়ে বাড়ি ফিরবে। প্লেনে কী-ই বা খেতে দেয়। বই থেকে চোখ তুলে আকাশ দেখল গোগোল, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। মেঘের রং ঘন সোনালি। একঝাঁক পায়রা উড়ে যাচ্ছে। গোগোলের মাথার খুব কাছ দিয়ে উড়ে গেল সেগুলো। গোগোল ভয়ে মাথা নামিয়ে ফেলল। নামিয়েই নিজের বোকামি বুঝতে পেরে আবার মাথা তুলল। কই, অন্য কোনও লোক তো মাথা নামায়নি? পাখিগুলো উড়ে গিয়ে একটা পাতাঝরা গাছের ডালে বসেছে। এই পাখিগুলোকে অনেকবার ছাতে বা জানলার কার্নিশে বসতে দেখেছে গোগোল। কিন্তু এমন ন্যাড়া গাছের ডালে দেখেনি। কেমন অলৌকিক দেখায়। কিন্তু এর চেয়ে স্বাভাবিক কী-ই বা হতে পারত? ফের ইতালি আর ভেনিসের কথা ভাবে গোগোল। এই পায়রা হয়তো ইতালির প্রতীক।

গোগোলের যে ইতালি যাওয়া উচিত, তা জানাতে এসেছে। পিয়াজ়া সান মার্কো পায়রার জন্য বিখ্যাত না?

বিল্ডিঙে ঢুকেই গোগোল বুঝল বয়লার ঠিক হয়ে গিয়েছে। দরজায় পাহারাদার জানাল, "ম্যাডাম এইমাত্র ফিরলেন।" গোগোলের বুকের ভিতরটা ছলাৎ করে উঠল। যেন ফিরে এসে মৌসুমি ওকে ধন্য করে দিয়েছে। কল্পনার চোখে গোগোল দেখতে পায়, মৌসুমি এঘর-সেঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিজের জন্য ওয়াইন নিচ্ছে একগ্লাস, ব্যাগটা অবহেলায় একপাশে পড়ে। গাইডবইটা চট করে কোটের পকেটে ঢুকিয়ে নিল গোগোল, ওটা বড়দিনের উপহার, মৌসুমি যেন দেখতে না পায়। তারপর লিফ্‌টের বোতাম টিপে উপরে ওঠার জন্য তৈরি হল।

বারো

২০০০

বড়দিনের আগের দিন। অসীমা গাঙ্গুলি রান্নাঘরের টেবিলে বসে কিমা-ক্রোকে তৈরি করছিল। রাতে পার্টি দিচ্ছে অসীমা, তখন লাগবে। এই বিশেষ পদটি সে ভালই রাঁধে। অতিথিরাও জানে, অসীমার বাড়িতে পৌঁছোনোর কয়েক মিনিটের মধ্যে ছোট ছোট প্লেটে ক্রোকে চলে আসবে। তবে একা করার পক্ষে রান্নাটা একটু বেশিই জটিল। প্রথমে আলু সেদ্ধ করে মেখে নেয় অসীমা। তারপর এক চামচ মোলায়েম মাংসের কিমার চারদিকে একটু আলুসেদ্ধ লাগিয়ে নিখুঁত মণ্ড তৈরি করে, ঠিক যেমন কুসুমের চারদিকে ডিমের সাদা অংশ জড়ানো থাকে। সেই বিলিয়ার্ডস বলের আয়তনের মণ্ডগুলোকে ফেটানো ডিমের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে হয়। ডিম থেকে তুলে মণ্ডের বাইরে রুটির গুঁড়ো মাখিয়ে নিয়ে অতিরিক্ত গুঁড়ো হাতের পাতায় সাবধানে ঝেড়ে ফেলে অসীমা। মণ্ডগুলো বড় গোল থালায় সাজিয়ে রাখে, দু'টো স্তরের মধ্যে বিছিয়ে দেয় মোমের কাগজ। কতগুলো হল? বড়দের জন্য তিনটে করে, ছোটদের জন্য মাথাপিছু দু'টো— এই হিসেবে গুনে রাখে। হাতের কর গুনে দেখে নেয়, ক'জন অতিথি আসবে। হিসেবমতো আর একডজন ক্রোকে বানালেই হবে। অসীমা আরও রুটির গুঁড়ো থালায় ঢেলে নেয়। একটিপি, বালির মতো রং। তার মনে পড়ে, কেমব্রিজের রান্নাঘরে প্রথমবার ক্রোকে বানানোর কথা! সেই তাদের দাম্পত্য-জীবনের প্রথম পার্টি। তার স্বামী ফিতে লাগানো পাজামা আর টি-শার্ট পরে উনুনের ধারে দাঁড়িয়ে কালচে হয়ে আসা ফ্রাইং প্যানে ক্রোকে ভাজছে... এক-একবারে দু'টো করে। পরে ছোট্ট গোগোল আর সোনিয়াও সাহায্য করত। গোগোলের হাতভরতি রুটির গুঁড়ো লেগে যেত। সোনিয়া ভাজার আগেই খেতে চাইত ওগুলো।

আজকের পার্টিটাই পেম্বারটন রোডে অসীমার দেওয়া শেষ পার্টি। তার

স্বামী মারা যাওয়ার পর এই প্রথম অনুষ্ঠান হচ্ছে এখানে। গত সাতাশ বছর যে-বাড়িতে অসীমা থেকেছে, যে-বাড়িতে তার জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় কেটেছে, সেটা এখন বিক্রি হয়ে গিয়েছে। বাড়ির লনে এখন জমিবাড়ির এজেন্টের সাইনবোর্ড লাগানো। বাড়িটা কিনেছে এক আমেরিকান পরিবার। তাদের পদবি ওয়াকার। কর্তাটি অসীমার স্বামীর বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন চাকরি পেয়েছে। সঙ্গে থাকবে তার বউ আর ছোট্ট মেয়ে। ওয়াকার পরিবার বাড়িটায় অনেক পরিবর্তন করতে চায়। তারা ডাইনিং রুম আর লিভিং রুমের মাঝখানের দেওয়াল ভেঙে ফেলবে, রান্নাঘরে আইল্যান্ড বানাবে, ছাতে ট্র্যাকলাইট বসাবে। ওরা ওয়াল-টু-ওয়াল কার্পেট তুলে ফেলতে চায়। তা ছাড়া আরও অনেক কিছু বদলানোর কথা আলোচনা করেছে। তাদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে অসীমার আতঙ্ক হচ্ছিল। একবার ভেবেছিল, ‘না’ করে দেয়। বলে দেয়, বিক্রি করবে না বাড়ি। স্বামীর বাড়ি আগলে রাখবে। ঠিক যেমনটি তার স্বামী দেখে গিয়েছিল, তেমনটি রাখবে এই বাড়িটা। কিন্তু সে তো আবেগের কথা। চিঠির বাক্সের উপর সোনালি অক্ষরে লেখা ‘গাঙ্গুলি’ শব্দটা অপরিবর্তিত থাকবে, তা তো আর হয় না। ঠিক তেমনই, মেয়ের শোবার ঘরের দেওয়ালে ম্যাজিক মার্কার কলম দিয়ে লেখা ‘সোনিয়া’ নামটার উপর রং পড়বেই। চাদর রাখার আলমারির পাশের দেওয়ালে অশোক বাচ্চাদের জন্মদিনে তাদের উচ্চতা পেনসিলে লিখে রাখত। সেও তো মুছে যাবে। কী করে আটকাবে অসীমা?

সে ঠিক করেছে, বছরে ছ'মাস ভারতে থাকবে, ছ'মাস আমেরিকায়। তার স্বামী বেঁচে থাকার সময় এমনই একটা পরিকল্পনা ছিল তাদের। এবার অসীমাকে একা-একা সেই পরিকল্পনা মানতে হবে। কলকাতায় অসীমা ছোটভাই রানার সঙ্গে থাকবে। সে স্ত্রী আর দুই অবিবাহিতা তরুণী মেয়েকে নিয়ে সল্টলেকের বিরাট ফ্ল্যাটে থাকে। সেখানে অসীমার জন্য একটা ঘর আছে। জীবনে এই প্রথম সম্পূর্ণ নিজের জন্য একটা ঘর পেতে চলেছে অসীমা। বসন্ত আর গ্রীষ্মে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ফিরবে। পালা করে ছেলে, মেয়ে আর বাঙালি নিকট বন্ধুদের সঙ্গে থাকবে। নিজের নামকে এভাবেই সার্থক করতে চলেছে অসীমা। এখন থেকে সে সত্যিই সীমাহীন, অনিকেত।

সোনিয়ার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার পক্ষে আর এখানে থাকা সম্ভব হবে না। এখন থেকে বছরখানেক পরে, জানুয়ারি মাসের কোনও শুভদিনে

কলকাতায় বিয়ে হবে সোনিয়ার। প্রায় তিরিশ বছর আগে শীতকালেই অসীমার বিয়ে হয়েছিল। অসীমার মনে হয়, সোনিয়া এই ছেলেটির সঙ্গে ভাল থাকবে। ছেলেটি? নিজেকে সামলায় অসীমা, ভাবে, ছেলে নয়, পুরুষ। সে সোনিয়ার জীবনে আনন্দ নিয়ে এসেছে। মৌসুমি গোগোলের জীবনে কখনও এমন আনন্দ আনেনি। মৌসুমির কথা মনে পড়তেই অপরাধবোধ কুরে খায়। সে-ই তো গোগোলকে পাঠিয়েছিল মৌসুমির সঙ্গে দেখা করতে। সে কি গোগোলের জীবনে এই বিচ্ছেদের জন্য দায়ী নয়? তবে স্বস্তির ব্যাপার, গোগোল আর মৌসুমি বিশ্বাস করে না যে, সম্পর্ক যত খারাপই হোক, বিয়ে টিকিয়ে রাখাটা জরুরি। অসীমাদের সময়ে তেমন ভাবাটাই রেওয়াজ ছিল। এখনকার ছেলে-মেয়েরা তাদের পছন্দসই আদর্শ অবস্থার বাইরে অন্য কোনওভাবে জীবন কাটাতে অস্বীকার করে। আমেরিকান জীবনবোধের কাছে, বাস্তববোধের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির চাপ কোথাও-না-কোথাও হেরে গিয়েছে।

আর মাত্র কয়েকঘণ্টা একা থাকতে হবে অসীমাকে। সোনিয়া আর বেন গোগোলকে নিয়ে আসতে রেল স্টেশনে গিয়েছে। তারা এলেই বাড়ি ভরে যাবে। এই কয়েকঘণ্টার পর অসীমা যখন একা হবে, তখন সে প্লেনে। কলকাতার দিকে উড়ে যাচ্ছে। এর আগে মাত্র একবারই একা কোথাও গিয়েছে অসীমা। সেটা ১৯৬৭-তে, বিয়ের পর কলকাতা থেকে আমেরিকায় স্বামীর কাছে আসার সময়। সেবার খুব ভয় করেছিল। এখন আর করে না। একা থাকতে, একা কাজ করতে এখন সে শিখে গিয়েছে। এ-কথা সত্যি যে, অসীমা এখনও শাড়ি পরে আর খোঁপা বাঁধে, কিন্তু সেই কলকাতার অসীমা আর এই আমেরিকার অসীমা এক লোক নয়। সে ভারতে ফিরবে ঠিকই, তবে এখন সে আমেরিকান পাসপোর্টের মালিক। হ্যান্ডব্যাগে থাকবে ম্যাসাচুসেট্সের ড্রাইভিং লাইসেন্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড। ভারত গিয়ে সে একা অনেক লোকের জন্য পার্টি দেবে না। সন্দেশ আর চিজ় মিশিয়ে দই বানানোর কায়দা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না তাকে। একা-একা চপ ভাজতে হবে না। ভারতে সে-সব পাড়ার দোকানে পাওয়া যায়। চাকরদের বললেই এনে দেবে। সে-সবের স্বাদ এমন যা এতদিন ধরে চেষ্টা করেও পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেনি অসীমা।

শেষ মণ্ডটিকে রুটির গুঁড়োয় মুড়ে কাজ শেষ করল অসীমা। ঘড়ি দেখল। যা ভেবেছিল তার আগেই কাজ শেষ হয়েছে। গোল থালাটাকে নিয়ে গিয়ে

রান্নাঘরের কাউন্টারে উনুনের পাশে যত্ন করে রাখল। তারপর একটা ফ্রাইং প্যান বের করে উনুনে বসিয়ে বেশ কিছুটা তেল ঢেলে দিল। অতিথিরা আসার ঠিক আগেই তেল গরম করা হবে। ভাজার জন্য বাসনের র‍্যাক হাতড়ে পছন্দসই কাঠের স্প্যাটুলা বেছে রাখল অসীমা। সব ঠিকঠাক করা রইল, এখন আর কোনও কাজ নেই। বাকি রান্না আগেই হয়ে গিয়েছে। ডাইনিং রুমে বড় বড় বাসনে পদগুলো সাজানো রয়েছে। ডালের উপর মোটা সর পড়েছে। পরিবেশন করার সময় তা ফাটবে। ফুলকপির রোস্ট আছে, বেগুনের তরকারি আর ভেড়ার মাংসের কোর্মা তৈরি। মিষ্টিমুখ হিসেবে পান্তুয়া আর মিষ্টি দই ডাইনিং রুমের নিচু আলমারির উপর রাখা। অসীমা তৃপ্তি আর প্রত্যাশা নিয়ে তার এই গোছানো সংসারের দিকে তাকিয়ে রইল। সাধারণত পার্টি দিলে রান্নার গন্ধে অসীমার নিজের অরুচি হয়ে যায়। কিন্তু আজ হয়নি। আজ অসীমার ইচ্ছে করছে সকলের সঙ্গে বসে পেটভরে খেতে। সোনিয়ার সঙ্গে হাত লাগিয়ে শেষবারের মতো তার স্বামীর বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেছে সে। পার্টি শুরু হওয়ার আগের কয়েকঘণ্টা অসীমার খুব পছন্দের। এ-সময়টায় সে কার্পেটে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালায়, পরিষ্কার করার তরল মিশ্রণ দিয়ে ঘষে ঘষে কফিটেবিলের দাগ তোলে, ঘষতেই থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত চকচকে কাঠে তার নিজের মুখের প্রতিফলন না দেখা যায়।

অসীমা এবার রান্নাঘরের ড্রয়ারে ধূপকাঠির প্যাকেট খুঁজতে শুরু করল। খুঁজে পেয়ে একটা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে হাতে নিয়ে ঘর থেকে ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বন্ধুদের জন্য, ছেলে আর মেয়ের জন্য রান্না করতে, শেষবারের মতো এই বাড়িতে পার্টি দিতে অসীমার ভারী আনন্দ হচ্ছে। এই যে মেনু ঠিক করা, কী কী কিনতে হবে তার লিস্ট করা, সুপার মার্কেটে গিয়ে বাজার করা আর সবকিছু গুছিয়ে ফ্রিজে তুলে রাখা— এ-সব করতে তার চিরকালই ভাল লাগে। তার উপর এখন তো বাড়ি বিক্রি, জিনিসপত্র ঝাড়াইবাছাই, সব কাগজপত্র ঠিকঠাক করে যাওয়া, এতেই তার সময় চলে যাচ্ছিল। অন্তত সেই কাজ থেকে রেহাই তো মিলেছে। গত একমাসে তার সাতাশ বছরের সংসার ভেঙে ফেলে প্রতিটা টুকরো গুছিয়ে তুলতে হয়েছে তাকে। রোজ বিকেলে একটা আলমারি খালি করা বা একটা ড্রয়ার গোছানো নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। সোনিয়া সাহায্য করতে চায়নি, তা নয়। কিন্তু অসীমা এ-সব একাই করতে চায়। কাকে কী দিতে হবে, তার ছোট ছোট ঢিবি

তৈরি হয়েছে। কোনওটা ছেলেকে, কোনওটা মেয়েকে, কোনওটা বন্ধুদের, কোনওটা সমাজকল্যাণে দান করতে হবে। আবার কিছু জিনিস তো সঙ্গে করে কলকাতাতেও নিয়ে যেতে হবে। এ ছাড়াও এমন অনেক জিনিস বেরিয়েছে যা ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। মনখারাপও হয়, আবার তৃপ্তিও হয়। এতকালের সংসার থেকে বেছে বেছে যে জিনিসগুলো নিজের জন্য রেখেছে অসীমা, সম্ভবত সে-রকম কয়েকটি জিনিস নিয়েই সে আমেরিকায় প্রথমবার পা রেখেছিল। ওইক'টি জিনিস নিয়েই মাঝরাতে কেমব্রিজে তার স্বামীর তিন ঘরের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেছিল। অসীমা ঠিক করেছে, আজ রাতে সে আর কোনও দুয়ার বন্ধ রাখবে না। অতিথিদের, বন্ধুদের ডেকে বলবে, অশোক-অসীমার সংসার থেকে যা প্রাণ চায়, নিয়ে যেতে। ল্যাম্প, টবের গাছ, হাঁড়িকুড়ি, বাসনপত্র, যা খুশি। সোনিয়া আর বেন ট্রাক ভাড়া করেছে। তাদের ফ্ল্যাটে আঁটবার মতো আসবাব তারা নিয়ে যাবে।

অসীমা ধূপকাঠি হাতে দোতলায় গেল। স্নান করে জামাকাপড় পরতে হবে। দেওয়ালগুলো সব খাঁখাঁ করছে। সাতাশ বছর আগে এই বাড়িতে ঢুকে এ-রকমই ফাঁকা দেওয়াল দেখেছিল সে। একটা দেওয়ালে অশোকের ছবি ঝুলছে শুধু, তা ছাড়া সবই ফাঁকা। বাড়ি ছেড়ে রওনা হওয়ার আগে অসীমার শেষ কাজ হবে ফোটোটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে নেওয়া। ছবিটার সামনে একমুহূর্ত দাঁড়াল সে। তারপর সামনের বাতাসে পাকিয়ে ওঠা ধূপকাঠির সাদা ধোঁয়া হাত দিয়ে সরিয়ে দিল। পোড়া কাঠিটা ফেলে দিল বাইরে। তারপর বাথরুমে ঢুকে জল খুলে দিয়ে থার্মোস্ট্যাটের তাপমাত্রা ঠিক করে নিল, যাতে স্নান সেরে শাওয়ারের বাইরে এলেই তীব্র শীত কাবু না করে ফেলে। জল ভরে উঠেছে ঘিয়ে রঙের বাথটবে, তাতে অসীমা সন্তর্পণে পা রাখল। স্লাইডিং দরজার কাচটা ফেটে গিয়েছে, তবে তা নিয়ে এখন মাথা না ঘামালেও চলবে। দরজা টেনে দিল অসীমা। দু'দিন ধরে রান্না করে আজ একটু ক্লান্তই লাগছে। তার উপর ঘরদোর পরিষ্কার করা, একমাস ধরে ক্রমাগত জিনিস গোছানো, পা-দু'টো বড্ড ভারী লাগছে। জামাকাপড় ছেড়ে কয়েকমুহূর্ত সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। শ্যাম্পু করতে হবে। তার পঞ্চাশ বছরের শুকিয়ে আসা শরীরটায় সাবান ঘষতে হবে, যে শরীরটাকে রোজ সকালে ক্যালশিয়াম ট্যাবলেট খেয়ে মজবুত রাখতে হয়। স্নান হয়ে গেলে তোয়ালে দিয়ে ধোঁয়াটে হয়ে ওঠা বাথরুমের আয়নাটাকে মুছল অসীমা। মন দিয়ে নিজের মুখটা দেখল। এক বিধবার মুখ। কিন্তু জীবনের বেশির ভাগ

সময় তো সে সধবা গৃহবধূ হিসেবেই কাটিয়েছে। হয়তো ভবিষ্যতে কোনওদিন হাতে বোনা বাচ্চাদের সোয়েটার আর অন্যান্য উপহার নিয়ে এক দিদিমা বা ঠাকুমা হিসেবে তাকে পা রাখতে হবে এই আমেরিকার মাটিতেই। আর তার মাসদুয়েক পরে কাঁদতে কাঁদতে ভারতে ফিরে যেতে হবে।

হঠাৎ অসীমার ভয়ংকর একা লাগে। তীব্র, দীর্ঘ একাকিত্ব তাকে বিদ্ধ করে। আয়না থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বামীর জন্য ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে। কিছুদিনের মধ্যেই তাকে এমন একটা শহরে ফিরে যেতে হবে যা একদিন হয়তো তার নিজের বাড়ি ছিল, কিন্তু আজ তা অচেনা প্রবাস। এখনও কতদিন বাঁচতে হবে তাকে? কী হবে আর বেঁচে? কিন্তু অসীমা মনে-মনে জানে, এত সহজে বা তাড়াতাড়ি মৃত্যু এসে তাকে মুক্তি দেবে না। স্বামীর মতো চটজলদি ছাড়া পাবে না সে। আমেরিকায় বসবাসের তেত্রিশ বছর ভারতের কথা ভেবে সে মনোকষ্টে কাটিয়েছে। এর পর কিন্তু এখানকার লাইব্রেরির সাদামাঠা চাকরি, সহকর্মীমহল, একা রান্না করে পার্টি দেওয়া, এ-সব কিছুর জন্যই তার প্রবল মনখারাপ করবে। সোনিয়ার সঙ্গে থাকতে শুরু করার পর মা-মেয়ের মধ্যে যে অদ্ভুত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তার অভাবও বোধ করবে। দু'জনে মিলে পুরনো সিনেমা দেখতে যাওয়া বা সোনিয়াকে রান্না শেখানোর মধ্যে দিয়ে নতুন জীবনের সন্ধান পাচ্ছিল সে। গাড়িও কি আর চালানো হয়ে উঠবে? ইচ্ছে হলে আস্তে আস্তে গাড়িটা চালিয়ে লাইব্রেরির পাশ দিয়ে, ইউনিভার্সিটির পাশ দিয়ে, অশোকের পূর্বতন কর্মস্থল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের পাশ দিয়ে ঘুরত অসীমা। আসলে স্বীকার করতে যতই অসুবিধে হোক, আমেরিকার জন্য মনখারাপ করবে অসীমার। এই দেশেই তো তার স্বামীকে চিনেছিল সে, ভালবেসেছিল। স্বামীর অস্থিভস্ম যতই দেশে, গঙ্গায় ছড়িয়ে দেওয়া হোক না কেন, অসীমার স্বামী তো এ-দেশেই বেঁচে ছিল। এই বাড়িতে, এই শহরেই তার সবচেয়ে উজ্জ্বল স্মৃতিগুলো ছড়িয়ে রয়েছে। অসীমার কাছে স্বামীর স্মৃতি মানেই আমেরিকা।

নিজেকে সামলে বড় নিশ্বাস নিল অসীমা। যে-কোনও মুহূর্তে সিকিউরিটি সিস্টেমের শব্দ শোনা যাবে। গ্যারেজের দরজা খুলে যাবে, বাড়ি সরগরম হয়ে উঠবে তার সন্তানদের গলার আওয়াজে। সে হাতে-পায়ে লোশন মাখল। তারপর বাথরুমের দরজার পিছনে ঝোলানো পিচরঙা টেরিক্লথের বাথরোবটা নামিয়ে নিল। এই বাথরোবটাও বহু বছর আগের কোনও ভুলে-যাওয়া ক্রিসমাসে অসীমার স্বামীর দেওয়া উপহার। যাওয়ার আগে এটাকেও

দান করে যেতে হবে। ভারতে এটা ব্যবহার করা যাবে না, সেখানকার ভেজা আবহাওয়ায় এই মোটা কাপড়ের বাথরোব শুকোতে বেশ কয়েকদিন লেগে যাবে। যাওয়ার আগে এটা ধুয়ে, পরিষ্কার করে কোনও সেকেন্ড-হ্যান্ড জিনিসের দোকানে দিয়ে দেওয়ার কথা মনে রাখতে হবে। কোন বছর এটা উপহার পেয়েছিল অসীমা, তা আর মনে পড়ে না। প্যাকেটটা খুলে কী ভেবেছিল, তাও আর মনে নেই। অসীমা জানে এটা তার স্বামী নিজের হাতে কেনেনি। ডিপার্টমেন্ট স্টোরে কিনেছিল হয়তো গোগোল বা সোনিয়া, গিফ্‌ট প্যাকও নিশ্চয়ই তারা করে থাকবে। অশোকের অবদান শুধু উপহারের ট্যাগে তার নাম আর নিজের নামটা লেখা। অবশ্য এর জন্য অশোককে দোষ দেওয়ার কোনও মানে নেই। ভালবাসা দেখানোর রাস্তায় এ-সব ছোটখাটো আপস ঘটতেই পারে। আগে অসীমা কল্পনা করার চেষ্টা করত, গোগোল-সোনিয়ার মতো প্রথমে প্রেমে পড়ে, বেশ কয়েকমাস বা বছর পরে বিয়ে করলে কেমন দাঁড়ায় কারণ তার আর অশোকের বিয়ে হয়েছিল এক বিকেলের দেখাশোনার পর। উপহারের ট্যাগে লেখা তার নিজের আর তার স্বামীর নামের ছবি চোখে ভেসে ওঠে, যদিও সে-সব ট্যাগ আগলে রাখা হয়নি। ট্যাগগুলো যেন তার অপ্রত্যাশিত, অপরিকল্পিত জীবনের প্রতীক। এক আকস্মিক বিকেলে অশোক তাকে স্ত্রী হিসেবে পছন্দ করেছিল বলে যে-জীবনে তাকে বিনা ভাবনাচিন্তায় ঢুকে পড়তে হয়েছিল, যে-জীবন সে অনেকদিন মেনে নিতেই পারেনি। এখনও এই পেম্বারটন রোডের চার দেওয়ালে সে স্বস্তিবোধ করে না, তবু মনে-মনে জানে, এটাই তার বাড়ি। এই ছোট্ট দুনিয়াটি সে নিজেই সৃষ্টি করেছে, এর দায়িত্ব তার ছাড়া আর কারও নয়। আর এখন এই দুনিয়াটিকেই ভেঙেচুরে, আলাদা-আলাদা ভাগ করে হয় সকলকে বিলিয়ে দিয়ে যেতে হবে, নয় মায়া ত্যাগ করে ফেলে দিতে হবে। অসীমা ভেজা হাতদুটো বাথরোবের হাতায় ঢোকাল। প্রথম থেকেই এটা এক সাইজ় ছোট হয়েছিল, কিন্তু উষ্ণতায় কোনও খামতি ছিল না কখনও।

গোগোল প্ল্যাটফর্মে নেমে দেখল, কেউ অপেক্ষা করে নেই। ট্রেন কি সময়ের আগে পৌঁছেছে? ক'টা বাজে? স্টেশনের ওয়েটিং রুমে না ঢুকে সে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে বসে রইল চুপ করে। সব যাত্রীরা উঠে পড়েছে, ট্রেনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কনডাক্টররা পরস্পরকে পতাকা দেখাল, বিরাট যন্ত্রযানটির চাকা ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল। যারা গোগোলের সঙ্গে এ-

স্টেশনে নেমেছে, তাদের সকলকেই নিতে বাড়ির লোকেরা এসে গিয়েছে। তারা কথা না বলে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে, বোঝাই যাচ্ছে সকলে খুশি। অনেক কলেজছাত্র বড়দিনের ছুটিতে বাড়ি ফিরছে, তাদের পিঠে বিশাল ব্যাকপ্যাক। কয়েকমিনিট পরে ট্রেনের লাইন খালি হয়ে গেল, প্ল্যাটফর্মও খাঁখাঁ। সামনে তাকালেই এখন স্টেশনের পাশের খালি মাঠ দেখা যাচ্ছে। খালি জমি আর কালচে আকাশের প্রেক্ষাপটে শুধু কয়েকটা পাতাহীন গাছের সরু সিল্যুয়েট। গোগোল একবার ভাবল, বাড়িতে ফোন করবে। তারপর বসেই রইল। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে ক্ষতি কী? ট্রেনের বদ্ধ উষ্ণতার পর বাইরের ঠান্ডা বাতাস মন্দ লাগছে না। বস্টন থেকে আসার পথে ট্রেনে সে বেশিরভাগ সময়টা ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। নামার স্টেশন এলে কন্ডাক্টর তাকে খুঁচিয়ে তুলে দিয়েছিল। তখন সে কামরার একমাত্র যাত্রী, আর কেউ নেই। সারাটা পথ দু'টো সিট জুড়ে, ওভারকোটটা কম্বলের মতো গায়ে দিয়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে ছিল সে। বইটাও পড়া হয়ে ওঠেনি।

এখনও ঘুম কাটেনি পুরোটা। দুপুরে খাওয়া হয়নি বলে পেটটাও খালি হয়ে আছে। পায়ের কাছে ডাফেল ব্যাগটা নামিয়ে রাখল গোগোল, কিছু জামাকাপড় আছে ওতে। এ ছাড়া মালপত্র বলতে মেসি দোকানের ছাপমারা ব্যাগে আজ সকালে কেনা কিছু উপহার। উপহার কেনার সময় কল্পনাশক্তি বা উৎসাহের বিশেষ পরিচয় দেয়নি সে। মায়ের জন্য চোদ্দো ক্যারাট সোনার দুল একজোড়া, সোনিয়া আর বেনের জন্য সোয়েটার। অবশ্য এ-বছর সকলে মিলে ঠিক করা হয়েছে, বেশি বাড়াবাড়ি করা হবে না। একসপ্তাহ ছুটি নিয়েছে গোগোল। মা বলে দিয়েছে, বাড়িতে কাজ আছে অনেক। তার ঘরটা খালি করতে হবে, জিনিসপত্র হয় সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, নয়তো ফেলে দিতে হবে। মাকে জিনিসপত্র প্যাক করতে আর সব হিসেবনিকেশ চুকিয়ে ফেলতে সাহায্য করতে হবে। তারপর ওরা সকলে মিলে মা'কে প্লেনে তুলে দিতে লোগান এয়ারপোর্টে যাবে। এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি যতক্ষণ অনুমতি দেয়, ততক্ষণ মায়ের সঙ্গে থাকবে। তারপর অপরিচিত একটা পরিবার এসে ওদের বাড়িটার দখল নিয়ে নেবে। গাঙ্গুলি পরিবারের সব চিহ্ন মুছে যাবে পেম্বারটন রোড থেকে। টেলিফোন ডায়রেক্টরি থেকে ওদের নাম বাদ চলে যাবে। গাঙ্গুলি পরিবার যে এতদিন ধরে পেম্বারটন রোডের একটা ঠিকানায় ছিল, তার আর কোনও স্মৃতি থাকবে না। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, মা সত্যিই চলে যাচ্ছে। দীর্ঘ কয়েকটা মাস মা আমেরিকায় থাকবে না।

গোগোল ভাবে, মা-বাবা কেমন করে নিজেদের বাড়ির লোকজন ছেড়ে এত দূরে, অচেনা প্রবাসে জীবন কাটাতে পেরেছিল এতদিন? প্রত্যাশা আর যন্ত্রণা বুকে চেপে কীভাবে থাকতে পেরেছিল এখানে? কলকাতায় বেড়াতে যাওয়ার যে-দিনগুলোকে ছোটবেলায় ঘেন্না করত গোগোল, সে-সব দিনগুলো কি বাবা-মায়ের প্রত্যাশাপূরণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল? না, নিশ্চয়ই নয়। গোগোল এখন বোঝে, অনেক না-পাওয়া বুকে চেপে তার বাবা আর মা এখানে জীবন কাটিয়েছে। সে ক্ষমতা গোগোলের নিজের নেই। গোগোলের জীবনের অনেকটা অংশ কেটে গিয়েছে শিকড় থেকে দূরে পালাবার চেষ্টায়, আর গোগোলের বাবা-মায়ের সেই একই সময় কেটেছে শেকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, সেই চেষ্টা করে। নিজের ছাত্রজীবনে, আর পরবর্তীকালে চাকরি করার সময়েও, গোগোল যতই তার পরিবার ও সংস্কৃতি থেকে দূরে পালাতে চাক না কেন, সে কিন্তু আসলে আমেরিকার এই ছোট্ট শহরটার সঙ্গে বাঁধা পড়ে থেকেছে। এ-শহর তার কাছে ছোট হলেও বাবা-মায়ের কাছে চিরকালই অচেনা, অজানা। সে সোনিয়ার মতো ক্যালিফোর্নিয়ায় যায়নি কখনও, মৌসুমির মতো ফ্রান্সে তো নয়ই। বাবার সঙ্গে একবারই বেশি দূরত্ব হয়েছিল, তিন মাসের জন্য। তাতে তখন গোগোলের মন মোটেই খারাপ হয়নি, কিন্তু সেই দূরত্বও শেষ হয়ে গেল আরও বড় দূরত্বে। তা ছাড়া গোগোল কখনওই বাবা-মায়ের থেকে চার ঘণ্টা ট্রেনযাত্রার বেশি দূরত্বে থাকেনি। আর বারবার বাড়িতে ফিরেছে গোগোল, এই চার ঘণ্টার যাত্রাটি করে, সে তো পরিবারের টানেই।

এই ট্রেনে চড়ে বাড়িতে আসার সময়েই গোগোল মৌসুমির প্রেমের কথাটা জানতে পেরেছিল। সে একবছর আগের কথা। মা আর সোনিয়ার সঙ্গে বড়দিন কাটানোর জন্য পেম্বারটন রোডে ফিরছিল তারা। একটু সন্ধে করে নিউ ইয়র্ক থেকে রওনা হয়েছিল, ট্রেনের জানালার বাইরে তাই শীতের সন্ধ্যার অন্ধকার রূপ। ওরা সামনের গরমের ছুটিতে কী করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করছিল। ডোনাল্ড আর অ্যাস্ট্রিডের সঙ্গে সিয়েনায় একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে কাটানো পরিকল্পনা করছিল মৌসুমি, গোগোল সেটা আটকানোর চেষ্টা চালাচ্ছিল। হঠাৎ মৌসুমি বলে উঠেছিল, "দিমিত্রি বলছিল, সিয়েনা ঠিক রূপকথার রাজ্যের মতো।" বলেই মুখে হাতচাপা দিয়েছিল, তীব্র শ্বাস টেনেছিল। তারপর সব চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে গোগোল বলেছিল, "কে দিমিত্রি? তুমি প্রেম করছ নাকি?" প্রশ্নটা করার আগে পর্যন্তও গোগোল

ভাবেনি তার মুখ দিয়ে সেটা বেরোবে। তার মনের অনেকদিনের একটা খটকা প্রশ্নের মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছিল। বেশ কিছুদিন ধরে প্রশ্নটা ওর ভেতরে কুরে খাচ্ছিল। কিন্তু জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে গোগোল বুঝল উত্তরটা সে জানে। মৌসুমির গোপন প্রেম, তার নীরবতা গোগোলের শরীরে বিষের মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আর একবারই এমন আবেগ অনুভব করেছিল সে, যখন তার নামের কারণ অশোক তাকে খুলে বলেছিল। সে-রাতেও একইরকম চঞ্চল হয়েছিল তার মন, অসুস্থ লেগেছিল। সেবার অবশ্য বাবার প্রতি যে আত্মিক টান অনুভব করেছিল, মৌসুমির কথায় তা করেনি গোগোল। বরং মৌসুমির প্রতি রাগ আর ঠকে যাওয়া মানুষের অপমান তার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। অথচ, তার সঙ্গে সঙ্গেই, এক অনির্বচনীয় শান্তিতে মনও ভরে যাচ্ছিল। মৌসুমির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার সেই মুহূর্তে সে যেন অনেকদিন পরে শক্ত জমিতে পা রেখেছিল। কয়েকদিন আগের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল তার। এক রাতে চিনে খাবারের ডেলিভারিম্যানকে দেওয়ার জন্য পয়সা খুঁজতে গিয়ে ভুল করে মৌসুমির ব্যাগের মধ্যে ডায়াঁম-কেস দেখতে পেয়েছিল সে। মৌসুমি অবশ্য বলেছিল, ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছিল বলে কেসটা তার ব্যাগে। গোগোল এ নিয়ে আর ভাবেনি।

দিমিত্রির কথা জানতে পারার পর প্রথমে গোগোল ভেবেছিল, পরের স্টেশনেই ট্রেন থেকে নেমে যাবে। শারীরিকভাবে মৌসুমির থেকে যত দূরে থাকা যায়। কিন্তু ট্রেন থেকে নামা অত সহজ নয়, মা আর সোনিয়া অপেক্ষা করছে। তাই যাত্রার পরের অস্বস্তিকর অংশটুকু খুব কষ্ট করে সহ্য করেছিল গোগোল। আর তার পরের উইকএন্ডটাও। মাকে বুঝতেও দেয়নি, তার বিয়ে ভেঙে যেতে চলেছে। পেম্বারটন রোডের ঘরে শুয়ে মাঝরাতে মৌসুমি অবৈধ প্রেমের কথা খুলে বলেছিল গোগোলকে। কিশোরী বয়সে দিমিত্রির সঙ্গে কীভাবে বাসে আলাপ হয়েছিল, অনেকদিন পরে হঠাৎই কীভাবে দিমিত্রির বায়োডেটা হাতে চলে এসেছিল, কীভাবে পাম বিচে দিমিত্রির সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল। গোগোল ক্ষমাহীনভাবে শুনেছিল। কিন্তু কিছুই বলেনি। এই প্রথম নিজের নামের চেয়ে গোগোল একজন অন্য পুরুষের নামকে বেশিই অপছন্দ করল।

পেম্বারটন রোডে একদিন কাটিয়ে সেবার তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল মৌসুমি। হঠাৎ করে ইন্টারভিউয়ের খবর আসার অজুহাত দিয়ে। আসলে

সে আর গোগোল ঠিক করেছিল মৌসুমি একাই নিউ ইয়র্কে ফিরে যাবে। গোগোল নিউ ইয়র্কে ফিরে দেখল, মৌসুমির জিনিসপত্র আর জামাকাপড় আর ফ্ল্যাটে নেই। বাথরুমে সাজার জিনিসও নেই। তাদের নাতিদীর্ঘ বিবাহিত জীবনের কোনও ব্যাবহারিক অংশের অধিকার দাবি করেনি মৌসুমি। কয়েকমাস বাদে গোগোলের অফিসে এসে ডিভোর্সের কাগজ সই করিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, সে প্যারিসে ফিরে যাচ্ছে। ঠিক যেমন বাবা মারা যাওয়ার পর করেছিল, তেমনভাবে ধীরে ধীরে মৌসুমির সব জিনিস আর বই অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের করেছিল গোগোল। মাঝরাতে ফুটপাথে সেগুলো রেখে এসেছিল, যাতে কেউ নিয়ে যেতে পারে। আর অনেক কিছু ফেলেও দিয়েছিল। বসন্তকালে গোগোল একসপ্তাহের জন্য ভেনিসে গেল। আদতে যাওয়ার কথা ছিল মৌসুমিরও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একাই গিয়েছিল গোগোল। ধ্রুপদী সৌন্দর্যে নিজের দুঃখ ভোলার চেষ্টা করেছিল। অন্ধকার সরু গলি, অগুনতি ছোট ছোট সেতু, নির্জন চৌমাথা দিয়ে সে হেঁটে বেড়াল, ছাউনির তলায় বসে কাম্পারি বা কফি খেল, গোলাপি বা সবুজ রং করা প্রাসাদ আর চার্চের স্কেচ করল। কিন্তু যে-রাস্তায় এসেছিল, সে-রাস্তায় ফিরতে পারল না।

তারপর নিউ ইয়র্কে ফিরে এল সে। যে-অ্যাপার্টমেন্টটায় তারা দু'জনে থাকত, তা এখন পুরোপুরি ওর নিজের। একবছর কেটে গিয়েছে, আবেগের ধার ভোঁতা হয়ে এসেছে। কিন্তু অপমান আর অসাফল্য তাকে এখনও কুরে কুরে খায়। এখনও কোনও রাতে সে সোফায় ঘুমিয়ে পড়ে, টিভি অফ করতে ভুলে যায়। ঘুম ভাঙে রাত তিনটেয়। এ যেন তার ডিজাইন করা একটা বাড়ির হঠাৎ ভেঙে পড়া। কিন্তু মুশকিল এই যে, গোগোল পুরো দোষটা মৌসুমিকেও দিতে পারে না। ওরা দু'জনেই আবেগের মাথায় বিয়ে করেছিল, এটাই তাদের বিবাহিত জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। তারা দু'জনেই পরস্পরের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে চেয়েছিল, একইরকম পারিবারিক জীবন ভাগ করে নিতে গিয়ে ঝুঁকি নিতে চায়নি। তবে সব মেনে নিয়েও অবাক লাগে গোগোলের, বত্রিশ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়ে ডিভোর্সও হয়ে গিয়েছে। মৌসুমির সঙ্গে কাটানো জীবন তার জীবনের একটা স্থায়ী অংশ, যার এখন আর কোনও উপকারিতা বা ব্যবহারযোগ্যতা নেই। সেই সময়টুকু যেন এমন একটি নাম যা সে আর ব্যবহার করে না।

মায়ের গাড়ির হর্নের পরিচিত শব্দ কানে এল গোগোলের। গাড়িটা

পার্কিঙের জায়গায় ঢুকছে। সোনিয়া ড্রাইভারের সিটে বসে হাত নাড়ছে। পাশে বেন। সোনিয়া আর বেন এনগেজমেন্ট ঘোষণা করার পর এই প্রথম ওদের একসঙ্গে দেখছে গোগোল। সে ভাবে, যাওয়ার সময় সোনিয়াকে বলতে হবে কোনও মদের দোকানে গাড়ি থামাতে, শ্যাম্পেন কিনতে হবে। সোনিয়া গাড়ি থেকে নেমে গোগোলের দিকে এগিয়ে আসে। এখন সে পুরোদস্তুর অ্যাটর্নি, হ্যানকক বিল্ডিংয়ের একটা অফিসে কাজ করে। তার চুলগুলো চিবুক পর্যন্ত লম্বা রেখে কাটা, পরনে গোগোলেরই একটা হাইস্কুলে কেনা জ্যাকেট। কিন্তু সোনিয়ার মুখে একটা পরিণতমনস্ক ছাপও রয়েছে। গোগোল সহজেই কল্পনা করতে পারল, কয়েকবছর পর সোনিয়ার গাড়ির পিছনের সিটে দু'টি বাচ্চা বসে থাকবে। সোনিয়া কাছে এসে দাদাকে জড়িয়ে ধরল। ঠান্ডা হাওয়া অগ্রাহ্য করে একে অপরের বাহুর ঘেরাটোপে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ভাই-বোনে। শেষে সোনিয়া বলল, "ওয়েলকাম হোম, গগল্‌স।"

শেষবারের মতো পেম্বারটন রোডের বাড়িতে সাতফুট লম্বা কৃত্রিম ক্রিসমাস-ট্রি সাজাচ্ছিল গাঙ্গুলিরা। গাছটার নীচে রঙের কোড দেওয়া আছে, যাতে বোঝা যায় কোন ডালটা কোথায় লাগাতে হবে। গাছটা প্রথম কেনার সময় সঙ্গে একটা ইনস্ট্রাকশনের বই ছিল বটে, তা আর বহুকাল হল খুঁজে পাওয়া যায় না। মাথা খাটিয়ে গোটা গাছটা খাড়া করতে হয়। সবচেয়ে লম্বা ডালটা সবচেয়ে নীচে, ছোট ডালটা সবচেয়ে উপরে। প্রথমে কমলা রং, তারপর হলুদ, তারপর লাল, সবশেষে নীল। সবচেয়ে উপরের ডালটা ছাদ ছুঁয়ে সামান্য বেঁকে থাকে। গাছটা সাজানো হলে সেটা রাখা হল জানালার পাশে, পরদা খুলে দেওয়া হল যাতে বাইরে থেকে সকলে দেখতে পায়। ছোটবেলার মতো উত্তেজিত লাগছিল সোনিয়া আর গোগোলের। নিজেরা প্রাইমারি স্কুলে যে-সব সাজানোর জিনিস তৈরি করেছিল, সেগুলো দিয়ে গাছ সাজাল দু'ভাইবোনে। অসীমার একটা ছেঁড়া বেনারসি শাড়ি দিয়ে গাছের তলাটা ঢেকে দেওয়া হল। গাছের একেবারে উপরে একটা নীল ভেলভেটের পাখি বসানো হয় প্রতিবার, সেটার খয়েরি পা। এবারও তাই করা হল।

ফায়ারপ্লেসের সামনে পেরেক থেকে স্টকিংস ঝোলানো হয়ে গিয়েছে। যেটা গতবছর মৌসুমির জন্য ঝোলানো হয়েছিল, সেটা এ-বছর বেনের নাম করে ঝোলানো হল। তারপর ফোমের কাপে শ্যাম্পেন খেল সকলে, অসীমাকেও জোর করে দিল কিছুটা। অশোকের পছন্দসই পেরি কোমো ক্রিসমাস টেপ বাজানো হল। সোনিয়াকে খেপানো হল কিছুক্ষণ। গোগোল

বেনকে বলল, সোনিয়া কলেজে হিন্দুধর্ম নিয়ে ক্লাস করে বাড়ি এসে ক্রিসমাসের উপহার নিতে চায়নি, বলেছিল, সে খ্রিস্টান নয়। কাল খুব ভোরে উঠে অসীমা ছেলে-মেয়েদের কাছে শেখা বড়দিনের রীতি অনুযায়ী স্টকিংসে চকোলেট কয়েন, ক্যান্ডি কেন আর রেকর্ডের দোকানের গিফ্‌ট ভাউচার ভরে রাখবে। গোগোলের মনে পড়ে, প্রথমবার এবাড়িতে ক্রিসমাস-ট্রি এসেছিল তারই আবদারে। ছোট্ট প্লাস্টিকের একটা গাছ, টেবিল ল্যাম্পের মতো তার আকার। কিন্তু সে-গাছ বাড়িতে ঢোকাই তখন গোগোলের কাছে বিরাট সাফল্য। খুব বায়না করে ওষুধের দোকান থেকে গাছটা কিনিয়েছিল গোগোল, তারপর ছেলেমানুষি শখে রাংতা, মালা আর বাবার বানিয়ে দেওয়া একটা আলোর মালা দিয়ে সেটা সাজিয়েছিল। বাবা বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিল সেবার। যতক্ষণ না বাবা বাড়ি এসে আলোর প্লাগটা টেনে খুলে দেয়, ততক্ষণ গোগোল ঠায় বসে থাকত তার সাধের ক্রিসমাস ট্রির দিকে তাকিয়ে। মনে আছে, প্রথমবার একটা খেলনা উপহার পেয়েছিল সে। ওই একটাই উপহার, তাও তার নিজের পছন্দ করে কেনা। দোকানে মা বলেছিল, খেলনাটার দাম দিয়ে ফেরা পর্যন্ত গ্রিটিংস কার্ডের স্ট্যান্ডের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে। সব সাজানো হয়ে গেলে অসীমা বলল, "আমরা আগে কী বিচ্ছিরি রঙিন চকমকে আলো লাগাতাম, মনে আছে? আমি তখন কিচ্ছু জানতাম না।"

সাড়ে সাতটায় কলিং বেল বাজে। অতিথিরা এক-এক করে এসে ঢুকতে থাকে। বাইরের দরজাটা খুলেই রাখতে হয়। মানুষজনের সঙ্গে সঙ্গে হাড়কাঁপানো হিমেল হাওয়াও ঢুকতে থাকে বাড়িটার ফাঁকে-ফোঁকরে। অতিথিরা পরস্পরের সঙ্গে চিৎকার করে বাংলায় কথা বলতে থাকে, তর্ক করতে থাকে, একে-অন্যকে চুপ করিয়ে দিয়ে নিজের মত জাহির করতে থাকে। তাদের হাসির শব্দ ঘরের ভিতর ঘুরপাক খায়। ক্রমশ ভিড় বাড়ে। ফুটন্ত তেলে ক্রোকে ভেজে লাল পেঁয়াজের স্যালাডের সঙ্গে পরিবেশন করা হয়। সোনিয়া ক্রোকের প্লেট আর কাগজের ন্যাপকিন নিয়ে অতিথিদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। হবু জামাই বেনকে প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। বেন একসময় গোগোলকে বলে, "এদের সকলের নাম মনে রাখতে আমি সারা জীবনেও পারব না।" গোগোল অভয় দেয়, "ভেবো না, তোমাকে এত নাম মনে রাখতে হবে না।" এই পাতানো 'মাসি' আর 'মেসো'দের

দঙ্গলে গোগোল অবশ্য নিজে মানুষ হয়েছে। এরাই তো তাকে ঘিরে ছিল বিয়ের সময়ে, জন্মদিনের সময়ে, এমনকী বাবার মৃত্যুর সময়েও। এদের সকলকেই কথা দিয়েছে গোগোল, এদের ভুলে যাবে না। মা না থাকার সময়ও মনে রাখবে। মাসিরা লাল আর সবুজ রঙের শাড়ি পরে এসেছেন। সোনিয়া তাদের এনগেজমেন্টের আংটি দেখিয়ে বাহবা নিচ্ছে। আংটিটায় একটা বড় পান্নার চারদিকে ছ'টি ছোট হিরে বসানো। মাসিরা সোনিয়াকে বলছে, "বিয়ের আগে তোমাকে চুল লম্বা করতে হবে কিন্তু।" একজন মেসোমশাই সান্তাক্লসের টুপি পরে আছেন। যে যেখানে পারছে, সেখানে বসে আছে। চেয়ারে, খাটে, মেঝেতে। ছোট বাচ্চারা বেসমেন্টে গিয়ে খেলা করছে, একটু বড়গুলো উপরের তলায় গিয়ে জুটেছে। গোগোল লক্ষ করল, তার ছোটবেলাকার পুরনো মনোপলি বোর্ডটা আবার বেরিয়েছে, যদিও সেটা এখন দু'টুকরো। খেলা চলছে পুরোদমে। এই বাচ্চারা কাদের তা গোগোল জানে না। গত কয়েকবছরে অনেকের সঙ্গে মায়ের আলাপ হয়েছে, যাদের ভাল করে চেনেই না সে। লোকে বলছে, অসীমার দেওয়া এই ক্রিসমাস ইভ পার্টি তাদের কত ভাল লাগে। বলছে, এই পার্টিগুলোর প্রবল অভাববোধ করবে তারা, অসীমা না থাকায় সবকিছু কেমন পালটে যাবে। গোগোল বুঝতে পারে, অসীমার উপর এরা অনেকেই নির্ভর করে থাকে। ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করতে, সকলকে একত্র করতে, যারা নতুন, তাদেরকে এখানকার রীতিনীতি শেখাতে অসীমাই ভরসা। গোগোলের চিরকালই মনে হয়েছে, এ-সব অনুষ্ঠান দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়, এমন হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু এও সত্যি যে, গোগোল আর সোনিয়ার কথা ভেবেই এ-সব আমেরিকান জমায়েত করতে শিখেছিল মা আর বাবা।

বিভিন্ন কারণে তার পরিবারের জীবনযাত্রা কতকগুলো দুর্ঘটনার ফল বলে মনে করে গোগোল। ওরা কেউই চায়নি জীবন এমন হোক, তবু আশ্চর্য এক স্রোতে অপ্রত্যাশিত মোড় নিয়েছে তাদের জীবন। যেমন, বাবার ট্রেন দুর্ঘটনা। প্রথমে বাবা মরে যেতেই বসেছিল, তারপর অনেকটা দূরে চলে যেতে উৎসাহী হয়েছিল। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করেছিল। তারপর, অসীমার দিদিমার ঠিক করা নাম ডাকে হারিয়ে যাওয়ায় গোগোলের নামকরণ, নামের চাপে অর্ধেক জীবন অস্বস্তিতে ভোগা। অপছন্দের নামে পরিচিত হওয়া, তার খেই ধরে গোগোলের নাম পরিবর্তন। গোগোলের বিয়েও তো এক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সবচেয়ে বড়

দুর্ঘটনা তো বাবার আকস্মিক মৃত্যু। সকলের থেকে দূরে, একাকী বিদায় নেওয়া। যেন সেই ট্রেন দুর্ঘটনার রাতেই মৃত্যুর প্রস্তুতি হয়ে গিয়েছিল, তাই কাউকে না বলে, চুপিচুপি মৃত্যু এসে বাবাকে নিয়ে গেল। আর এই ঘটনাগুলোই গোগোলকে জীবনের জন্য তৈরি করেছে, তার ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করেছে। এমন সব ঘটনা, যার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা যায় না, কিন্তু একবার ঘটে গেলে সারা জীবন ধরে ভাবতে হয়, বুঝতে হয়। এমন সব ঘটনা, যা ঘটাই উচিত নয়, কিন্তু যা ঘটে আর তার দায় সারা জীবন বয়ে যেতে হয় মানুষকে।

মা চেঁচিয়ে ভিড়ের মধ্যে থেকে বলছে, "গোগোল, ক্যামেরাটা কোথায়? কয়েকটা ছবি তুলবি? আজকের রাতটা মনে রাখতে চাই আমি। পরের বছর এ-রকম সময়ে আমি তো আর এ-দেশে থাকব না।" গোগোল বাবার নিকন ক্যামেরাটা আনতে দোতলার দিকে পা বাড়ায়। ক্যামেরাটা অশোকের আলমারির উপরের তাকে আছে। আলমারিতে প্রায় কিছুই নেই আর। রড থেকে কোনও জামাকাপড় ঝুলছে না। এই শূন্যতা গোগোলের বুকে ভারী হয়ে চেপে বসে, তবে ক্যামেরার ওজনটা আবার বাড়িয়ে দেয় আত্মবিশ্বাস। সে ক্যামেরাটা নিয়ে নিজের ঘরের দিকে যায়। একটা নতুন ফিল্মের রোল ভরতে হবে, নতুন ব্যাটারি লাগাতে হবে। গতবছর সে আর মৌসুমি গেস্টরুমের ডবল বেডে শুয়েছিল। মা অন্য অতিথিদের মতো তাদের জন্যও সেখানে ধোয়া তোয়ালে আর নতুন সাবান রেখে দিয়েছিল। কিন্তু এখন সোনিয়া আর বেন গেস্টরুমে আছে। গোগোল আগের মতো নিজের ঘরে শোয়। এই বিছানাতে সে চিরকাল একাই শুয়েছে, মৌসুমি বা অন্য কারও সঙ্গে ভাগ করে নেয়নি।

বিছানাটা সরু। উপরে মোটা খয়েরি একটা লেপ ভাঁজ করে রাখা। হাত বাড়ালে ছাদের কাছে লাগানো বাতির কাচ স্পর্শ করা যায়। ডুমটার ভিতরে মরা পোকা ডাঁই হয়ে রয়েছে। দেওয়ালে একসময়ে আটকানো সেলোটেপ আর পোস্টারের দাগ এখনও দেখা যায়। ঘরের কোনায় রাখা ভাঁজ করার কার্ড টেবিলটাই তার পড়ার ডেস্ক হিসেবে কাজ করেছে। এর উপরেই খাতা রেখে হাঁসের গলার মতো দেখতে ধুলোট, কালো একটা টেবিল ল্যাম্পের আলোয় হোমওয়ার্ক করত গোগোল। মেঝেতে একটা পাতলা ময়ূরকণ্ঠী রঙের কার্পেট পাতা। কার্পেটের আয়তন মেঝের মাপের চেয়ে একটু বেশি হওয়ায় দেওয়াল ঘেঁষে কিছুটা অংশ গোটানো অবস্থায় রয়েছে। তাক আর

ড্রয়ারগুলো এখন মোটামুটি ফাঁকা। ফেলে দেওয়ার মতো জিনিস প্যাকিং বাক্সে ভরে ফেলা হয়েছে। যেমন, গোগোল গাঙ্গুলি নামে হাইস্কুলে লেখা প্রবন্ধ। এলিমেন্টারি স্কুলে গ্রিক আর রোমান স্থাপত্য নিয়ে লেখা একটা রচনাও ফেলে দেওয়া হবে, তার সঙ্গে এনসাইক্লোপিডিয়াজ থেকে ট্রেস করা করিন্থিয়ান, আয়নিক আর ডোরিক স্থাপত্যরীতির থামের নমুনা ছবি। পুরনো পেন আর পেনসিলের সেট, দু-একবার শুনে ফেলে দেওয়া হয়েছে এমন রেকর্ড, তখন বড় হত কিন্তু এখন ছোট হয়, এমন জামাকাপড় প্যাকিং কেসে ঠেসে দেওয়া আছে। এগুলো কোনওদিন নিউ ইয়র্কের ছোট্ট, ঠাসা অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাওয়ার কথা মনেও হয়নি গোগোলের। চারদিকে অনেক বই ছড়িয়ে আছে। ছোটবেলায় কম্বলের তলায় টর্চের আলোয় পড়া বই, কলেজের পাঠ্যবই যেগুলো কখনও পুরোপুরি পড়া হয়ে ওঠেনি, স্পাইনে ‘ইউসড’ লেখা হলুদ স্টিকার মারা বই। মা এগুলো লাইব্রেরিতে দান করে যাবে বলেছে। সেখানকার বার্ষিক বইয়ের সেল হলে এগুলোও হয়তো বিক্রি হয়ে যাবে। মা অবশ্য বলেছে, সব ঠিক করে দেখে নিতে আর পরে লাগবে এমন কোনও বই থাকলে আলাদা করে সরিয়ে রাখতে। গোগোল বইয়ের বাক্সটা দেখতে শুরু করল। দ্য সুইস ফ্যামিলি রবিনসন। অন দ্য রোড। দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। হাউ টু গেট ইনটু অ্যান আইভি লিগ স্কুল।

আর তারপর হঠাৎই একটা বই চোখে পড়ল গোগোলের। অনেকদিন আগের বই। ভুলে যাওয়া, কখনও না-পড়া বই। ডাস্ট জ্যাকেটটা আর নেই। স্পাইনে লেখা বইয়ের নামটা ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। বইটা মোটা, কাপড়ে বাঁধানো, প্রায় দু'দশকের ধুলোয় মলিন। পাতাগুলো অবশ্য ভারী, একটু ময়লা, কিন্তু আঙুলে বেশ রেশমি, মোলায়েম ঠেকছে। নাম লেখা পাতাটা খুলে ধরতে বাঁধাইয়ে শব্দ হল। অনেকদিন না খোলা বই খুললে যেমন হয়। লেখা আছে দ্য শর্ট স্টোরিজ় অব নিকোলাই গোগোল। তার নীচে বাবার ছড়ানো হাতের লেখায়, লাল বলপেনে লেখা “ফর গোগোল গাঙ্গুলি”। বাবার লেখা লাইনগুলো সামান্য উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। গোগোল শুনেছে, এমন হাতের লেখা বোঝায় যে লেখক জীবন থেকে অনেক আশা করেন। অপটিমিস্টিক। বাবা আরও লিখেছে: “তোমার নাম যে রেখেছিল সে আজ তোমার হাতে সমনামীকে তুলে দিল।” তলায় তার জন্মদিনের তারিখ আর সাল, ১৯৮২। গোগোল এই লেখাটা এর আগে খুলেও দেখেনি।

বাবা বইটা দেওয়ার সময় ঠিক ওই জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিল— চোখ তুলে তাকাল গোগোল— সে যেখানে বসে আছে সেখান থেকে একহাতের দূরত্বে। বাবা গোগোলকে নিজের মতো করে উপহারের লেখাটা বুঝতে দিয়েছিল। পরেও কখনও জিজ্ঞেস করেনি বইটা কেমন লাগল। বইটার কথা আর কখনও ওঠেইনি। এতদিন পরে বাবার হাতের লেখা দেখে কলেজের সময়ে বাবার পাঠানো চেকগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। কত চেক পাঠিয়েছে বাবা তাকে? কলেজে তো বটেই, তার পরেও একবছর ধরে নিয়মিত পাঠিয়েছে যাতে সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় বিপদে না পড়ে। সিকিউরিটি ডিপোজ়িট দেওয়ার সময় পাঠিয়েছে, জীবনে প্রথমবার সুট কেনার জন্য পাঠিয়েছে, কোনও কারণ ছাড়াও পাঠিয়েছে। তবে তার জীবনে বাবার দেওয়া প্রথম উপহার তার নামটা, যে নামটা সে সারাজীবন ঘৃণা করে এসেছে, যে নামের মূল সূত্রটুকু এই ঘরে এতকাল লুকোনো ছিল।

গোগোলের নাম যারা দিয়েছিল, যারা ডেকেছিল, তারা গোগোলের জীবন থেকে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে। একজন তো মৃত। অন্যজন খুব শিগগিরি নতুন এক দুনিয়ায় থাকতে শুরু করবে। হয়তো সপ্তাহে একবার ফোনে কথা হবে। মা অবশ্য বলেছে, ই-মেল করা শিখে নেবে। তার মানে সপ্তাহে একবার ফোনে তার ডাকনাম শুনবে সে, আর হয়তো কয়েকবার কম্পিউটারের স্ক্রিনে দেখতে পাবে। আর আজ যারা বাড়ি ভরতি করে আছে, সেই পাতানো মাসি বা মেসোরা? তাদের কাছে নিখিল গাঙ্গুলি যদিও 'গোগোল', মা চলে যাওয়ার পর ক'বার দেখা হবে এদের সঙ্গে? চারপাশে 'গোগোল' বলে ডাকার লোক না থাকলে, যতদিনই সে বাঁচুক না কেন, গোগোল গাঙ্গুলি দুনিয়া থেকে শিগগিরি বিদায় নেবে। ভালবাসার লোকেদের মুখে নাম না উচ্চারিত হওয়া মানেই তো সে-নামের একরকমের মৃত্যু। কিন্তু গোগোল নামের এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু আজ আর কোনও জয়ের বোধ নিয়ে আসে না। কোনও তৃপ্তি বা সান্ত্বনাও নিয়ে আসে না, যা হয়তো একসময় এলেও আসতে পারত।

গোগোল উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। নীচ থেকে ভেসে আসা জনসমষ্টির কোলাহল আর বাচ্চাদের হাসির আওয়াজ থেকে নিজেকে পৃথক করে নিল। গোগোল গাঙ্গুলি এবার বাবু হয়ে বিছানার উপর উঠে বসল। বইটা খুলে নিকোলাই গোগোলের পেনসিলে আঁকা ছবিটা দেখতে লাগল। ছবির পাশের পাতাতেই লেখকের জীবনের মূল ঘটনাগুলো দেওয়া

রয়েছে। জন্ম: মার্চ ২০, ১৮০৯। লেখকের বাবার মৃত্যু: ১৮২৫। প্রথম গল্পের প্রকাশ: ১৮৩০। রোমযাত্রা: ১৮৩৭। মৃত্যু: ১৮৫২, তেতাল্লিশতম জন্মদিনের একমাস আগে। আর দশ বছর পরে গোগোল গাঙ্গুলিও ওই একই বয়সে পৌঁছোবে। আবার কি বিয়ে হবে তার, গোগোল ভাবে। বাচ্চা কি হবে যার নামকরণ করতে হবে তাকেই? আজ থেকে একমাস পরে সে ছোট একটা আর্কিটেকচারাল ফার্মে যোগ দিতে চলেছে। সেখানে নিজের ডিজাইনে কাজ করতে পারবে সে। ফার্মের পার্টনার হয়ে ওঠার সুযোগও আসতে পারে। হয়তো ফার্মের নামে তার নামটিও ঢুকে যাবে। সে-ক্ষেত্রে নিখিল সগর্বে বেঁচে থাকবে আর গোগোল হারিয়ে যাবে। এমনিতেই গোগোল আইনত মৃত, এবার তার বাস্তবেও বিস্মরণ ঘটবে।

পাতা উলটে প্রথম গল্পটায় পৌঁছোয় সে। "দ্য ওভারকোট"। কয়েক মিনিটের মধ্যে মা নিশ্চয়ই তাকে খুঁজতে উপরে চলে আসবে। টোকা না মেরে সোজা দরজা খুলে ঢুকে পড়বে, বলবে, "গোগোল! কী হল? এত দেরি হচ্ছে কেন? ক্যামেরাটা কোথায়?" তারপর ধমক দেওয়ার সুরে বলবে, "এটা কি বই পড়ার সময়?" মন দিয়ে বইটার দিকে তাকাবেও না মা। বুঝবে না, যেমন গোগোল বোঝেনি এতদিন যে, অশোক এই পুরনো বইটার পাতায়-পাতায় বেঁচে রয়েছে, ধৈর্য ধরে আছে, চুপিচুপি, লুকিয়ে, নীরবে। মা বলবে, "নীচে একটা পার্টি চলছে। লোকের সঙ্গে কথা বলতে হবে, খাবার গরম করতে হবে, তিরিশ গ্লাস জল ভরে সাইডবোর্ডের উপর সাজিয়ে রাখতে হবে। আর কোনওদিন আমরা এই বাড়িতে একত্র হব না। একবার ভাব... শুধু যদি তোর বাবা একটু বেশিদিন বাঁচত," মায়ের চোখে এক মুহূর্তের জন্য জল চিকচিক করে উঠবে, তারপর সামলে উঠে বলবে, "আয় না, ক্রিসমাস-ট্রির তলায় বাচ্চারা খেলছে, দেখবি আয়।"

গোগোল তখন উঠে পড়বে, বইটা বন্ধ করার আগে পাতার কোনা মুড়ে চিহ্ন রেখে দেবে। তারপর সে মায়ের সঙ্গে নীচে নেমে যাবে, পার্টির ভিড়ে মিশে যাবে। তার বাবা আর মায়ের জীবনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলোর ছবি তুলবে। এই শেষবারের মতো তার বাবা-মায়ের বাড়িতে জড়ো হওয়া, এখানে-ওখানে খাবারের প্লেট কোলে নিয়ে বসে থাকা মানুষজনের ছবি, যারা আঙুল দিয়ে খাবার খায়। তারপর মায়ের তাড়নায় সে নিজেও খেতে বসবে। মাটিতে, বাবু হয়ে। আর নিউ ইয়র্ক নিয়ে, তার নতুন চাকরি নিয়ে, মাকে নিয়ে, সোনিয়া আর বেনের বিয়ে নিয়ে কথা বলবে তার

বাবা-মায়ের বন্ধুদের সঙ্গে। খাওয়া হয়ে গেলে সে সোনিয়া আর বেনের সঙ্গে হাত লাগিয়ে এঁটো প্লেট থেকে তেজপাতা, ভেড়ার হাড় আর এলাচের টুকরো কাচিয়ে নেবে, রান্নাঘরের কাউন্টারে আর উনুনের উপর সেগুলো স্তূপ করে রাখবে। পার্টির পরে বাবা যা করত, মাও তাই করবে নিশ্চয়ই। দু'টো কেটলিতে ভাল লোপচু চায়ের পাতা দিয়ে চা তৈরি করবে। বেঁচে যাওয়া খাবার একে-তাকে দিয়ে দেবে মা। গোগোল দেখবে। তারপর যত রাত বাড়বে, তত অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে সে, নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকতে চাইবে। একা থাকতে চাইবে তখন। ভাববে, কতক্ষণে ছোটবেলায় ভুলে যাওয়া, ফেলে দেওয়া বইটা পড়তে শুরু করবে সে। কয়েকমুহূর্ত আগে পর্যন্ত যে-বইটা তার জীবন থেকে প্রায় হারিয়েই যাচ্ছিল, যেটাকে খুঁজে পাওয়াই একটা দুর্ঘটনা। ঠিক যেমন এই বইটার কল্যাণে চল্লিশ বছর আগেকার এক দুর্ঘটনায় বাবার জীবন ফিরে পাওয়াটাই আর-এক দুর্ঘটনা। বা বলা চলে, কাকতালীয় ঘটনা। এখনকার মতো গোগোল খাটের বাজুতে একটা বালিশ রেখে আরাম করে বসল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে আবার নীচে যাবে। পরিবারের সকলের সঙ্গে, পরিচিত লোকেদের সঙ্গে পার্টির ভিড়ে মিশে যাবে। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, মা তাকে ডাকছে না। অন্যমনস্ক হয়ে আছে, একজনের মুখে মজার কথা শুনে হাসছে, নিজের ছেলের অনুপস্থিতি টের পাচ্ছে না। এই মুহূর্তে, তাই, গোগোল বইটা পড়তে শুরু করল।
